কিংবদন্তীর ফাউস্টকে নিয়ে এই প্রথম উপন্যাস লেখা হল। লেখা হল ধর্মান্ধ মানুষের হাতে লাঞ্ছিত এক নিষ্পাপ যুবতীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরার মর্মান্তিক কাহিনী এবং এক জ্ঞানভিক্ষু জনদরদীর দুঃখের আগুনে পুড়ে শুচিশুভ্র হওয়ার ঘটনা।

এর অন্তঃসারে আছে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ, অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে সমাজ-বিধানের সংঘাত, মানবাস্তিত্বে নিহিত ইড ও এগোর দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ-সংঘাত-জনিত যন্ত্রণায় চৈতন্যের বিষামৃত উপলব্ধি।

শ্রদ্ধেয়া

বীণা বউদিকে—

এই লেখকের অন্যান্য বই—

উপন্যাস

পলিমাটি লোনা জল

যে তাপে রঙ বদলায়

ক্রীতদাস

একবৃত্ত অন্য বলয়

মৌরিগ্রামের মেয়ে

শান্তনু

সুজাতার স্বপ্ন

জীবনী

বাল্জাক

লেখকের লেখক দস্তয়েফ্স্কি

প্রবন্ধ

নারী ও সমাজ

ভালবাসা ও বিবাহ

ইত্যাদি

ভূমিকা :

ফাউস্ট কে

ইতিহাসের ফাউস্ট এবং কিংবদন্তীর ফাউস্ট—এ দু'জন একই ব্যক্তি কিংবা ভিন্ন মানুষ এ তর্কের শেষ হয়নি। তবে এ কথা সত্যি, ইতিহাসের ফাউস্ট অর্থাৎ ফাউস্ট নামে রক্ত-মাংসের মানুষ একজন বড় বিদ্বান ব্যক্তি একদা জীবিত ছিলেন। হাসফ্রট-এর জ্যোতির্বিদ য়োহান ভিনড়ঙ্গকে লেখা স্পানহাইম্-এর মঠাধ্যক্ষ য়োহান ট্রিথাইম-এর পত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সে পত্রে ফাউস্টকে পণ্ডিতম্মন্য নির্বোধ বলে উক্তি আছে।. এ হল ষোড়শ শতকের প্রথম দশকের কথা। তারপর অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কেউ তাঁকে ডাক্তার বলেছেন, কেউ জাদুকর—দার্শনিকও বলেছেন কেউ কেউ। অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে শত মুনির শত মত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এত শত আলোচনা সত্ত্বেও লোকটি যে-তিমিরে ছিলেন সে-তিমিরেই রয়ে গেলেন। তর্কের পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম বরং সে-তিমিরকে আরও গাঢ় ঘোরালো করে দিয়েছে, এক বিন্দু আলোকপাত করতে পারেনি তার ঐতিহাসিক অস্তিত্বের ওপরে।

বাসেল্ গির্জার প্রোটেস্টান্ট পুরোহিত সুপণ্ডিত য়োহান গাস্ট্ সর্বপ্রথম ম্যাজিস্টার গিওরগিয়স সাবেলিকস্ ফাউস্টস্‌কে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলে উল্লেখ করেন। অবশ্য তিনিও তাঁকে শয়তানের অনুচর বলেই মনে করতেন। এবং শয়তানের প্ররোচনাতেই তিনি উন্মার্গগামী হয়েছিলেন বলে তাঁর ধারণা ছিল। গাস্ট-এর সমর্থক মেলান্‌শ্‌থন্ বিশ্বাস করতেন শয়তানই শেষ পর্যন্ত ফাউস্ট-এর ঘাড় মটকে দিয়েছিল। কিন্তু লুথার পোষণ করতেন ভিন্ন মত। তাঁর মতে ফাউস্ট ভগবদ্‌কৃপায় শয়তানের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। অবশ্য এ মতের সমর্থক বেশী ছিল না। অধিকাংশ লেখকেরই বিশ্বাস ছিল ফাউস্ট ছিলেন প্রবঞ্চক, প্রগাঢ় জ্ঞান নয়, অপরিসীম ভণ্ডামিই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সে যা হোক মানুষটা যে অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও গুণী ছিলেন ওই সব আলোচনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এ অসাধারণ ব্যক্তিটিকে নিয়ে পুরো তিনশ' বছরব্যাপী লেখালেখিও হয়েছিল প্রচুর। তার মধ্যে ছোটখাটো কাব্য উপন্যাস নাটকও ছিল খান কতক। একখানা নাটক লিখেছিলেন ইংরেজ নাট্যকার ক্রিস্টোফার মারলো। এবং জর্মন নাট্যকার লেসিঙ লিখেছিলেন আর একখানা নাটক। কিন্তু এ সবের সবটাতেই ফাউস্টকে আঁকা হয়েছিল শয়তানের দোসর অথবা হাস্য-কৌতুকের নায়ক বলে।

মহাকবি গোয়টেই প্রথম ফাউস্ট-এর চরিত্রে মহত্ব আরোপ করেন (১৮০৮)। মহাকবির লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে ফাউস্ট যে শুধু কলঙ্ক মুক্তই হলেন তা নয়, এক যুগগুরু হিসেবেও অমরত্ব অর্জন করলেন। মাফিসটোফেলেস-ও মহাকবির উদার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হল না। মহাকাব্যে শয়তানেরও হল উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা, পুনর্বাসন। কিন্তু সেখানেই ফাউস্ট-সাহিত্যের শেষ নয়।

তারপরেও ফাউস্টকে নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার মধ্যে Un-Goethean Faust-ও কম নেই। তাঁদের প্রধান হলেন Lenau। Nikolaus Franz Niembsch Von Strchlenau (1802-1850). ভদ্রলোক পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছেন, আমিও ফাউস্ট-এর ওপরে একখানা কাব্য গ্রন্থ লিখলাম (১৮৩৬) কারণ বিষয়টা এমন নয় যে, গোয়টে ফাউসটকে নিয়ে কাব্য-নাটক লিখেছেন বলে ফাউস্ট-এর ওপরে তাঁর একচেটিয়া অধিকার বর্তে গেছে, আর কারো তার ওপরে হস্তক্ষেপের এক্তিয়ার নেই। তিনি এ কথাটা যে তাঁর কালের জন্যই বলেছিলেন তা নয় ভাবীকালের হয়েও তিনি ওই যুক্তিতেই ওকালতী করেছিলেন। তবু ব্যাপারটা ছিল তাঁর কালেরই কুটকচাল। এই কুটকচালের ঝড় উঠেছিল গোয়টের ফাউস্ট-এর দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩২) নিয়ে। গোয়টে যে ভাবে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করেছেন অনেকের তা পছন্দ হয়নি। অনেকে তাঁর আলোচ্য বিষয়টাকেও মেনে নিতে পারেন নি। অনেকে আবার ঘটনা সংস্থাপন ও নাটকনির্মিতির ওপরেও তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন।

কিন্তু কবি Lenau-র প্রতিবাদ ছিল অন্যত্র। তিনি গোয়টের আশাবাদী দার্শনিকতাকেও এক পোঁচে নাকচ করে দিয়েছিলেন। এবং ফাউস্ট কাব্যে এই বিষাদাশ্রয়ী কবির বিষণ্ণ বিন্যাসকেই অনেকে তখন গোয়টের চেয়ে মহৎ বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, "Lenau's Faust transcends mere personal sorrow, since it recaptures the shaken mood of a whole disoriented and sceptical generation, and more than that. The hero speaks with the unmistakable accents of all those often tragically gifted men who are also tragically minded; he speaks for a whole category of human beings predestined to spiritual shipwrack ;...."

—The Fortunes of Faust by E. M. Buttler. P, 285.

এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় ঐ সব তর্কের স্থান নেই। দরকারও নেই। আমি শুধু বলতে চাই, আমি ফাউস্ট-কিংবদন্তী নিয়ে সত্যসন্ধী মানুষের আত্মিক ও আস্তিত্বিক যন্ত্রণার কাহিনী বুনেছি। তার জন্যে ঋণী আমি কোন একজনের কাছে নই, সকলের কাছেই; এমন কি ১৫৯২-এ সংকলিত ইংলিশ ফাউস্ট বুক The History of the Damnable Life and Deserved death of Dr John Faustus নামক উৎস-গ্রন্থখানির সাহায্য থেকেও বঞ্চিত হইনি। মূল গ্রন্থখানি ব্রিটিশ মিয়ুজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে। এই দুর্লভ গ্রন্থখানির প্রাচীন ইংরেজি ভাষাকে আধুনিক ভাষায় পরিমার্জনা করেছেন উইলিয়ম রোজ ১৯২৬-এ। ছেপেছেন George Routledge & Sons Ltd, Broadway House : 68-74 Carter Lane, London E. C. 4. কলকাতায় এই গ্রন্থখানির তৎকালীন পরিবেশক ছিলেন Thacker, Spink & co.

—গ্রন্থকার

অবতরণিকা

অন্ধকারের দ্বার খুলে গেল। শয়তান তাকাল পৃথিবীর দিকে। তার মাথায় শৃঙ্গ। সে দেখতে ভয়ংকর। পৃথিবীর মাটি আর জলের ওপরে নিশ্বাস ফেলল সে। সে নিশ্বাসে ছিল ব্যভিচার মৃত্যু আর মড়কের বিষ। সে নিশ্বাসের বিষে শিউরে উঠল মানুষ। সভয়ে মাথা নত করল। শয়তান তার কীর্তির দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল খল্ খল্ করে।

একটা দ্রুত ধাবমান শব্দ শোনা গেল তখন। দেখতে দেখতে একটা দীপ্ত আলোর উদ্ভাস বিকীর্ণ হল চারধারে। আলোর দেবদূত এসে দাঁড়ালেন একটি উজ্জ্বল মেঘের মিনারে। জ্যোতির্ময় সে-দিব্য দেহের দিকে তাকালে চোখ নিমিলীত হয়ে আসে। তাঁর দু'হাতের মুঠোয় অগ্নিময় তলোয়ার। সে তলোয়ারের গায়ে লেখা রয়েছে একটি শব্দ—'সত্য'।

দেবদূত প্রশ্ন করলেন, তাঁর কণ্ঠ বাঁশির মতন বেজে উঠল,—কেন তুমি যুদ্ধে মড়কে মন্বন্তরে পৃথিবীর মানুষকে এমন করে ধ্বংস করছ ?

শয়তান জবাব দিল,—পৃথিবীটা আমার। বলেই সে খল্ খল্ করে হেসে উঠল। সে-অট্টহাসি ধাতব বর্মে আঘাত করার মতন ঝন্ঝন্ শব্দে ফেটে পড়ল চতুর্দিকে।

দেবদূত প্রতিবাদ করে উঠলেন,—না, পৃথিবী কখনো তোমার নয়, হতে পারে না। যতক্ষণ না মানুষ পরিত্যাগ করছে সত্যানুসন্ধান, বিসর্জন দিচ্ছে ন্যায় ও নীতিবোধ এ পৃথিবী তোমার হবে না। মানুষকে ভাল ও মন্দ এ দুয়ের যে-কোন একটি বেছে নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি কখনো ভগবানকে ভুলে যায়, মন্দকেই যদি সে বুক পেতে নেয় তাহলেই কেবল তুমি

এ পৃথিবীর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে, এ পৃথিবী তোমার হবে।

পৃথিবী ত আমারই, শয়তান চিৎকার করে উঠল,—পৃথিবীর মানুষ সকলেই পাপী। পাপই চালাচ্ছে তাদের, তারা প্রত্যেকেই লোভ আর রিরংসার বশ।

দেবদূত বাধা দিলেন,—না; প্রত্যেকে নয়। ফাউস্টের দিকে তাকাও। শোন শিক্ষাগুরু ফাউস্ট কী বলছেন। দেবদূত তাঁর বহ্নিমান তলোয়ারখানি সঞ্চালিত করলেন। পৃথিবীর এক কোণে শিষ্য-পরিবেষ্টিত ফাউস্টকে দেখা গেল। পৃথিবীর তরুণ সন্তানদের তিনি জ্ঞান বিতরণ করছেন।

শয়তান ফাউস্টের দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল,—আর সবাইর মতন ফাউস্টটাও একটা বদমাশ। সে মুখে সবাইকে সৎ-শিক্ষা দেয়; কিন্তু হাতে করে পাপ কাজ। তার মনের মধ্যে ঐশ্বর্যের লোভ। সে পরশমণি খুঁজে বেড়াচ্ছে। যার ছোঁয়ায় সব সোনা হয়ে উঠবে সে কেবল তাই চায়। শোন দেবদূত, আমি শপথ করছি, ফাউস্টের আত্মাকে আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে কেড়ে নেব, আমি ওকে মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলব আমার। বলতে বলতে সগর্বে মাথা নাড়তে থাকল শয়তান, মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো শক্ত করে বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। তার চোখে নরকের আগুন, চোখের তারা দুটো জ্বলছে যেন উল্‌কাপিণ্ড।

দেবদূত আবার তার তলোয়ার সঞ্চালিত করলেন। শুভ্র সমুজ্জ্বল শিখায় প্রখর হয়ে উঠল সে। শয়তানের চোখ দুটো সে দীপ্ত আলোকে ঝলসে গেল। চোখ বন্ধ করল শয়তান।

দেবদূত বললেন,—তুমি যদি ফাউস্টের হৃদয় থেকে স্বর্গের জ্যোতি হরণ করে নিতে পার শয়তান, তাহলে এ পৃথিবী তোমারই হোক।

তখন শয়তান আবার তার মুষ্টিবদ্ধ বাহু প্রসারিত করল। অন্ধকারের মিনারের মতন সে-প্রসারিত বাহু আন্দোলিত করে ঘোষণা করল,—শয়তানকে কেউ প্রতিহত করতে পারেনি, পারবে না। আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান গ্রহণ করলাম।

দেবদূত অন্তর্হিত হলেন। তাঁর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের জ্যোতির্মণ্ডল ম্লান হয়ে গেল। কর্কশ ধাতব শব্দে সচকিত করে অন্ধকারের যবনিকা নেমে এল। সে যবনিকার আড়াল থেকে ভেসে আসতে থাকল খল্ খল্ দানবীয় অট্টহাসি। দিগন্ত শিউরে উঠল।

ফাউস্ট
প্রথম পর্ব

১

ষোড়শ শতাব্দীর সূচনাতে সমগ্র য়োরোপ তখন ইতিহাসের এক চরম সংকটের মুখোমুখি। গোটা মহাদেশের ওপর দিয়ে একটা নতুন জিজ্ঞাসার আগ্রহ-ব্যাকুল প্রশ্ন উত্তাল বন্যার মতন বয়ে চলেছে। প্রবর্তন হয়েছে মুদ্রণ শিল্পের। তারই পৃষ্ঠপোসকতায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে জ্ঞানচর্চা। হঠাৎ কোন্ ইন্দ্রজালের কৌশলে নানা ভাষায় আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য অনুবাদক। প্রাচ্যের সাহিত্য সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সার সংকলন করে তাঁরা স্বদেশের সামনে তুলে ধরছেন; দেশবাসীকে নূতন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন চোখ ঝলসানো এক ধ্রুপদী ভাবৈশ্বর্যের সঙ্গে; অঙ্কুরিত করে দিচ্ছেন তাদের মনে এক সূক্ষ্মবিচারী দুরাসদ জীবন-জিজ্ঞাসা। সেই দুরাবগাহ জীবন-জিজ্ঞাসার আলোড়নে মহাদেশের মাটিতে ঘটেছে সংস্কৃতির নব-জন্ম। নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষে মনে মনে সঞ্চারিত হয়েছে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ। মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা সাহিত্যে ও শিল্পে, ধর্মে ও দর্শনে কুসংস্কারের যে কয়েদখানা তৈরি করেছিল বিদ্রোহের মন সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠেছিল তাকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে, তার সঙ্গে সংগ্রাম করে শহীদ হতে। পুরাতনের ধ্বজাবাহী ধর্মগুরু ও গোঁড়ারাও চুপ করে বসেছিলেন না। নতুন জীবন-দর্শনকে ছিঁড়ে ছত্রখান করে দিয়ে, তাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে, মানুষের মন থেকে তার শেষ কণা অব্দি নিঃশেষে নিকেশ করে দিতে তাঁরাও নির্মম প্রতিজ্ঞায় উদ্ধত হয়ে উঠেছিলেন। সংঘর্ষ অনিবার্য। অথচ এতশত খবর সাধারণ মানুষ আদৌ জানতই না। দৈন্য দুঃখ সন্তাপের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করলেও, যে-শক্তি মানুষকে আমূল রূপান্তরিত করে দেয় তার নিঃশব্দ পদসঞ্চার কদাচিৎ কেউ অনুভব করে। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনের সামনে

দাঁড়িয়েও তাই সাধারণ মানুষ অনেক সময়ই থাকে নির্বিকার। সেক্সনির সুন্দর ছোট্ট শহর রোডার মানুষের মনেও তাই কোন বিকার ছিল না। নিজেদের সুখ দুঃখ নিয়ে তারা বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিল। এমন একটা বিপর্যয়ের কিছুই তারা জানত না। জানলেও যে খুব একটা গ্রাহ্য করত তেমনও নয়।

পুনরুজ্জীবন ঘটে নিঃশব্দে অজ্ঞাতসারে। যেমন সর্বনাশের পায়ের শব্দ আগে ভাগে কেউ শুনতে পায় না। রোডার মানুষেরাও কেউ জানত না, তাদের মাথার ওপরে ক্রমশ স্তূপাকার হয়ে উঠছে সর্বনাশের কালো মেঘ।

দূর থেকে রোডাকে দেখায় যেন নুয়েমবের্গের কোন নিখুঁত শিল্পীর তৈরি একটি অপূর্ব খেলনা-শহর। এর লাল টালির ছাদ, ছাদে ছাদে মোচড়ানো-বাঁকানো চিমনির মুকুট; ছোট ছোট সবুজ খেত; আঁকিবুকি রেখার মতন আঁকাবাঁকা সরু সরু পথ; পথের মোড়ে মোড়ে পপলার গাছের সারি; মিনার, মন্দিরের মোচার আকারের উঁচু উঁচু চূড়া; হাট-বাজারের মাঝে মাঝে যত্ন করে বানানো সুদৃশ্য বাগান, অঙ্গন আর কুঁজো মতন গির্জাগুলির গথিক স্থাপত্য একে দিয়েছে একটা নিজস্ব রূপ। সে-রূপকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলেছে পিঙ্গলে সবুজে চিত্রিত থিউরিনজিয়ার গভীর অরণ্য। সে অরণ্যের পুরোভাগে চিত্রের মতন সংলগ্ন রোডার অস্তিত্বের ওপর দিয়ে প্রতি মুহূর্তে বয়ে চলেছে সেই চিরচঞ্চল অরণ্যভূমির অন্তরের রহস্যময় বাণী। কখনো তা আন্দোলিত হয়ে দীর্ঘশ্বাসের মতন ভেঙে পড়ছে; কখনো বয়ে যাচ্ছে কানে কানে বলা মৃদু কণ্ঠস্বরের মতন ফিসফিসিয়ে; কখনো মর্মরিত হয়ে উঠছে বিচিত্র প্রলাপে আবার কখনো বা কি এক রোষে টালমাটাল হয়ে ফুঁসে উঠছে, গর্জাচ্ছে।

কিন্তু আজ যেন রোডা প্রতিদিনের মতন নয়। আজ যেন অন্যরকম। দূর থেকেই স্পষ্ট মনে হচ্ছে অসাধারণ কিছু একটার আয়োজন চলছে পূর্ণোদ্যমে। চলায় বলায় আচরণে রঙিন পোশাকে আর উৎফুল্ল মুখে সর্বত্র একটা উজ্জ্বল প্রাণের উচ্ছ্বাস উপচে উঠেছে। দূর থেকেই ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ অথবা টুংটাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে; বাতাসের বেগ মৃদু হয়ে এলে কানে ভেসে আসছে গানের সুর বাজনার শব্দ, সমবেত মানুষের কলরব কোলাহল।

আজ রোডায় ছুটির উৎসব। যে দিনটির জন্যে রোডার মানুষ সারা বছর উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করে, দীর্ঘ বারোমাস পরে গত বছরকার উৎসবের স্মৃতি বয়ে নিয়ে অবশেষে আজ আবার সেদিনটি ফিরে এসেছে। আজ ইস্টার। আজ বসন্তের বাতাসে নিমন্ত্রণের চিঠি।

রোডায় উৎসবের মেলা বসেছে। দূর দুরান্তের থেকে গাঁয়ের মানুষ ভোর না হতে শহরের দিকে রওনা দিয়েছে। সবাই কিছু না কিছু বয়ে নিয়ে আসছে— ফেরিওলা আর চাষীরা আনছে বেসাতি, মেলায় বেচে দু' পয়সা কামিয়ে নেবে; কেউ কেবল খুশী বয়ে নিয়ে আসছে, কিনবে, খরচ করবে, আর করবে ফুর্তি। সবাইর আজ ফুর্তির মেজাজ। ফুর্তির নেশায় পেয়ে বসেছে সবাইকে, সবাই নির্ভার নির্দায় আনন্দে টলমল করছে। এমনকি ভেইমার ও আলটেনবুর্গে যে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে সে সংবাদও বিচলিত করতে পারছে না কাউকে। উৎসবের মেজাজে চিড় ধরাতে পারছে না এতটুকু। তার হেতু খুব পরিষ্কার— ভেইমার আর আলটেনবুর্গ এখান থেকে অনেক দূর অধিকন্তু তাদের মাথার ওপরে উজ্জ্বল রদ্দুর, চারধারে গান আর বাজনার সুর, সামনে রঙিন মেলা। মেলা তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সবার ওপরে তাদের রক্তে ছিল যৌবনের খর বেগ, বুকের রক্ত ছলনিয়ে উঠে কানে কানে কেবল বলছিল— তোমরা তরুণ, তোমরা অমর।

রোডার রাজপথ কৌতুকে কোলাহলে মুখর করে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল জনতার ভিড়। ভিখিরী আর ফেরিঅলা আর যারা কিছু বেচে মুনাফা করতে মেলায় এসেছিল তারা বাদে সকলের পরনেই ছিল উৎসবের পোশাক। বুড়ো বুড়িরাও তাদের কাঁধে বেঁধেছিল উড়ুনি। ছেলেমেয়েরা সেজেছিল রকমারি ফুলে আর মালায়। যুবতীরা চলতে চলতে তাদের চেয়ে যারা বড় তাদের পোশাক দেখে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকাচ্ছিল আর নিজেরা আটো পায়জামা পরা সুডৌল উরু, পা দেখিয়ে অসংকোচে রঙিন অন্তর্বাস বের করে ওড়না উড়িয়ে চলছিল। যুবকরাও ততোধিক অহংকারে উদ্দাম হয়ে চলেছিল মদ আর সুন্দরীর খোঁজে। তাদের মাথায় মখমলের মস্ত মস্ত টুপি, টুপিতে চটকদার পালকের শোভা অথবা রঙিন ফুলের বাহার। তারা সে-পালক অথবা ফুল হয় কেড়ে নিয়েছে কোন যুবতীর কাছ থেকে কিংবা কোন যুবতী স্বেচ্ছায় পরিয়ে দিয়েছে প্রণয় উপহার।

গোটা অঞ্চলের তামাম মানুষ যেন একটা সম্পূর্ণ দিনের সমস্ত সুখটুকু শুষে নিতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাদেরই একটা মস্ত দঙ্গল গল্পগুজবে মশগুল কিংবা হৈ-হুল্লুড় করতে করতে চলেছে মেলার দিকে। সেখানে উৎসবের আনন্দ কৌতুকে কৌতূহলে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উপচে পড়ছিল। হট্টগোল হাততালি, খুশির হা—হা হাসি, ঘণ্টার শব্দ, গলাবাজির আওয়াজ, দূর থেকেই সকলকে

সে-কথা জানিয়ে দিচ্ছিল।

মেলা বসেছে সবুজ উপত্যকার ওপরে—থিউরিনজিয়ার বন আর শহরের মাঝখানটায় বিস্তীর্ণ ঘাসের চত্বরে। সমস্ত চত্বরটা এখন রকমারি জিনিসপত্র, নানা রঙের পোশাক আর উৎসব-মুখর মানুষে মানুষে ছয়লাপ। মেলার মাঝখানটায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বিচিত্র আকারের সব রং বেরং ঝুলনা—তার কোনটা ভীষণ দৈত্যের মতন দেখতে, কোনটা ভয়ংকর রাক্ষসের মতন, কোনটার আবার শরীরটা সিংহের কিন্তু মাথাটা আর ডানা দুটো ঈগলের মতন। এবং ড্রাগনের মতন কোনটা, তার গায়ে বড় বড় আঁশ, কুচ্ছিৎ কালো গলা, টকটকে লাল লম্বা জিভ আর ভাঁটার মতন মস্ত দুটো চোখ। একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে নানা রকমের প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। তার আবার নানা ধরনের ঘর! কোন কোন ঘর আবার পাইনের ডাল গুঁড়ি দিয়ে দোতলা করা হয়েছে। ঘরগুলির দেয়ালে দেয়ালে ক্যানভাসের ওপরে চড়া রংয়ে আঁকা স্থূলরুচির রকমারি ছবি টাঙানো। কোনটা নগ্ন নারীর কোনটা বিকট দৈত্যের। ছবির মাঝে মাঝে পাকা হাতে বানানো ফুলের তোড়া আর তান্ত্রিক আলপনা। প্রত্যেকটা ঘরের সামনেই উঁচু উঁচু মঞ্চ। সেখানে একজন বক্তা থাকে। ঘরের ভিতরে যে-সব আশ্চর্য ব্যাপার-সেপার দেখানো হচ্ছে তারই ফিরিস্তি শোনায় সে। কৌতূহলী জনতাকে নানা রকম কথার কায়দায় লোভাতে চেষ্টা করে। জনতার মন কাড়তে মঞ্চে আরও আকর্ষণ থাকে—রং মাখানো ভাঁড় থাকে, মুখোশ আঁটা সঙ থাকে। তারা নাচে চিৎকার করে। নিচের মানুষের দিকে তাকিয়ে নানারকম অঙ্গ-ভঙ্গি করে, ব্যঙ্গ কৌতুক করে। কখনো একটা লম্বা ডাণ্ডা এনে তার ওপরে ভর করে অদ্ভুত সব কসরৎ দেখায়; তখন পড়তে পড়তে রক্ষে পেলে দর্শকরা খুশী হয়ে হাততালি দেয়। বেটে বামনরা আবার ডাকিনী যোগিনী সেজে আসে মঞ্চে; তাদের পোশাক আর সাজসজ্জাই শুধু নয় তাদের রকম-সকমও ভয় পাইয়ে দেয় জনতাকে। তারা সুযোগ বুঝে মঞ্চের খুব সামনে পেলে কোন সুন্দরীকে হাত বাড়িয়ে ধরতেও যায়। অবশ্য তাতে কোন অঘটন ঘটে না। কেননা আক্রান্ত যুবতী বিহ্বল শব্দ করে তক্ষুনি পিছু হটে তার পুরুষের দুই বাহুর মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় নেয়। পুরুষটি অবশ্য প্রথমে একটু হকচকিয়ে যায় কিন্তু তৎক্ষণাৎ যুবতীতে নিজের বুকের মধ্যে পেয়ে এমন ভাব করে যেন সে একজন বীরপুরুষ, সব সময় নির্ভর করা যায় এমন মানুষ, তরুণীদের দুঃসময়ের সাহস।

দোকানীরা দোকান খুলে বসেছে সার সার। নানান জিনিসের দোকান। রুটি, মিষ্টি বাসন-কোসন পাঁচালীর পুঁথি টাকাকড়ি রাখবার মাটির ভাঁড়। পবিত্র দেশ থেকে আনা স্মারক জিনিসও আছে অনেক। তাছাড়া আছে প্রেমের কবজ, বশীকরণ বাজীকরণ প্রভৃতি মন্ত্রের বই। নানা রকম পানীয়ও বেচছে অনেকে—সরবৎ, মদ, ছাগলের দুধ ইত্যাদি। মেলার মাঝখানে ঝুলনো বিচিত্র ঝুলনাগুলির আসেপাশেও রয়েছে কৌতূহলের আরও নানা আকর্ষণ। এক জায়গায় পুতুল নাচ হচ্ছে, নাচের বিষয়টা প্রণয় ঘটিত। বিশ্বাসঘাতক নায়কের ভূমিকায় যে পুতুলটা, তার চুল আর দাড়ি টুকটুকে লাল আর শনের নুড়ির মতন খোঁচা খোঁচা। তাই নেড়ে নেড়ে সে সারা স্টেজময় হুটপুটি আর ভাঁড়ামি করছে। একটা মস্ত ভিড় সেই কৌতুক দেখতে উপুড় হয়ে পড়েছে সেখানে। তার পাশেই আবার আর একটা মজার খেলা। আধা জন্তু আধা জানোয়ার আকারের একটা বাদামি রংয়ের ভালুক মুখ ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করছে, আর নাচছে, সব ভুলে তাই দেখতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা ভিড়। সেখান থেকে একটু দূরে ভারসাম্যের খেলা দেখাচ্ছে একজন জাদুকর। জমকালো পোশাকের সেই ভীমদর্শন মানুষটার এক হাতে একটি পরীর মতন সুন্দর ছোট্ট মেয়ে। অন্য হাতে রঙিন কাচের কয়েকটা ছোট ছোট বল। সেই বল নিয়ে সে আশ্চর্য সব খেলা দেখাচ্ছে। তার গলায় ঝুলছে একটা সাপ আর মাথায় বসে আছে একটা বাঁদর। বাঁদরটা থেকে থেকে জনতার দিকে তাকিয়ে ভেঙচি কাটছে, কিচির-মিচির করছে। ভিড় সে-খেলা দেখতেও উপচে পড়েছে।

কিন্তু সমস্ত রং তামাসার আকর্ষণ উগ্র হয়ে উঠেছে সেক্সন যুবতীদের কেন্দ্র করে। তারা এসেছে বলেই যে মেলা এমন জমজমাট হয়ে উঠেছে এ ওই মেয়েরাও জানে। তারা খাটো হাতার সাদাসিধে পোশাক পরেছে কিন্তু সে পোশাকের রংয়ের বাহারেও চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অবশ্য কেউ কেউ সাদা পোশাকও পরেছে; কিন্তু সে সাদা পোশাকেও হালকা রংয়ের চটকের অভাব নেই। তাদের চুল প্রধানত হালকা হলুদ অথবা সোনালি। দু একজনের যে কালো চুল নেই তা নয়। সে চুল দুই বেণীতে বেঁধে পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে; তারা কপালের ওপর দিয়ে রঙিন ফিতে বেঁধেছে মাথায়। গলায় পরেছে ফুলের মালা। আবার কেউ বুকে এঁটেছে ফুলের গুচ্ছ। এইসব গরবিনী নাগরিকাদের চলন-ভঙ্গিতে সোচ্চার একটা অবজ্ঞা আছে যেন গ্রাহ্য নেই কোন কিছুতে, কিংবা আগ্রহ। কিন্তু চটুল চোখ দুটি সর্বদা সতর্ক, সে-সতর্ক চোখে এড়াচ্ছে না কোন কিছুই।

রোডার এই মেলাকে প্রেম-প্রণয়ের লীলাভূমি বললে ঠিক বলা হয়। সর্বত্র চলে রাগ-অনুরাগ ভালবাসাবাসির খেলা। আসলে এই উদ্দেশ্যেই মেলা। এই বছরান্তিক মিলন উৎসবের মাধ্যমেই হয় মন জানাজানি, বাগদান, প্রণয়, পরিণয়। আসলে অবাধ মেলামেশার এমন ঢালাও সুযোগ বছরে এই একবারই আসে। আর সেই টানেই এদিনটিতে শহরের দিকে ছোটে দূর দূরান্তের মানুষ। গ্রাম গঞ্জ থেকে শহরের দিকে মানুষের স্রোত বইতে থাকে একটানা।

সকলেই আনন্দ-মুখর, হাসিতে খুশিতে মশগুল। প্রত্যেকের মন অন্য সব চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আনন্দ মুখর বর্তমান মুহূর্তটিতে লগ্ন—মগ্ন হয়ে আছে। চিত্তহারী আনন্দ, ক্ষণিক মিলন, প্রণয়ক্রীড়া, চটুল কটাক্ষ—ক্ষণিকের জন্যে আচ্ছন্ন বিহ্বল করে ফেলেছে মানুষকে। মেলার এই অবাধ আনন্দের সবটুকু সুখ সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে শুষে নিতে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সকলে যে, আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তনের দিকে কারোরই নজর পড়েনি। হাওয়ার উত্তাপ কমে গেছে, ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। যে-কালো মেঘ এক ফোঁটা কাজলের মত পূবের আকাশে দেখা দিয়েছিল সবার অলক্ষ্যে সে এতক্ষণে সমস্ত আকাশ গ্রাস করে ফেলেছে—ক্রমশ ভীষণ হয়ে উঠছে তার মূর্তি।

একটি বিষণ্ণ চেহারার বুড়ো শানাই বাজাচ্ছিল আর তার তালে তাল দিয়ে নাচছিল একদল ছেলেমেয়ে। সেই নৃত্যপর ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে দুটি উচ্ছল সুন্দরী হঠাৎ বেরিয়ে এল।

—ওই ছ্যাবলা ছাত্র দুটো কী বলছিল শুনেছিস এলসা। হরিণ-নয়না শ্যামলা মেয়েটি প্রশ্ন করল তার সঙ্গিনীকে। বললে, যাই বলিস ছেলে দুটি কিন্তু দেখতে বেশ, আমার ত তাই মনে হয়, বিশেষ করে ওই কোঁকড়া লম্বা চুল ছেলেটি।

—হাঁ। কিন্তু কি ঘেন্না দেখ, দাসী-বাঁদীদের দিকেই ঝোঁক ওদের, নাক সিটকে বলল সঙ্গিনী, অথচ ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গ চাইলে সে অনায়াসেই পেতে পারত।

হঠাৎ একটা সরু গলার তীক্ষ্ণ শব্দে তাদের গোপন আলাপ থেমে গেল। একটা চালাঘরের সামনে থেকে একটি শুকনো বিবর্ণ বুড়ি ডাকছিল তাদের। সে চালাঘরটার সামনেই বসেছিল। ওইখানে বসে সে মানুষের ভাগ্য গণনা করে, প্রেমিক প্রেমিকাদের ভবিষ্যৎ বলে দেয়।

চিলের মতন চিৎকার করে বুড়ি বললে, বাঃ একটা বছরের মধ্যেই দেখছি

বেশ ডাগর আর সুন্দরী হয়ে উঠেছ তোমরা। কি নির্মল নিষ্পাপ রূপ তোমাদের। তোমাদের চোখে চোখ পড়লে কোন ছেলে আর স্থির থাকতে পারবে না। না গো না অমন গুমর করো না, বুড়ি মা দোষের কিছু বলছে না। কী চাই তোমাদের —কবচ, জলপড়া, উপদেশ? যা চাও সব পাবে, এস বুড়ির কাছে।

—এই আগাথা শিগ্‌গির পালিয়ে আয়, এলসা চেঁচিয়ে উঠল, এত লোকজনের সামনে ওই বুড়ি ডাইনীটার কাছে গেলে আমি লজ্জায় মরে যাব।

তারা তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে জাদুকরের তাঁবুর দিকে চলে গেল। জাদুকর তখনও মুগ্ধ এক বিরাট জনতার সামনে খেলা দেখাচ্ছিল।

—তবে এটা ঠিক, একটু থেমে বললে এলসা, গত পরবের দিনে ওই ডাইনী বুড়িটাই আমার ভাবী বরকে একেবারে রক্তমাংসের শরীরে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়েছিল। আমি যা ভয় পেয়ে গেছলাম না!

—আমার ভাগ্য ভাই মোটেই ভাল নয়, বললে আগাথা, জাদু-আয়নায় সে আমার ভাবী বরকেও দেখিয়েছিল, সৈনিকের পোশাক পরা ভারি চমৎকার চেহারার মানুষটি। কিন্তু কত খোঁজলাম সেই থেকে মানুষটিকে কোথাও পেলাম না। যাক্, আয়, জাদুর খেলা দেখি।

সেই বুড়ি তখনও চেঁচাচ্ছিল, আমি যে বুড়ি হয়েছি তবু ত বেশ শুনতে পাই, তোমাদের কানে ত আরও ধার থাকার কথা, শুনতে পাও না? ফিরে এস। বুড়ির কথা শোনো। তোমাদের একজন সামনের বছর আর আমাকে দেখতে পাবে না। তার কপালে কালো তারা ফুটেছে।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মেয়ে দুটি শিউরে উঠল, কাঁপতে থাকল ভয়ে। জাদুকরকে ঘিরে কৌতূহলী জনতার মস্ত ভিড়। জাদুকর খেলা দেখাচ্ছে— যখন সে শূন্যে ডিগবাজি খাচ্ছিল, যখন সে লাফ দিচ্ছিল তখন তার বলিষ্ঠ পেশীগুলি এমনভাবে বেঁকে কেঁপে কঠিন হয়ে উঠছিল যেন তাদেরও আলাদা একটা জীবন আছে।

—সব সেরা জাদুকর, একজন দর্শক আর একজনকে বললে, আমি অনেক ত দেখলাম। এমনটি আমার কখনো চোখে পড়েনি, লোকটা সেক্সন নয়।

—না, আমার মনে হয় ওর দেশ ইটালি। মাস দুই আগে ওকেই আমি ভেইমারে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

—ভেইমার। যেখানে প্লেগ লেগেছে!

একটি তরুণ ছাত্র তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, শুনে হেসে উঠল, বললে,

প্লেগ, উহুঁ মশায়, প্লেগ ফ্লেগ কিছু না। গুজব মশাই গুজব, ধর্মযাজকরা গুজব ছড়াচ্ছে যাতে মানুষ ভয় পায়, যাতে তারা গির্জায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

—না না বাপু, এসব সাংঘাতিক মহামারী মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা করো না। ওদের পেছন থেকে একজন বুড়ো রাখাল বলে উঠল, আমার ছোটবেলায় ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, একবার ভয়ানক মড়ক লেগেছিল আমাদের এই দেশে। এমন একটা পরিবার ছিল না যাদের দু' চারজন সে মড়কে মরেনি। সে এক ভয়ংকর দুর্বচ্ছর। ভগবান করুন আমাদের যেন না সে দুর্দিন আসে।

এই সময়ে জাদুকর একটা নতুন খেলা দেখাবার জন্যে একটু পিছু হটে কয়েক পা ছুটে এগিয়ে আসছিল। সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল। জাদুকর ছুটে এসেই এক আশ্চর্য কৌশলে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হঠাৎ শূন্যে উঠে গিয়ে তিনটে পাক খেল তারপর দু হাতের ওপরে ভর করে নেমে এল মঞ্চে আর এক অলৌকিক ভঙ্গিতে ধনুকের মতন বেঁকে গেল পেছনে, এক অর্ধবৃত্ত হল তার শরীর। তুমুল হাততালির মধ্যে সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, সগর্বে হাত তুলে অভিবাদন জানাল জনতাকে।

বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, বলে জনতা তাকে বাহবা দিতে লাগল। কিন্তু জনতার সে বাহবায় জাদুকরের মধ্যে যেন আর কোন নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হল না। জাদুকরের মধ্যে হঠাৎ যেন কী একটা পরিবর্তন দেখা দিল। তার রক্তাভ সুডৌল শক্ত স্বাস্থ্যের শরীর সহসা হাতির দাঁতের মতন নিরক্ত সাদা হয়ে গেল। তার চোখের কোল কালো হয়ে উঠল। তার গোঁফের ধারে মৃত্যুর নীল চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার হাঁটু কাঁপতে থাকল। সে কাঁপতে কাঁপতে পেছনে হটে গেল তারপর যেন তার সমস্ত শক্তি এক করে নিজেকে সে শক্ত করল। তার চোখের বিহ্বল শিশুর মতন চাহনি ঘুরে গেল একবার চারধারে। কোনমতে গুটি তিনেক পা এগোতে পারল সে তারপরে কিছু ধরবার জন্যেই যেন হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সামনে এবং তক্ষুনি একটা নিশ্চল মাংসের স্তূপের মতন উবুড় হয়ে পড়ে গেল। যেন কেউ তাকে কুড়ুলের এক কোপে ধরাশায়ী করে দিলে।

একজন ছুটে গিয়ে তার বুকে কান পেতেছিল। মুখ চুণ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ওর বুকের দুবদুবি থেমে গেছে, মরে গেছে মানুষটি। তারপর কী মনে হতেই ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অনড় শরীরটার সামনে থেকে ত্রস্ত পায় পিছু হটতে হটতে ভয় পাওয়া গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল—এ নিশ্চয় প্লেগ, সে আমাদের

মধ্যে প্লেগ নিয়ে এসেছে।

জনতার মধ্যেও সে-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ল, একটা ভয়ের গুঞ্জন জেগে উঠল—প্লেগ! সর্বনাশ প্লেগ!

একটি ছাত্র এগিয়ে এসে বললে—না না মশায়, আপনারা ঘাবড়াবেন না। এই হতভাগা নিশ্চয় তার শেষবারের ডিগবাজিতে বুকে চোট খেয়েছিল, তাইতেই মারা গেছে। এ কিছুতেই প্লেগ হতে পারে না। দেখুন। সে জাদুকরের জরিদার রঙিন জামাটা বুকের কাছে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল, কিন্তু ছিঁড়ে ফেলেই চমকে উঠে সরে গেল সামনে থেকে, পিছু হটতে থাকল, যেন সাপ দেখছে সে, সাপটা যেন ফণা তুলে তাড়া করেছে তাকে। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তার পায়ের তলার মরা মানুষটার মতনই নিরক্ত ফ্যাকাশে।

জাদুকরের ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে বুকের ওপরকার বিভিষীকার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। ছোট ছোট লাল গুটির পরিষ্কার ছত্রাক। সে চিহ্ন কোন ছাত্র যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে না, কোন মানুষ পারে না ঘষে মুছে ফেলতে।

ভীত সন্ত্রস্ত জনতা নিঃশব্দে দ্রুত ছত্রভঙ্গ হযে পড়ল। যেতে যেতে আশঙ্কার ভীরু চোরা চাহনি বুলিয়ে গেল ভুঁয়ে পড়া নিশ্চল জাদুকরের ওপরে—যেখানে কিছুক্ষণ আগেকার অসামান্য শক্তির অভিব্যক্তি চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। পরীর মতন সুন্দর মেয়েটি তার বুকের ওপর পড়ে হাহাকার করছে আর বাঁদরটা তার মাথার কাছে বসে মুখ বিকৃত করে ক্রমাগত কিচির-মিচির করে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

দুঃসংবাদের যেমন দস্তুর—আগুনের মতন কয়েক মুহূর্তে আনন্দমুখর উপত্যকার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। একটা তীক্ষ্ণ কান-ফাটা চিৎকার সমস্ত হৈ-চৈ আনন্দ কলরব ছাপিয়ে ঝনঝন্ করে বেজে উঠল, উদ্বেল চঞ্চল উৎসব-মগ্ন জন-সমুদ্র সহসা সে আর্তনাদে মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল।

সেই ভবিষ্যৎ-বক্তা বুড়ি এইবার উঠে দাঁড়িয়েছে, আকাশের এক কোণে হাত তুলে চিৎকার করে বলছে, দেখ, ওইদিকে দেখ, দেখ শয়তান তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমাদের মাথার ওপরে আকাশের দিকে চোখ মেলে চাও। শয়তান রোডার মানুষদের দেখছে। সে রোডার সব মানুষকে বুকে জড়িয়ে ধরবে বলে দু' হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শয়তান হাসছে।' বলে সে নিজেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির বেগে তার শরীর টালমাটাল হতে থাকল।

বুড়ি আকাশের যে দিকটায় আঙুল বাড়িয়ে দেখাচ্ছিল সেদিকে যারা

তাকিয়েছে তারা সত্যি একটা অলক্ষুণে লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল।—প্রায় গোটা আকাশ জুড়ে একটা কালো মেঘের বিপুল স্তূপ। তার চারধার থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে একটা অতিপ্রাকৃত নীল জ্যোতি, তার দু' পাশে রক্তাভ কালো মেঘের বিশাল দুটি বাহু। বাহু দুটো যেখান থেকে বেরিয়েছে তার ওপরে এক খণ্ড মেঘ দেখতে ঠিক প্রকাণ্ড একটা মাথার মতন তাতে আবার দুটো শিংও চোখে পড়েছে তাদের। মোদ্দা কথা একটা বিশাল মেঘের ভয়ংকর মূর্তি যেন ধেয়ে আসছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বাহু দুটি আরও বিশাল হচ্ছিল বুঝি সব শুদ্ধ গোটা শহরটাকেই সে একসঙ্গে সাপটে ধরে লুফে নেবে এই তার মতলব।

২

রোডার এই সুন্দর শহরটির ওপরে শয়তানের সেই ক্রূর দৃষ্টিপাতের পরে বড় জোর সপ্তাহখানেক কেটেছে। মাত্র সেই সাতটা দিনেই শহরটির কী বিপুল পরিবর্তন। আনন্দ-মুখর প্রাণচঞ্চল সে-শহর আর নেই। বৎসরাধিক শত্রু বেষ্টিত থেকে ক্রমাগত শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করেও এমন দশা হয় না কোন শহরের; কারণ তখন শত্রু থাকে বাইরে, আক্রমণ হয় তার ওপরে বাইরে থেকে ভিতরটা তাই তার অক্ষতই থাকে শক্ত সুস্থই থাকে; কিন্তু এত তা নয়, এ সর্বনাশের জন্মই হয়েছে ভিতর থেকে, প্রবলও হচ্ছে সে ভিতরে ভিতরেই। নিঃশব্দে অদৃশ্যভাবে তার অজ্ঞাত পদক্ষেপ সর্বত্র সঞ্চারিত হচ্ছে। তার নিঃশ্বাসে বিষ। সে বিষে নিমেষে নিমেষে ঢলে পড়ছে মানুষ। কে যে কখন কোথায় ঢলে পড়বে কেউ জানে না।

এখন আর হাটে বাজারে পথে প্রান্তরে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে কিংবা গল্প আড্ডা মারতে দল বেঁধে বেরোয় না মানুষ। বাইরে যদি বা কারো পায়ের শব্দ শোনা যায়, দেখা যায় একসঙ্গে কয়েকজনকে চলতে, দেখা যাবে, তারা চলেছে নিঃশব্দে, বহন করে নিয়ে চলেছে কোন আত্মীয়ের মৃতদেহ। অথবা অত্যাবশ্যক কোন কাজের তাড়ায় কাউকে যদি বেরোতেই হয়, সে বেরোয় অতিশয় সন্তর্পণে, [illegible] দ্রুতগতিতে আর ক্ষণে ক্ষণে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে এমন [illegible] ভয়ে তাকায় [illegible] তাকে তাড়া করে আসছে সেই ভয়ংকর ছায়াটা, মৃত্যুর ছায়াটা; সে যাতে তার নাগাল না পায়, তার ঠোঁটে তার
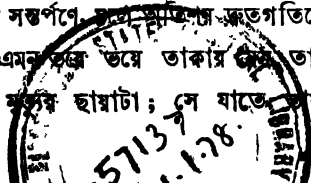
হিমশীতল আঙুল না বুলিয়ে দিতে পারে সে ছোটে ওইরকম—ত্রস্ত পায় চকিত চোখে।

গির্জায় গির্জায় অনবরত চলছে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রার্থনা। রাস্তায় রাস্তায় দিনরাত পুড়ছে মালসা মালসা কয়লা আর গন্ধক। আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে সর্বত্র। আশা, যেন ওই আগুনে পুড়ে মহামারী ছাই হয়ে যাবে। ধর্মযাজক আর বক্তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথবা দু' পাঁচজনকে কোথাও জড় হতে দেখলেই এগিয়ে যাচ্ছেন, সকলকে উপদেশ দিচ্ছেন, উপোস করতে, প্রার্থনা করতে, যে পাপকার্যের জন্যে তাদের এই শাস্তি তার জন্যে অনুতাপ করতে—বলছেন, ঈশ্বরই একমাত্র সর্বশক্তিমান, তিনিই কেবল এই সর্বনাশ থেকে তোমাদের উদ্ধার করতে পারেন।

কিন্তু সকল প্রার্থনা, ঈশ্বরের নামে সমস্ত শপথ ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগল। অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে মহামারী, তার থামবার থিতনোর নাম নেই। নির্জন শহরের নিস্তব্ধতা আরও নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠেছে। কেউ আর ঘরের বার হয় না। ক্রমশ এ অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠল, হতাশায় অবশেষে মরিয়া হয়ে উঠল মানুষ। বদ্ধ ঘরে একলা নিজে ভয়াবহ চিন্তার মুখোমুখি বসে থাকার চেয়ে তারা সমব্যথীর সঙ্গ খুঁজতে, গুজবের আলোচনা করতে, সর্বোপরি এই সর্বনাশা মৃত্যুর প্রতিকার জানতে পুনরায় রাস্তায় নেমে এল। দলে দলে সকলে খোলা জায়গায় জড়ো হতে থাকল। বাপ ঠাকুর্দাদের সময়ে কী [illegible] প্রতিষেধক ব্যবহার হত একে অন্যের স্মৃতির সাহায্য নিয়ে তাই মনে করতে চেষ্টা করতে লাগল, তুলনা করে দেখতে লাগল তার গুণাগুণ, ব্যবহার করে পরখ করতে লাগল তার ফলাফল।

যখনই পথে কোন ধর্মযাজককে দেখা যেত, দেখা যেত তার পেছনে পেছনে চলেছে বিরাট এক জনতা; যখনই তিনি কিছু বলছেন, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছে তারা, জনতার দিকে প্রসারিত যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তিকে চুম্বন করতে আকুল হয়ে উঠছে।

কারণ মৃত্যু আজ ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছে। ধনী দরিদ্র শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে আজ সকলে তার অসহায় শিকার। প্রাণ প্রাচুর্যে ঝলমলে জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে শক্তিমান তরুণ কিংবা সুন্দরী তরুণী যে যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে-মাটির ওপরই সহসা দুর্বল বিকলাঙ্গ মানুষের মত মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে, আর উঠছে না।

আশা যেন সম্পূর্ণ নিভে গেছে রোডা থেকে ; কিন্তু একটি মানুষের নামের সঙ্গে তার শেষ রেশটুকু বুঝি এখনো লেগে রয়েছে। মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি নাম। তাদের বিশ্বাস প্রতিকার প্রতিবিধান যদি সম্ভব হয় ত ফাউস্টের পক্ষেই সম্ভব।—শিক্ষাগুরু চিকিৎসাবিদ ফাউস্ট যেন তাদের শেষ আশ্রয় এখন, অন্তিম নির্ভর।

গলায় ও হাতায় লোম লাগানো কালো লম্বা আলখাল্লা গায়ে, মখমলের টুপি মাথায়, গিঁটঅলা ছড়ি হাতে মানুষটি শহরের একজন অতি পরিচিত ব্যক্তি। প্রগাঢ় বিদ্যা ও মানুষের প্রতি অসীম দরদের জন্যে এই প্রবীণ জ্ঞান-তপস্বীর খ্যাতিও অশেষ। তাঁর নিবিড় শ্বেত শ্মশ্রু আবক্ষ বিলম্বিত থাকে, তাঁর অবিন্যস্ত শুভ্র কেশ প্রশস্ত ললাট আবৃত করে রাখে, তাঁর কালো দুটি চোখ বেদনায় সব সময় করে ছলছল ; কিন্তু চোখের তারায় তারায় জ্বলজ্বল করে এক দিব্য বিভা যার দীপ্তি জীবনের একমাত্র কাম্য জ্ঞানান্বেষণে নিবিষ্ট। মানুষের সাধারণ জীবনের আয়ুষ্কাল অনেকদিন তিনি পার হয়ে এসেছেন কিন্তু জীবনের শুরুতে যে আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা নিয়ে তিনি জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে উৎসাহে এ-বয়সেও তাঁর ভাটা পড়েনি। ভেইমার ও পাদোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কাল থেকে আজও অনাহত অক্লান্ত চলেছে তাঁর অনুশীলন অন্বেষণ জিজ্ঞাসা।

বড় বড় থাম ও খিলানওলা এক সেকেলে পুরোনো বাড়িতে বাস করেন তিনি। অসমান পাথরের কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে তাঁর ঘর। ওক কাঠের নিচু ছাদওলা এই ঘরে তিনি প্রকৃতির আঁচলে প্রচ্ছন্ন জীবনরহস্য উন্মোচন করার সাধনায় অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণে মগ্ন থাকেন। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে একদা তিনি য়োরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেরিয়েছেন ; অধ্যয়ন করেছেন ভেষজবিজ্ঞান, দর্শন, ভগবদ্‌তত্ত্ব, রসায়ন। একদা তিনি ভোজ-বিজ্ঞানের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন—ইন্দ্রজাল সামুদ্রিক বিদ্যা, ডাকিনী বিদ্যা, স্ফটিক দর্পণ-বিদ্যা ইত্যাদিও আয়ত্ত করেছিলেন তিনি ; কিন্তু সে সব অপরিণত বয়সে অনেকদিন আগে। পরবর্তীকালে শাস্ত্রসম্মত নয় জেনে তিনি সেসব বিদ্যাচর্চা ত্যাগ করেছেন। এখন তাঁর কেবল অতন্দ্র বিজ্ঞানসাধক।

ঘরখানার সবটুকু জায়গা জুড়ে নানারকম যন্ত্রপাতি—অদ্ভুত আকারের সব বকযন্ত্র, পরিস্রুত করার পাত্র, বেঁটে মোটা কুঁজো সোজা সব স্ফটিক-আধার, নল ও নানাবিধ ধাতববস্তু—তার কোন কোনটার সঙ্গে সংলগ্ন আবার স্ফটিক গোলক

নল অথবা স্ফটিক বর্তুল কি অন্য কিছু। চারধারের দেয়ালে বিশৃংখলভাবে ঝুলছে চামড়ার কাগজ তাতে আঁকা রয়েছে নানা নক্সা ও রেখাচিত্র। কোন কোনটাতে মানুষের কংকাল, পঞ্চভূজক্ষেত্র জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক চিহ্ন ইত্যাদি। একটিতে সৌরমণ্ডলের চিত্র আঁকা, তার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ; মণ্ডলের বহুধাবিভক্ত পরিধির নানা খোপে মানুষটিকে বেষ্টন করে লেখা রয়েছে বিবিধ সাংকেতিক জ্যোতিষাঙ্ক।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও ঘ'র ঢুকেই যা সর্বাগ্রে চোখে পড়ে সে হল বই। সেল্‌ফ থেকে মেঝে পর্যন্ত সর্বত্র বই। ঘরের কোণে কোণে মেঝেয় ইতস্তত কেবল পুঁথি-পত্রের স্তূপ। সমস্ত ঘরখানা জুড়ে যেন কেবল পুঁথি পাণ্ডুলিপির রাজত্ব। এইসব রচনাবলী যেমন বিচিত্র আকারের তেমনি বিচিত্র প্রকারের। যত রকম কল্পনা করা যায় বাঁধাইও তত রকমের—কাঠ, মোটা গরুর চামড়া, পাতলা কাগজের মতন চামড়া, সাপের চামড়া ইত্যাদি ত আছেই একটা বই আছে মানুষের চামড়ায় বাঁধানো। একজন খুনের ফাঁসি হয়ে গেলে তার পিঠের চামড়া খুলে তাই দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল পুঁথিখানা।

এইসব গ্রন্থরাজি ফাউস্টের সন্তান। অবসরের সবটুকু সময় তিনি এদের মধ্যে যাপন করেন। এবং কখনোই তিনি নিজেকে এতটুকু অন্যমনস্ক হতে দেন না কারণ কোন্ মুহূর্তে যে তিনি একটি নতুন সত্যে এসে পৌঁছবেন, কখন যে তাঁর জ্ঞান-পিপাসা কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হবে কে জানে! কে জানে কখন তিনি এমন একটি সত্যে উপনীত হতে পারবেন, যে-সত্য থেকে সম্ভূত হবে নবতর অনুধ্যান, সম্ভব হবে আধুনিকতম আবিষ্কার যাতে করে তিনি সাধন করতে সমর্থ হবেন মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণ। কেননা ফাউস্ট ছিলেন মানবপ্রেমিক—সেই দুর্লভ জাতের মানুষ অগাধ গূঢ়-বিদ্যা যাঁকে কাপালিক করে তোলেনি তোলেনি প্রভুত্ব পিপাসু অমানুষ করে। তাঁর অন্তরে প্রেম ও ভগবদ্‌বিশ্বাস তখনও অনির্বাণ, উজ্জ্বল। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছে ঠিক কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি তার প্রীতি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

তাঁর চারদিককার কর্ম মুখর চঞ্চল জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম। যাদের মধ্যে তিনি বাস করতেন তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা তাঁকে গভীর ভাবে নাড়া দিত। তিনি সকলের কথা শুনতেন। সকলেই তাঁর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করত। যাঁরা তাঁকে বিশেষ ভাবে জানত তারা তাঁর কাছে তাদের গোপন মনের পাপ পর্যন্ত স্বীকার করত। পাপ কবুল করে মুক্তির প্রার্থনা

জানাত, তিনি তাদের ধর্মগুরু হয়ে উঠতেন। মানবতার প্রতি তার অকপট সম্ভ্রম-বোধ ও আন্তরিক ভালবাসা এবং তাঁর অগাধ জ্ঞান ও বিপুল পাণ্ডিত্য তাকে শুধু জনপ্রিয় ও পরম শ্রদ্ধেয়ই করে তোলেনি, তৈরি করেছিল তাঁকে কেন্দ্র করে এক পরমবিশ্বাসের আশ্রয়। এমন ব্যক্তি নিজের শহরে আকস্মিক মহামারীর আক্রমণ দেখে বিচলিত হবেন বই কি! তাঁর আহার-নিদ্রা, দিন রাত্রির ব্যবধান-বোধ উবে গিয়েছিল। একটা সম্পূর্ণ সপ্তাহ ধরে তিনি এই মড়কের প্রতিষেধ সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সেই দীর্ঘ দিনরাত্রির অতন্দ্র তপস্যার সিদ্ধি এখন গবেষণাগারের বকযন্ত্র থেকে পরিস্রুতকরণ পাত্রে নিষ্কাশিত হচ্ছে। তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। তার দৃষ্টির সম্মুখে একদিকে বকযন্ত্র আর একদিকে একখানা বিরাটাকার বাইবেল, গ্রন্থখানির একটি স্তোত্রাংশ খোলা, পরিস্রুত-করণের বিভিন্ন পর্যায়ের অবসরগুলিতে তিনি গভীর নিষ্ঠার স্বরে বাইবেলের সেই স্তোত্রাংশ আবৃত্তি করছেন। এক সময় তদ্গত কণ্ঠে বলে উঠলেন—ভগবান আমার সহায় হবেন। কেননা, এ মড়ক ঈশ্বরের অভিশাপ নয়, শয়তানের অনাসৃষ্টি। তিনি তাঁর বালু-ঘড়ির দিকে তাকালেন তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন নির্মীয়মাণ ভেষজ। সে এখন বকযন্ত্র থেকে চুইয়ে চুইয়ে বাদামী বাষ্পাকারে জমছিল সংলগ্ন একটি পাত্রে। পাত্রের শীতল স্পর্শে অবশেষে বিন্দু বিন্দু জলকণায় রূপান্তরিত হয়ে পাত্রের তলায় গড়িয়ে পড়ছিল। দেখতে দেখতে তিনি বলে উঠলেন—ব্যাস হয়ে গেল। স্ফটিক নলটি বকযন্ত্র থেকে খুলে ফেললেন তিনি, ভেষজ-পূর্ণ স্ফটিক আধার তুলে ধরলেন চোখের সামনে। আলোর দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। ভেষজের বাদামী রং সূর্যের আলোয় রক্তাভ স্বর্ণের মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তপ্ত তরল ভেষজ তখনও ফেনা কাটছে।

আরোগ্যের এই উপায়টিকে তুমি আশীর্বাদ কর ভগবান। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, কেবল তুমিই পার আমাদের উদ্ধার করতে। তিনি প্রসারিত হাতে কাচ-পাত্রটিকে উর্ধ্বে তুলে ধরলেন। তারপর কতকগুলি ছোট ছোট শিশি এনে সেই উষ্ণ তরল পদার্থে পূর্ণ করতে থাকলেন শিশিগুলি।

ভগবান তুমি সদয় হও, আমাদের রক্ষা কর তুমি—শেষ শিশিটিতে ছিপি আঁটতে আঁটতে নিশ্বাস ফেললেন ফাউস্ট।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে সিঁড়িতে কার দুপ্ দাপ্ পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে যেন পড়ি কি মরি করে ছুটে আসছে। পরমুহূর্তে দারুণ জোরে বেজে উঠল তাঁর দরজার কড়া। দ্রুতনিশ্বাস নেওয়ার শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি উঠে

এসে ফাউস্ট দরজার পাল্লা দুটো হাট খুলে ধরলেন। একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। বছর চৌদ্দ বয়েস হবে। বিষণ্ণ মুখ, শীর্ণ শরীর, জীর্ণ পোশাক, খালি পা। অনেক দূর পথ প্রাণপণ ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপাচ্ছিল। দুটি বড় বড় চোখে অনেক রাত্রিজাগার কালি। চোখদুটি বেয়ে তার অবিরল জল গড়াচ্ছিল। সে ছুটে এসে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল ফাউস্টের সামনে। আকুল হয়ে বলল—ওগো, বাঁচাও আমার মা যে মরে যাচ্ছে।

—বাজারে যে ফুল বেচত সেই কী তোমার মা? জিজ্ঞেস করলেন ফাউস্ট।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে উঠল মেয়েটি।

—ক'দিন থেকে ভুগছে সে?

—আজ তিনদিন। এ প্লেগ নয়, না? ফাউস্ট একি প্লেগ? সে মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করল যেন ওই প্রশ্নের জবাবের ওপরেই তার মায়ের ভাগ্য ঝুলে আছে।

ফাউস্টের মুখখানা মমতায় করুণ হয়ে উঠল, বললেন, কে বলতে পারে? কখনো কখনো আক্রমণ মাত্রই শেষ হয়ে যায় মানুষ; কখনো কখনো শয়তান আবার তার মুখের গ্রাস নিয়ে অনেকদিন খেলাও করে। তাই বলে একেবারে ভেঙে পড়ো না মা, তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, (কারণ মেয়েটি তাঁর কথা শুনে আর্তনাদ করে উঠেছিল)। আমি এক্ষুনি তোমার সঙ্গে যাবো। তাকাও, সান্ত্বনার স্বরে বলে উঠলেন, এই যে শিশি দেখছ এতেই আছে ওষুধ, ভগবানের নির্দেশে এটা আমি তৈরি করেছি। ভগবান কৃপা করলে তোমার মা নিশ্চয় বেঁচে উঠবেন, শয়তান নিশ্চয় হেরে যাবে। এস মা, আমাকে নিয়ে চল তোমার মায়ের কাছে।

মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা হাত বাড়িয়ে ধরে সে ভয়ে বিস্ময়ে বড় বড় দুই ভীরু চোখ মেলে তাকিয়ে রইল দুপলক, তারপরেই আশায় বিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ, হাসি ফুটল ঠোঁটে। পরম আনন্দে চোখ ফেটে কান্নার বন্যা নেমে এল। সে আবেগে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তাঁর দু'হাত হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে চুমু খেল। তার আনন্দের অশ্রুবিন্দুতে ভিজে গেল ফাউস্টের হাত।

৩

শহরের এক হতদরিদ্র অঞ্চলে এক বস্তির অন্ধকার ঘরে ফাউস্টকে নিয়ে এল মেয়েটি। ঘরখানার দিকে তাকালেই বোঝা যায় কী দৈন্য আর কৃচ্ছ্র সাধনার জীবন এদের। সামান্য কিছু আসবাব—একটা টেবিল দুখানা চেয়ার। যৎসামান্য বাসন কোসন—গোটা কয়েক কাপ প্লেট কয়েকটা ঘটি বাটি; মেজে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে। তারপর আছের মধ্যে একটা নিচু তক্তাপোশ। তক্তাপোশখানা ঘরখানার প্রায় সবটুকু জায়গা জুড়ে আছে। তক্তাপোশের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে একজন—মেয়েটির মা। তার চামড়া বিবর্ণ, শরীর কঠিন, এমন ঋজু ও নিঃস্পন্দ পড়ে আছে যেন কাপড়ে ঢাকা একটা কংকাল। তার বুক পরীক্ষা করবার আগে পর্যন্ত ফাউস্টের মনে হয়েছিল বুঝি স্ত্রীলোকটি মরে গেছে, তারপর বুকে হাত রেখে বুঝলেন ধুকপুকিটা এখনও থেমে যায়নি একেবারে, মনোযোগ দিলে টের পাওয়া যায় যতই মৃদু হোক বুকের মধ্যেটা এখনও নড়ছে কাঁপছে।

মেয়েটি বলল, আজ সারাদিন এমনি করে পড়ে আছে মা, নড়ছে না কথাও বলছে না।

ফাউস্ট স্ত্রীলোকটির পাশে বসলেন। দু'হাতে তুলে ধরলেন তাকে, ঝুঁকে পড়ে তার চোখ পরীক্ষা করলেন, তখনও স্ত্রীলোকটির শরীরে চেতনা আছে বলে মনে হচ্ছিল না।

ফাউস্ট মেয়েটির দিকে তাকালেন—একটা বাটি আন ত মা।

মেয়েটি তার হাতে একটা বাটি এগিয়ে দিল। রোগী পরীক্ষায় ফাউস্টের দক্ষতা দেখে মেয়েটির চোখ তখন আশায় বিশ্বাসে চকমক করছিল। ফাউস্ট শিশি বের করে ছিপি খুলেছেন ইত্যবসরে। শিশি থেকে বাটিতে গুণে গুণে দশটি ফোঁটা কেটে বললেন—একটু জল নিয়ে এস।

মেয়েটি জল এনে দিলে তিনি ওষুধে আধবাটি জল মেশালেন। তারপর স্ত্রীলোকটির ঠোঁটের কাছে ধরলেন বাটি কিন্তু গিলবে কে! তার দাঁত দুপাটি কঠিন হয়ে লেগে গেছে। তিনি তখন জোর করে তাকে হাঁ করালেন, মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরে গলায় ঢেলে দিলেন ওষুধটা। তারপরও ধরে থাকলেন তাকে, সতর্ক চোখ পেতে থাকলেন তার চোখের ওপরে। মেয়েটি তখন ঝুঁকে পড়েছে। উৎকণ্ঠায় তার দম বন্ধ হয়ে গেছে। সে ক্রমাগত হাত কচলাচ্ছিল।

অনিশ্চিত মুহূর্তগুলি যেন আর কাটছিল না তার।

ওষুধটার কার্যকারিতার কোন আভাসই প্রথমে চোখে পড়ছিল না; কিন্তু ধৈর্যের বুঝি ফল ফল, ফাউস্ট যেন কী দেখতে পেলেন। হাত তুলে সতর্ক করে দিলেন মেয়েকে। মনে হল তার মা যেন মাথাটা একটু নাড়ল। খুব সামান্য একটু ঘাড় ফেরালো সে। তার চোখ খুলে গেল। শক্ত চোয়াল নরম হল, খুব বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল সে। চেতনার চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখে। তিরতির করছে চোখের পাতা। মুখে জীবনের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ঘোর কেটে আসছে চোখের।

—মা গো, মা! ফিসফিস করে ডেকে উঠল মেয়ে। পাছে জীবনের ক্ষীণ সূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায় সে গলা ছেড়ে বুক ভরে ডেকে উঠতে পারল না।

মা তার দুর্বল বাহু দুটি বাড়িয়ে দিল যেন কিছু একটা ধরতে চাইল সে। তার চোখ দুটি যেন অনেক দূরের কী দেখছে। তার ঠোঁট দুটি নড়ছে অল্প অল্প যেন অদৃশ্য কারো সঙ্গে সে কথা বলছে। একটা ক্ষীণ বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে কিন্তু পরক্ষণেই তার সর্বাঙ্গে একটা ভয়ানক পরিবর্তন দেখা দিল। জীবনের মলিন আভাটুকু তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেল। কঠিন রেখা ফুটে উঠল আবার। চোয়াল ঝুলে পড়ল। পেশীর একটা প্রচণ্ড খিঁচুনিতে টালমাটাল হয়ে সে ফাউস্টের হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল তক্তাপোশে। একটা নিশ্চল চামড়ায় ঢাকা কংকালের মতন অনড় পড়ে থাকল। তার আলুথালু চুল ঝুলতে থাকল মেঝের ওপর।

—মা, মাগো তুমি এমন করো না। ছুটে গিয়ে মায়ের বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠল মেয়ে।

কিন্তু সহস্র মাথা খুঁড়লেও আর সে জাগবে না। ফাউস্টের জ্ঞান ও প্রয়োগনিষ্ঠা তাঁর শুভ বুদ্ধি ও কঠিন পরিশ্রম স্বদেশের যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ-মোচনাকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র সেই উগ্রবীর্য ভেষজ তার ক্ষমতার চূড়ান্ত করেছে—ক্ষীয়মাণ প্রাণ-শিখাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে জীবনের কূটস্থ মূলাধারে আঘাত হেনে তার ভিতরটাকেই বিদীর্ণ করে দিয়েছে, মুক্ত করে দিয়েছে চিরদিনের জন্যে দেহাভ্যন্তরের শেষ স্ফুলিঙ্গটিকে।

—মা, মা গো, আমাকে একা ফেলে যেও না তুমি। ঈশ্বর, তুমি আমার মাকে কেড়ে নিও না।

না, মা তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। আর কোনদিন সে তোমার

তাকে সাড়া দেবে না, তোমাকে আর সান্ত্বনা দেবে না, আদর করবে না। তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে রাখার জন্যে আর সে পরিশ্রম করবে না; করবে না কোন কষ্ট স্বীকার।

ফাউস্ট উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর স্নায়ুশিরা উত্তেজনায় টান-টান, তাঁর চেহারা নিরক্ত সাদা। তাঁর স্থির চোখ অপলক পড়ে আছে মৃত মা ও তার শোকার্ত মেয়ের ওপরে।

ঈশ্বর, ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকেন তিনি অক্ষম দুর্বল। পারলে তিনি কখনো তার পৃথিবীর এই অসহায় সন্তানদের এত দুঃখ যন্ত্রণায় ভুগতে দিতেন না। জ্ঞান একটা প্রবঞ্চনা। শয়তানই সর্বশক্তিমান। হিংস্র ক্রোধে ফিস্‌ফিস্ করে উঠলেন তিনি। একটা দুরন্ত আবেগে তার সর্বাঙ্গ নড়ে উঠল। এমন আবেগ যৌবন থেকে আজ পর্যন্ত আর কখনো তিনি অনুভব করেন নি। তার প্রিয় শহর, তার প্রিয় দেশবাসীর দুরপনেয় দুঃখ ও মৃত্যু জেনে, তার প্রতিকারের কোন উপায় নেই দেখে ভগবদ্‌প্রেরণার প্রতি এত কালের ঐকান্তিক বিশ্বাস তাঁর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তিনি ওযুধের শিশিটি শূন্যে তুলে প্রচণ্ড বেগে মেঝেয় আছড়ে ফেললেন।

ওই পড়ে থাকল বিশ্বাস, জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা, তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলেন, মিথ্যে, সব মিথ্যে।

তিনি উন্মাদের মত ছুটে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়; মৃতের প্রতি কি তার মেয়ের দিকে আর একবারও তিনি ফিরে তাকালেন না।

৪

হাতের ছড়িটাকে রাস্তার ওপর জোরে জোরে ঠুকছিলেন আর দ্রুত পায় হাঁটছিলেন ফাউস্ট। যেন খুব জরুরি কোন কাজে যাচ্ছেন তিনি; কিন্তু না কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না তাঁর সামনে। জ্ঞানের সঙ্গে আকস্মিক এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তার শোকাবহ পরাজয়, তাঁর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার এই আমূল সমাধি সর্বপরি পরম দয়ালু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আস্থা নাশ তাঁকে বড়ই বিচলিত বিভ্রান্ত করে ফেলেছে।

মোহমুক্তির এই প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খেয়াল হল তিনি

শহরের সব বড় রাস্তাটা ধরে হাঁটছেন এবং রাস্তায় প্রচুর লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে। শহরে সেই রহস্যময় ভয়াবহ রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়া থেকে পথে এত জনসমাগম আর তাঁর চোখে পড়ে নি। ধর্মযাজক ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা ধূসর আলখাল্লা পরে ও মোচার মতন সূক্ষ্মাগ্র শিরস্ত্রাণে মুখ মাথা ঢেকে সারি বেঁধে হেঁটে চলেছেন। ব্যাধি নিরোধের জন্য শিরস্ত্রাণের বাড়তি অংশ কাঁধ অবধি ঢাকা, শিরস্ত্রাণের মধ্যে দিয়ে তাদের চোখ দু'টো কেবল দেখা যাচ্ছে। তাঁদের হাতে ঝুলছে আগুনের মালসা, তাতে গন্ধক ধুনো আর ভেষজলতা-পাতা পুড়ছে। গির্জার বাইরে মার্কেট স্কোয়ারেও ছড়ানো ছিঁটোনো ছোট বড় জনতা। অধিকাংশের চেহারাই শুষ্ক নিরুদ্যম ভীরু; অবশ্য তাদের কেউ কেউ ঈশ্বরের নিন্দা করছে। অবিশ্বাসের কথা বলছে। কিন্তু অধিকাংশের হাবভাবে ধর্মভাব ও শরণাগতি স্পষ্ট। ফাউস্ট এতক্ষণে অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছেন; তিনি মমতা-করুণ চোখে তাকাচ্ছিলেন, দেখছিলেন সকলকে আর মনে মনে সেই মৃত স্ত্রীলোকটির কথা এবং মানুষের অক্ষম চেষ্টার কথা চিন্তা করছিলেন।

প্রায় প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়েই কোন ধর্মযাজক অথবা বক্তা জনসাধারণকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত না করলে এই মহামারী এই মৃত্যু আরও ব্যাপক আর ভীষণ হয়ে উঠবে বলে সকলকে সাবধান করে দিচ্ছিলেন তাঁরা।

উপবাস কর, প্রার্থনা কর এক মোড়ে চিৎকার করে বলছিলেন তাঁদের একজন, পৃথিবীর ধ্বংস নিকটবর্তী, অনুতাপ করে তোমাদের অমর আত্মাকে বিপদ্‌মুক্ত কর। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি সামনে ধরে তিনি বক্তৃতা করছিলেন। যারা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল তারা সকলেই যীশুর মূর্তিকে চুম্বন করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ঠেলা ঠেলি করছিল, রোডার মানুষের মনে বুঝি একটা দৃঢ় ধারণা জন্মেগিয়েছিল যে ওই মূর্তিতে চুম্বন করতে পারলে একটা পবিত্র প্রতিরোধ-শক্তি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে, মহামারী তখন আর তাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

ফাউস্ট নীরবে হেঁটে চলেছেন। তাঁর গতি মন্থর। তিনি চিন্তামগ্ন। পরম তিক্ততার সঙ্গে তিনি ভাবছিলেন, কীভাবে এই দীর্ঘ জীবনটা তিনি বরবাদ করে দিয়েছেন। জনসেবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্যে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর জীবন আর সেই কঠিন কষ্টার্জিত জ্ঞান কিনা স্বদেশের এই চরম বিপদে এতটুকু কাজে লাগল না, সম্পূর্ণ ব্যর্থ, মিথ্যা হয়ে গেল!

পথের এক মোড়ে সন্ন্যাসীর বেশধারী এক বক্তা ভাঙা গলায় প্রাণপণ চিৎকার

করে বক্তৃতা করছিলেন। ধর্ম-বিশ্বাসে জ্বলজ্বলে তাঁর বড় বড় চোখ। অভিযোগকারীর মত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান তাঁর শক্ত-শরীর আর সপ্তম পর্দায় বাঁধা তাঁর কাংস্যকণ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত লাভা স্রোতের মতন ভাষা ফাউস্টকে আকৃষ্ট করল। তিনি থামলেন। বক্তাকে ঘিরে তখন জনতার এক মস্ত ভিড় জমাট হয়েছিল। "তুমি পাপ করেছ। প্রভু তোমাকে সেই পাপের শাস্তি দিচ্ছেন।" সাধুর কণ্ঠ থেকে যখন এই ঘোষণা নিদারুণ শব্দে নির্গত হল ঠিক তখনই আর একটা ভয়ংকর কলরব আছড়ে পড়ল ভিড়ের মধ্যে। সেই কলরব যাদের কানে গেল তারা ভীষণভাবে শিউরে উঠল ও ভয়ানক ভয়ে ক্রুশ আঁকল শরীরে। কোলাহলটা আসছিল গির্জার সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিক থেকে। বেপরোয়া একদল যুবক যুবতী নিরংকুশ আনন্দে মেতে উঠেছিল। তারা হাসছিল গাইছিল লাফাচ্ছিল। পরস্পরের গায়ে ঢলাঢলি করতে করতে তারা এগিয়ে আসছিল, ক্রমে তাদের হৈ-চৈ চিৎকারে সাধুর প্রাণপণ চিৎকারও ডুবে গেল। দেখতে দেখতে যুবক-যুবতীদের সেই মিছিলটা ঘিরে ফেলল জায়গাটা। তারা নিদারুণ স্ফূর্তির উত্তেজনায় হাসতে থাকল, নাচতে থাকল, গাইতে থাকল।

মনে হচ্ছিল তারা বুঝি পাড় মাতাল এক একজন; কিন্তু না, তারা কেউ নেশা করেনি তবু তারা নাচে গানে হৈ-চৈ চিৎকারে এমনই টালমাটাল হয়ে উঠেছিল যেন মনে হচ্ছিল, তাদের সবাইকে প্রবল হিস্টিরিয়ায় পেয়ে বসেছে কিংবা তারা সকলেই তাদের যুক্তি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। অথচ না, আসলে এ হচ্ছে যৌবনের ধর্ম—স্বতঃস্ফূর্ত ধৃষ্টতা; মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সাথে পাঞ্জা লড়ার অকুতোভয় সাহস।

সাধু কঠিন ভ্রূকুটি করে তাকালেন তাদের দিকে; তাঁর মুখ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি তার দীর্ঘ বাহু তাদের দিকে প্রসারিত করে একতাল থু থু ফেললেন তারপর প্রাণপণ চিৎকার করে বলে উঠলেন—ওরে নাস্তিকের দল মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হ'।

হাত ধরাধরি করে নাচছিল তিনটি যুবতী। সাধুর কথা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তারা চোখে বিদ্রূপ হেনে তাকাল তাঁর দিকে। তাদের দৃষ্টিতে ছিল অস্বাভাবিক এক দীপ্তি যেন একটা দিনের এই উন্মত্ত উৎসবের দাবানলে তারা তাদের সমগ্র যৌবনটাকেই পুড়িয়ে নিঃশেষে ছাই করে দিতে পাগল।

তাদের একজন সাধুর দিকে একটা ফুল ছুঁড়ে দিয়ে খিল্‌খিল্ শব্দে হেসে উঠল, উত্তেজিত গলায় বলল—কাল যদি মৃত্যু আজ তবে উৎসব। এভাবে

শেষ কথা উচ্চারণ করে তারা এগিয়ে যাওয়া মিছিলের সামিল হয়ে গেল।

সাধু আবার চিৎকার করে উঠলেন—ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে সেই বাঁচবে। যে তাঁকে অবজ্ঞা করে তার মৃত্যু অনিবার্য।

আকাশে আঙুল তুলে সে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর শরীর শক্ত হয়ে উঠল। হাতটা হিংস্র থাবার মতন প্রসারিত হল তাঁর যেন কারো টুঁটি টিপে ধরতে চাইছেন তিনি। ভয় ও ঘৃণার একটা কঠিন ছাপ ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তারপরেই একটা আহত জন্তুর মতন চিৎকার করে উঠে মঞ্চ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল জনতা, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে থাকল। তাদের মুখে একটাই রব—প্লেগ, প্লেগ, এমন কি ধর্ম প্রচারকদেরও প্লেগ থেকে রেহাই নেই।

কিন্তু ফাউস্ট দেখেই বুঝেছিলেন এটা প্লেগ নয়। তিনি ছুটে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। মাটি থেকে তুলে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি। সাধুর দেহে প্লেগের কোন চিহ্নই দেখতে পেলেন না তবে অনুমান করলেন, যে করেই হোক সাধু কোন মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে থাকবেন। মৃত্যু অতি দ্রুত তাঁকে গ্রাস করে ফেলছিল। সাধু চোখ মেলে তাকালেন ফাউস্টের দিকে। চোখে তাঁর একটা বিহ্বল ঘোলাটে দৃষ্টি। গলায় ঘরঘর আওয়াজ হচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মৃত্যু আসন্ন তাঁর। শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে তাঁর চোখ সহসা চক্‌চক্ করে উঠল, ফাউস্ট শুনতে পেলেন মুমূর্ষু মানুষটি ফিস্‌ফিস্ করে বলছেন, শয়তান। ওটা শয়তান। আকাশে শয়তান।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ফাউস্ট দেখলেন কালো মেঘের এক বিশাল স্তূপ। তার ধার দুটো বেরিয়ে এসেছে প্রসারিত দুই বিপুল বাহুর মতন। তার মাঝখানে মস্ত মাথার আকারের এক খণ্ড মেঘ। সে মেঘের আবার দুটো ধার দুটো ধারাল শিং এর মতন দেখাচ্ছে।

৫

নিজের জীবনের ব্যর্থ অতীত ও বন্ধ্যা ভবিষ্যতের কথা ভেবে ও মহামারী-কবলিত শহরের অসহায় অবস্থা দেখে মর্মাহত ফাউস্ট অবশেষে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির কাছে আসতেই তার চোখে পড়ল মেয়ে-পুরুষের এক

মস্ত জনতা তার ঘরে ঢুকবার সিঁড়ির মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি কাছে আসতেই সকলে তাকে ঘিরে ধরল। কেউ কেউ তাঁর আলখাল্লা ধরেও টানাটানি করতে লাগল। একজন কাতর গলায় চেঁচাতে লাগল—ফাউস্ট বাঁচাও, আমার এক মাত্র ছেলে……সকলে তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠল—আমাদের করুণা কর ফাউস্ট, তুমি ছাড়া আমাদের বাঁচাবার আর কেউ নেই।

ফাউস্ট সবাইকে ঠেলে ঢুলে কোনক্রমে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। ওপরে উঠে দরজার সামনে এসে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। জনতার দিকে ক্ষণকাল কাতর চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমরা চলে যাও এখান থেকে, তোমাদের সাহায্য করতে পারি এমন সাধ্য আমার নেই। জ্ঞান মিথ্যা হয়ে গেছে, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

বিষণ্ণ জনতা বিস্ময়ে কলরব করে উঠল। মাথা হেঁট করে ফাউস্ট ঘরে ঢুকলেন। এ ঘরটা একাধারে তার পাঠাগারও বটে গবেষণাগারও বটে। পরম বিতৃষ্ণায় তিনি ঘরটাকে দেখতে লাগলেন। স্তূপীকৃত পুঁথিপত্র ছড়িয়ে রয়েছে চারধারে—আজ আর ওই বইগুলির কোন অর্থ নেই তাঁর কাছে, কোন মূল্য নেই। কোন দিন আর ওই বইগুলি তাঁকে প্রেরণা জোগাবে না, সান্ত্বনা দেবে না এতটুকু। ওই সব বিপুলায়তন চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, নানা টুকিটাকি কাগজ পত্র সর্বোপরি তাঁর অতি প্রিয় তন্ত্রগ্রন্থগুলিও আজ তাঁর কাছে আবর্জনার অধিক কিছু নয়। এতকাল যাদের তিনি হৃদয়ের ধন বলে বুকে ধরে রেখেছিলেন আজ আর তাদের ওপরে তাঁর এতটুকু আস্থা নেই নিজের ওপরেও আজ তিনি সব আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।

হতাশায় অবসন্ন তিনি তাঁর প্রিয় যন্ত্রপাতিগুলির সামনে এসে দাঁড়ালেন। যে যন্ত্রগুলি তাঁর সেই অতি আগ্রহের প্রতিষেধ প্রস্তুতে সাহায্য করেছিল, দিনের পর দিন অতন্দ্র চোখে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে যার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পরম আশায় বুক বেঁধে ছিলেন তিনি সেই ভেষজ অবশেষে তাঁকে আশাভঙ্গের কী তিক্ত অভিজ্ঞতাই না দিল—নির্মম আক্রোশে তিনি তাকিয়ে থাকলেন যন্ত্রপাতিগুলির দিকে।

—ওই ভঙ্গুর কাচের পাত্র, নানাবিধ নল ও বকযন্ত্র, প্রাচ্যের মন্ত্রপূত লৌহ-রস-চূর্ণ-মিশ্র, শতাব্দী-পরীক্ষিত বিবিধ ভেষজ আর ফাউস্ট তুমি নিজে—তোমার এই সমবেত শক্তি কি শয়তানের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে পেরেছে! হা…হা……হা……ফাউস্ট গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। কিন্তু সে হাসি একটা

করুণ আর্তনাদের মতন শোনা গেল কেবল।

—ভগবানের ওপরে বিশ্বাস! হাঃ হাঃ হাঃ···সে বিশ্বাস থাকলে একটা চড়ুই পাখিরও নাকি মৃত্যু ঘটে না। কিন্তু—হে দুর্জ্ঞেয় দর্শন, অনির্ণেয় রসায়ন-শক্তি, হে ভেষজবিজ্ঞান, এস আজ আমি তোমাদের শক্তি পরীক্ষা করব—কাচ কাচ কাচ! ভঙ্গুর! সবই কাচের মতন ভঙ্গুর।

তিনি তাঁর ছড়ি তুললেন। সেই ছড়ির আঘাতে ভেঙে চললেন বকযন্ত্র, পরিস্রুতকরণ পাত্র, সরু মোটা বাঁকা সোজা নল, কাচের যাবতীয় বস্তু—যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর সমগ্র জীবনের শ্রম ও সাধনায়, বুদ্ধি ও চেষ্টায় সংগৃহীত পরিমার্জিত পরিবর্ধিত এক বিরাট সম্ভাবনার যাবতীয় দুর্লভ সম্পদ চূর্ণ ভগ্ন ও ছত্রখান হয়ে গোটা ঘরখানা পূর্ণ করে ফেলল। আশাভঙ্গের ক্ষণিক উত্তেজনায় জ্ঞান-সাধনার এক মহান কীর্তি আবর্জনার বিশাল স্তূপে পর্যবসিত হল।

প্রবল আবেগে ফাউস্টের শরীর কাঁপছিল, তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তিনি টলছিলেন। টলতে টলতে কোনমতে জানলার সামনে এলেন, বুক ভরে বাতাস নিতে তিনি হাট খুলে দিলেন জানলা। তখনও জানলার নিচে সেই জনতার ভিড়। সকলেই ফাউস্টের ঘরের পানে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিল! ফাউস্ট তাদের দুঃখ মোচনে অক্ষম বলে জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তারা নড়ে নি যেন তারা জেনে গিয়েছিল এই মহতীবিনষ্টি থেকে তাদের রক্ষা করতে পারেন একমাত্র ফাউস্ট।

হায় রোডা, বিধ্বস্ত রোডা, হায় মহামারী-কবলিত হতভাগ্য মানুষ, ডাকো, ডাকো তোমাদের ঈশ্বরকে, তোমরা প্রাণ ভরে ডাক।··· প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কুহক! সে তোমাদের কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে না। এই বৃদ্ধ মূর্খ অসমর্থ ফাউস্টের মতন সেও অক্ষম।

তিনি জানলা থেকে সরে গেলেন আর সরে যেতেই একগাদা বইয়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি প্রাণপণে লাথি মারতে থাকলেন বইগুলির ওপরে।

পথের কাঁটা, মানুষকে ফাঁদে ফেলবার জাল, তোমরা আমার সবটুকু প্রাণশক্তি শোষণ করে নিয়েছ। আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ শুধু শব্দের নিষ্ফল জঞ্জাল, অসহ্য হয়ে উঠেছ তোমরা। আমি তোমাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেব যেমন করে পুড়ে ছাই হচ্ছি আমি নিজে।

তিনি ঘরের কোণে তাঁর বাত্যাচুল্লীর সামনে এলেন। সেখানে তখনও আগুন

জ্বলছিল গন্‌গন্‌ করে। সেই গন্‌গনে আগুনে তিনি তাঁর বহু দিনে বহু শ্রমে সংগৃহীত মূল্যবান গ্রন্থগুলি বোঝায় বোঝায় এনে আহুতি দিতে থাকলেন। বইগুলি বয়ে আনতে বোঝার ভারে তিনি কখনো সামনে ঝুঁকে পড়ছিলেন কখনো পেছনে বেঁকে যাচ্ছিলেন, রীতিমত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন তিনি। বিচিত্র আকার-প্রকারের বই। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে-স্থূলত্বে আর বাঁধানোর স্বাতন্ত্র্যে তার প্রত্যেকখানাই বিশিষ্ট। তাদের সেই শোভন সুন্দর চেহারা আগুনের উত্তাপে বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল, বেঁকেচুরে দুমড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ কিন্তু ফাউস্টের তর সইছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল যেন ও-গুলির পুড়তে বড় দেরি হচ্ছে। মাঝে মাঝে তাই তিনি এসে চুল্লীর ওপরকার হাপরের হাতল ধরে পাগলের মতন টানতে থাকেন। হাপরের হাওয়ায় চুল্লীর আগুন প্রচণ্ড শিখায় লেলিহান হয়ে উঠে পুঁথিপত্রের বিশাল স্তূপ গ্রাস করে না-ফেলা-পর্যন্ত তিনি হাপর টেনেই চলেন। তারপর আবার গিয়ে বয়ে নিয়ে আসেন বোঝায় বোঝায় বই, নিক্ষেপ করতে থাকেন আগুনে।

তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণার উৎস গ্রন্থগুলি অগ্নিগর্ভে আহুতি দিতে দিতে কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে অপলক চোখে সেগুলির পরিণতি লক্ষ্য করছিলেন—উত্তাপে উৎক্ষিপ্ত বইয়ের পাতাগুলি দুমড়ে বেঁকে মৃদু শব্দ করে প্রতি মুহূর্তে প্রবল শিখার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল আর তাঁর মনে হচ্ছিল যেন তাঁর ওই প্রিয় সন্তানগুলি করুণ কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিত্রাণের আশায় তাঁর কাছে কাকুতি মিনতি করছে। মুহূর্তের দ্বিধায় একবার থমকে দাঁড়ালেন তিনি বগলের বইগুলি অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন দেবার আগে জ্বলন্ত শিখার দিকে তাকালেন—ঠিক তখনই সুবৃহৎ একখানা গ্রন্থের কয়েকটা পাতা উত্তাপে দুমড়ে বেঁকে গেলে গ্রন্থখানি উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। একখানা শাস্ত্রগ্রন্থ। তাতে ক্রুশ চিহ্ন আঁকা। অগ্নিশিখা গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবার আগে উন্মুক্ত পাতার ওপরে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তাঁর। পাতাটির কয়েকটি উজ্জ্বল অক্ষর তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। "হে আমার ঈশ্বর, তুমি সদাশয় এবং মহৎ গুণের আকার।" বাক্যটি চোখে পড়তেই চিৎকার করে উঠলেন ফাউস্ট—মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে, চিরকালের একটা ছেলেভুলোনো স্তোক মাত্র।

একটা ক্ষিপ্ত তিক্ত নির্মম রোষে হাতের বইগুলি তিনি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন তারপর আরও নিয়ে এলেন—আরও আরও। যতক্ষণ পর্যন্ত না অগ্নিকুণ্ড উপচে উঠল তিনি থামলেন না। তারপর তিনি বসে পড়লেন এবং স্থিরদৃষ্টিতে

তাকিয়ে থাকলেন তাঁর জীবন-সাধনার সর্বগ্রাসী চিতাগ্নির দিকে। তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থার মতনই ভয়াবহ ওই চিতাগ্নির উত্তাপ এবং জ্বালা, তাঁর অন্তর্দাহের মতনই তীব্র এবং তীক্ষ্ণ তার সর্বগ্রাসী শিখা।

গ্রন্থগুলি যখন শিখায় শিখায় ঢেকে গিয়ে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল তখন প্রত্যেকটি গ্রন্থই চোখে পড়ছিল তাঁর, প্রত্যেকটিকেই চিনছিলেন—দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, রসায়ন, প্রকৃতি-তত্ত্ব—দিনের পর দিন রাতের পর রাত যাদের দৃষ্টি প্রদীপের সামনে রেখে কেটে গেছে তাঁর নিবিড় আনন্দের ধ্যানমগ্ন মুহূর্তগুলি।

একখানা বই আগুনের শিখাকে যেন বড় বেশী বাধা দিচ্ছিল। কিছুতেই পুড়ে যেতে চাইছিল না যেন। দুমড়ে মুচড়ে বারবারই কেবল আগুনের বিরুদ্ধে রুখে উঠছিল। বইখানার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ফাউস্টের। এ বইখানা দীর্ঘ তিরিশ বছরের মধ্যে একবারও ধরে দেখেন নি তিনি। বইটাকে তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, ভুলেই থাকতেন যদি না বর্তমান মানসিক অবস্থায় হঠাৎ বইখানি তাঁর নজর কাড়ত। বইখানি চোখে পড়তেই দারুণ নাড়া খেলেন তিনি, তাঁর স্মৃতি আলোড়িত হয়ে উঠল। বইখানি পিশাচ-বিস্তার। এক খুনী ফাঁসির আসামীর চামড়া দিয়ে বাঁধান; মলাটের মাঝখানে একটা মস্ত কালো বৃত্ত আঁকা।

হঠাৎ বইটার কয়েকটা পাতা হাট খুলে গেল যেন কোন অদৃশ্য হাত ফাউস্টের চোখের সামনে মেলে ধরল বইখানা। জ্বলন্ত বইখানার খোলা পাতার কয়েকটি রক্তিম অক্ষর ফাউস্টের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠল।

'পাপ দিয়ে পাপের সঙ্গে লড়াই কর। নরকের শক্তি সন্ধান কর।' বইয়ের আর একটা পাতা উলটে গেল আগুনের অক্ষরে ফাউস্টের চোখ ধাঁধিয়ে দিল আরও কয়েকটা নতুন লাইন :

'জ্ঞানই ক্ষমতা; প্রেতযোনির ওপরে তোমার ক্ষমতার আধিপত্য হবে যদি…।'

আবার একটা পৃষ্ঠা উলটে গেল; দোলাচল চিত্তে ফাউস্ট পড়লেন :

'যদি তুমি নায়কীয় শক্তির ওপরে আধিপত্য চাও ত পূর্ণিমার রাত্রে রাস্তার চৌমাথায় যাও। …

তারপর, তারপর,…রুদ্ধশ্বাস ফাউস্ট আগুনের থেকে বইখানাকে উদ্ধার করতে গেলেন কিন্তু আগুনের প্রচণ্ড তাপে বাধা পেয়ে নিরস্ত হতে হল তাঁকে। তিনি ছড়ি বাড়িয়ে বইখানাকে টেনে আনতে যাবেন—তার আগেই বইখানা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল শেষে সশব্দে পুড়ে ছাই হয়ে শিখার মাথায় মাথায়

চিমনির পথে উড়ে চলে গেছে।

ফাউস্ট চেয়ারের ওপরে থপ করে বসে পড়লেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তিনি থর্ থর্ করে কাঁপছিলেন। বইখানার বিষয় বস্তু তাঁর মনে পড়েছে। এখন তিনি তার পাতায় পাতায় বর্ণিত জাদু-মন্ত্র, প্রেতসিদ্ধি, ডাইনীর-পাচন তৈরির গূঢ় নির্দেশ ইত্যাদি বহু দিনকার বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় স্মরণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি পাংশুমুখে নিস্পন্দ বসে রইলেন। আগুনের শিখা দেয়ালে ও সিলিংএ তার আরক্ত আভা ও ভুতুড়ে ছায়া ছড়িয়ে দিতে দিতে এক সময়ে নিভে ছাই হয়ে গেল।

ফাউস্ট একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দেয়াল পঞ্জির সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আজই ত পূর্ণিমা, কেমন একটু চমকে উঠলেন, চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, তাই হোক তবে। যদি রোডার এই পরম সর্বনাশের দিনেও ঈশ্বর এসে তাদের পাশে না দাঁড়ান, মড়কের অভিশাপে এমন অসহায় ভাবে যদি তারা মরতেই থাকে ত তাদের রক্ষার জন্যে শয়তানই আমার সহায় হোক।

৬

তখন মধ্য রাত্রি। শহর থেকে প্রায় আট মাইল দূরে বসতিবিরল এক পতিত প্রান্তরের পথ ধরে একটি মানুষকে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছিল। চতুর্দিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল কুয়াসা। কুয়াসায় মানুষটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

ফাউস্ট হেঁটে চলেছিলেন। নারকীয় শক্তির শরণাপন্ন হবেন সিদ্ধান্ত স্থির করে তিনি আর দ্বিধা কিংবা দেরি করেন নি, একটা মোটা আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এবং সেই থেকে হাঁটছেন। এখন সামনে আর মাত্র দু'শ গজ পথ—রাস্তার চৌমাথা। মাথার ওপরে পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বল নির্মল। কিন্তু মাঝে মাঝেই কুয়াসা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে চাঁদকে অন্ধকার করে দিচ্ছিল। আর সেই অন্ধকার ঝোপে ঝাড়ে গাছে গাছে ছড়িয়ে পড়ে একটা ছমছমে ভয়ের ভয়ংকর চেহারা নিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তাদের মধ্যে থেকে একটা অশুভ আত্মা প্রেতায়িত হয়ে উঠছে।

অবশেষে তিনি চৌমাথায় এসে পৌঁছলেন এবং দুটি রাস্তা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করে গেছে তার কেন্দ্র বিন্দুটি বের করে তার ওপরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিশ্চল হয়ে সেখানে তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর আবক্ষ বিস্তৃত শ্মশ্রু তাঁর আলুথালু দীঘল কেশপাশ হাওয়ায় এলোমেলো উড়তে থাকল। তাঁর লম্বা আলখাল্লা হাওয়ায় পৎপৎ করতে করতে তাঁর গায়ে আছাড় খেতে থাকল। তিনি ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে চাঁদ ও নক্ষত্রের পানে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন তারপর দু বাহু বিস্তার করে বলে উঠলেন—না, ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়া আর চলবে না ফাউস্ট। তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, অতিশয় বৃদ্ধ তুমি, তোমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। যদি তুমি নিজের অমর আত্মার মূল্যেও রোগার্ত মানুষকে কিঞ্চিৎ শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে পার, রক্ষা করতে পার তাদের এই মহামারী মড়ক থেকে ত সেই হবে তোমার পরম কর্তব্য। তোমার অপব্যয়িত আয়ুষ্কালের শেষক্ষণে দীর্ঘ জীবনের ব্যর্থতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শেষ আত্মদানের মধ্যে আজ তুমি সার্থক হয়ে উঠতে পার।

তিনি হাতের লাঠিখানাকে যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে মাটিতে চেপে ধরলেন তারপর দ্রুত একটা পাক খেয়ে নিজেকে ঘিরে ধুলোর ওপরে খুব বড় একটা বৃত্ত আঁকলেন। সে বৃত্তের ভিতরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা বৃত্ত আঁকলেন আবার, তার ভিতরে আরও ছোট আর একটা বৃত্ত। বৃত্তের মধ্যে আঁকলেন নানা ধরনের সাঙ্কেতিক অক্ষর, প্রতীক ও চিহ্ন। সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন একটা মাথার খুলি। এবার থলি থেকে খুলিটা বের করলেন। চাঁদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন তিনি ও দু' হাতের অঞ্জলির মধ্যে খুলিটাকে ধরে বুকে চেপে রাখলেন। হাতের আঙুল রইল মাটির দিকে নোয়ান। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে বলে উঠলেন—শয়তান, আমি তোমার সাহায্য চাই।

প্রথমে ফাউস্ট ভেবেছিলেন তাঁর প্রার্থনা মিথ্যে হয়ে গেছে। শয়তান তাঁর প্রার্থনা শোনে নি কিংবা গ্রাহ্য করছে না। কিন্তু মিনিট খানেক যেতে না যেতেই টের পেলেন, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, ঘটবে।

অকস্মাৎ বাতাসের বেগ বেড়ে গেল, ঝড়ের মতন বেগ হল বাতাসের। ঝোপ ঝাড় উলুখড় নলখাগড়া মাটিতে নুইয়ে দিয়ে বয়ে চলল সে। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল, যেন কেউ লণ্ঠনের মতন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে চাঁদটাকে। এবং যেখানে ধুলোর ওপরে বৃত্ত এঁকেছিলেন তিনি লিখেছিলেন তান্ত্রিক বীজ মন্ত্র তার ওপরে ছোট ছোট আলোর শিখা লকলকিয়ে উঠল ও তার থেকে

নীলাভ জ্যোতি ঠিকরে বেরোতে থাকল। ঝড়ের বেগ আর গর্জন যত বাড়ছিল সেই নীলাভ অগ্নিশিখাও তত বেশী উজ্জ্বল ও উর্ধ্বমুখ হচ্ছিল। ফাউস্ট ঝড়ের সেই হিংস্র আঘাতে ক্রমাগত ডাইনে বায়ে সামনে পিছনে কাত হয়ে পড়ছিলেন কিন্তু কখনোই ধূলিসাৎ হচ্ছিলেন না; ওই নীলাভ জ্যোতির লেলিহান শিখা তাঁকে পাঁচিলের মতন ঘিরে রেখেছিল। আর নীল লাল হলুদ জিভ দিয়ে তাঁকে সস্নেহে লেহন করছিল, সে শিখার তাপে পুড়ছিলেন না তিনি, এতটুকু আঁচে লাগছিল না তাঁর গায়ে।

ফাউস্ট আবার করে তারস্বরে বলে উঠলেন—'মেফিস্টো, হে পাপ শক্তি, তুমি আবির্ভূত হও।

সেই অমোঘ আহ্বানে সমাহুত প্রকৃতির উচ্ছৃংখল যত সত্তা সমস্ত সমবেত কণ্ঠে প্রলয় চিৎকার সুরু করল, সে চিৎকার গাম্ভীর্যে যেমন ভয়াল ও প্রবল প্রকৃতিতেও তেমনি ভীষণ ও ভয়ংকর।

পৃথিবীর তাবৎ প্রাণী সব ছুটে বেরিয়ে এল তাদের আশ্রয় থেকে। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য একপাল ইঁদুর কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ করতে করতে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে ছুটতে থাকল প্রাণপণ। বাদুর চামচিকে নানাজাতের যতেক পাখি দিশাহারা হয়ে চিৎকার জুড়ে দিল আর ইতস্তত কেবল ডানা ঝাপটাতে থাকল বিমূঢ়ের মত। ঝড়ের বেগ ক্রমাগত বাড়ছিল এবার প্রলয় ঝঞ্ঝায় রূপান্তরিত হল। পৃথিবী দুলে উঠল, কাঁপতে থাকল; সঙ্গে সঙ্গে সে অগ্নিশিখাও ক্রমশ আরও উর্ধ্বমুখ আরও লেলিহান হয়ে উঠল। সে ভয়াল শিখা থেকে বিকীর্ণ হতে থাকল এক রকম অমানুষিক কর্কশ সঙ্গীত যেন দৈত্যদানবেরা গলা মিলিয়া গান ধরেছে, কিংবা যেন নারকীদের মাইফেল বসেছে নরক গুলজার করে।

ক্রমশ উথাল পাথাল বাতাস আরও তুমুল হয়ে উঠল, বজ্রপাত হতে থাকল মুহুর্মুহু। আকাশের চতুর্দিক থেকে বিদ্যুৎশিখা সাপের জিভের মতন লকলকিয়ে উঠে নিচের আগুনের দিকে বর্শার হিংস্র ফলার মতন নেমে আসতে থাকল, উভয় শিখার সম্মিলিত লোলজিহ্বা আরো উর্ধ্বে দূর আকাশে ঠিকরে পড়তে লাগল। এবং শয়তানের জয়জয়কারে মুখর হয়ে উঠল সেই আকাশ মাটি জোড়া আগুনের গান।

হঠাৎ সেই প্রলয় কোলাহল ছাপিয়ে একটা দ্রুত ধাবমান শব্দ শোনা গেল। দূরদিগন্তে অন্ধকার আকাশে দেখা গেল একটা আলোর স্ফুলিঙ্গ। উল্কাগতিতে

এগিয়ে আসছিল সে সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দও হয়ে উঠছিল প্রবল, প্রখর। সে শব্দ লক্ষ্য করে আকাশের দিকে তাকালেন ফাউস্ট। অগ্নিশিখার মধ্যে দিয়ে দেখলেন সেই স্ফুলিঙ্গকে, ভয়াল স্ফুলিঙ্গটি তাঁর দিকেই নির্মম গতিতে ছুটে আসছিল। তার চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এক অতিপ্রাকৃত জ্যোতি। ফাউস্টের মনে হল যেন তিনি দেখছেন তিন ঘোড়ার একটা গাড়ি। গাড়িটা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে। গাড়িতে বসে আছে যেন কেউ "তার মাথায় শৃঙ্গ এবং সে দেখতে ভয়ংকর"। অগ্নি-বলয়ের কিছু দূরে সেই স্ফুলিঙ্গাকার বস্তুটি পৃথিবীর মাটিতে বিদ্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্ণবিদারী গর্জন ফেটে পড়ল চারদিকে—তার ভিতর থেকে একটা স্বচ্ছ শুভ্র শিখা উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ বিদ্ধ করল। ফাউস্টকে বেষ্টন করে এতক্ষণ যে শিখা লকলক করছিল এবার সে উন্মত্তের মতন উত্তাল হয়ে উঠল। যেন সেই অতিশক্তিকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই বৃত্তের পর বৃত্তে রচিত অগ্নিকুণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফাউস্টকে বেষ্টন করে ঊর্ধ্বগামী হল, প্রবল ধাক্কায় তিনি নিজেও তাঁর সেই ভৌতিকচক্রের কেন্দ্রে আছড়ে পড়লেন। তাঁর চৈতন্য থাকল না। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু শান্ত নিঃশব্দ হয়ে গেল।

সেই শান্ত নৈঃশব্দের মধ্যে দীর্ঘ সময় কেটে গেল। আস্তে অল্পে ফাউস্টের দেহে ফিরে এল বল অন্তরে সাহস। তিনি মাথা তুললেন, ভয়ে ভয়ে তাকালেন চারধারে। মনে হল যেন কিছুই ঘটে নি, যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, যেন তিনি এই চন্দ্রালোকিত পৃথিবীর বুকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন এইসব। ঝড় নেই। নেই ঝড়ের কোন নির্মম চিহ্ন। সেই নৃত্যের অগ্নিশিখাও আর নেই। আছে কেবল তাঁর হাতের ছড়িখানা আর সেই বৃত্ত তিনটি, বৃত্তের ভিতরে তান্ত্রিক অক্ষরমালা যা তিনি ধূলোর ওপরে এঁকেছিলেন।

সহসা স্তব্ধতা ভঙ্গ হল। একটি বুড়ো মানুষের অদ্ভুত গলা কানে এল তাঁর। কে তাঁকে প্রশ্ন করছে।

—তুমি আমাকে ডেকেছো ?

ফাউস্টের তখনো আচ্ছন্ন ভাব, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না ; হাঁটুর ওপরে ভর করেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। তিনি দেখলেন নলখাগড়ার ঝোপের ধারে পায়ের ওপরে পা তুলে একটা পাথর চেপে বসে আছে এক বামন-বুড়ো। অদ্ভুত চেহারার ছোট্ট মানুষটির গায়ে ছেঁড়া ময়লা পোশাক, মাথায় একটা মরা মানুষের মাথার খুলি। টুপি। টিলা টুপিটার ফাঁক ফোকর দিয়ে লম্বা লম্বা পাকা চুল ঝুলে পড়েছে। হাওয়ায় কাঁপছে।

ফাউস্ট তার দিকে তাকাতেই অভিবাদনের ভঙ্গিতে সে তার টুপিটাকে ইঞ্চি তিনেক তুলে আবার বসিয়ে দিলে মাথায়, ধীরে ধীরে ফাউস্টের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু মুচকি হাসল সে। হাসিটি মিষ্টি; চতুর মুখে একটা খুশীরও আভাস কিন্তু সে খুশী শয়তানের।

হতবুদ্ধি ফাউস্ট উঠে দাঁড়ালেন। তখনও তাঁর পা কাঁপছে। টলতে টলতেই তিনি লোকটার দিকে পা বাড়ালেন। তার দৃঢ় ধারণা হল এ শয়তানের কোন অনুচর অথবা শয়তান নিজে। ঠিক তখনই আগন্তুক মুখ ঘোরাল, চাঁদের আলো প্রতিফলিত হল তার চোখে; পলকের জন্যে আগন্তুকের রক্তবর্ণ চোখ দুটো ফাউস্টের চোখের সামনে নরকের আগুনের মত জ্বলে উঠল। হঠাৎ অনুভব করলেন, তিনি নির্মম ভয়ংকর এক জঘন্য পাপের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। তাঁর গলা ফেটে একটা নিদারুণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল, তিনি প্রাণপণে শহরের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সযত্ন সজ্জিত এতকালের যত সংকল্প, সাহস ও ধৈর্য সব তাঁকে এ দুঃসময়ে ত্যাগ করে গেছে। হতবাক্ বিভ্রান্ত তিনি। বার্ধক্যের অক্ষমতা অগ্রাহ্য করে উর্ধ্বশ্বাসে কেবল দৌড়োচ্ছেন। দৌড়োচ্ছেন আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছেন। তাকালেই চোখে পড়ছে সেই বামুনাকৃতি বৃদ্ধ মানুষটিকে। যথাস্থানে সেই পাথরটার ওপরে তখনও সে স্থির নিশ্চল হয়ে বসে আছে। ছুটতে ছুটতে এতক্ষণে সেই প্রকাণ্ড ওকগাছটা তাঁর চোখে পড়ল। এখান থেকে একটা সোজা রাস্তা রোডার দিকে চলে গেছে, এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটতে থাকলেন তিনি, অনেকখানি প্রকৃতিস্থও হলেন; কিন্তু বাঁক ঘুরে ওকগাছটার কাছে আসতেই আবার বুক কেঁপে উঠল তাঁর। ওকগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই খুদে বুড়োটা। বুড়োটা তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল, তার মুখে শয়তানের হাসি, টুপিটা একটু তুলে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিল বুড়ো। একটা বিচিত্র যান্ত্রিক ভঙ্গি তার ব্যবহারে।

ফাউস্ট আবার মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগলেন। শহরের দেউরিতে পা দেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি আর থামলেন না। দেউরিতেও থামতেন না কিন্তু একটা ভারি গাঁটরি মতন কিসে হোঁচট খেয়ে তিনি পড়তে পড়তে সামলে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন আর তখনই দেখলেন আবার সেই বামন বুড়োকে। খুদে মানুষটা তাঁকে টুপি তুলে অভিবাদন জানাচ্ছে। ঠোঁটে সেই চাপা হাসি চোখে সেই শয়তানী। পায়ের ওপরে পা তুলে বসে আছে মানুষটা।

উর্ধ্বশ্বাসে আবার ছুটলেন ফাউস্ট। যে-জীবটিকে তিনি অন্ধকার থেকে

আলোতে ছায়া থেকে কায়ায় উজ্জীবিত করেছেন তার থেকে দূরে অনেক দূরে পালিয়ে যাবার আশায় তিনি ছুটতে থাকলেন। নিজের ঘরের দরজায় না আসা অবধি তিনি আর থামলেন না। ঘরের দুয়োরে পা-দিয়ে তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে চারধারে তাকালেন। সবে ভোর হয়েছে। নগরবাসীদের চলাফেরা অল্পবিস্তর শুরু হয়েছে। কেউ কেউ মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্যে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ অন্য কোন অপরিহার্য কাজে বেরিয়ে চোরের মতন এদিক ওদিক দেখতে দেখতে দ্রুতপায়ে সরে পড়ছে।

ফাউস্ট ধাক্কা দিয়ে তাঁর ঘরের দরজা হাট খুলে ফেললেন। আসবাব বই-শূন্য ফাঁকা ঘর। কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিয়ে আর তিনি নড়তে পারলেন না, পাথরের মূর্তির মতন স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেবল পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে দরজার পাল্লাটা শক্ত করে ধরলেন। না পারলেন তিনি সামনে এগিয়ে আসতে না পারলেন পেছনে হটে যেতে। তাঁর বিহ্বল চোখের সামনে তাঁর টেবিলে তাঁর দিকে পেছন ফিরে বসে আছে আবার সেই বামন বুড়োটা। ঘরের শিলিংএর দিকে নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে থেকে সে তার আঙুল মটকাচ্ছে।

ফাউস্ট তাঁর বিহ্বল মন ও কম্পিত দেহ তখনও শান্ত সংযত করে উঠতে পারে নি, বামন বুড়োটা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ও আস্তে আস্তে ঘুরে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে গেল, যেন ফাউস্টের উপস্থিতিটা সে জানতই না, এইমাত্র তাকে দেখতে পেল। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, টুপি তুলে অভিবাদন জানাল, মুচকে হাসল আগেকার মতনই; সব কিছুতেই তার সেই বিছ্‌ছিরি ভঙ্গি।

বললে—তুমি আমাকে ডেকেছিলে, আমি এসেছি। কী করব, আদেশ কর।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বিধাগ্রস্ত ফাউস্ট সবলে নিজেকে টেনে নিয়ে এল তার কাছে; এই শয়তানের কাছে যেতে তাঁর সর্বাঙ্গ সংকুচিত হয়ে এলেও তিনি ফিরলেন না। তিনি তার কাছে এসে সাহসের চোখে তাকালেন তার দিকে।

—কে তুমি? আমি ত তোমাকে ডাকি নি, কেন তুমি আমার ঘরে ঢুকেছ? জবাব জানা থাকা সত্ত্বেও ফাউস্ট তেড়ে-ফুঁড়ে জানতে চাইলেন।

বুড়ো কোন জবাব দিল না কেবল হুট করে উঠে এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। একটা আড়চোখের চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে আর চটুল একটুকরো মিষ্টি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে সে তার নোংরা আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকোল। একটা প্যাকানো চামড়ার কাগজ বের করে ফাউস্টের হাতে গুঁজে দিল সে। এতক্ষণ

বামন বুড়োর আচরণটা ছিল নির্লিপ্ত। এইবার হাসিতে তিরস্কার ফুটে উঠল। তার চোখে ফুটে উঠল দ্বন্দ্বযুদ্ধের খরদৃষ্টি এবং ফাউস্টের মনটাকে বুঝবার চেষ্টা।

ফাউস্ট নিশ্চল দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলেন। বুড়ো গোটানো কাগজটা মেলে ধরল তাঁর চোখের সামনে। উকিলের লেখা কালো মোটা হরফের কোন শর্তনামার মতন মনে হচ্ছিল জিনিসটাকে। এক হাতে কাগজ-খানাকে শূন্যে ঝুলিয়ে বামন বুড়ো আর এক হাতের আঙুল বুলিয়ে দিলে তার গায়ে, অমনি পড়-পড় করে জ্বলে উঠল কাগজখানা, তার ওপরকার লেখাগুলি আগুনের হরফের মতন কেঁপে কেঁপে জ্বলজ্বল করতে লাগল।

ফাউস্ট পড়লেন :

"এই অঙ্গীকার পত্রদ্বারা আমি, শিক্ষাগুরু ফাউস্ট, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস অস্বীকার করিতেছি। এবং আমার আত্মাকে পৃথিবীর অধীশ্বর শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। বিনিময়ে পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকার্যে শয়তান আমার আদেশের অধীন ভৃত্য হইয়া থাকিবে।"

ফাউস্টের পড়া শেষ হলে কাগজখানা আবার যে-কে সেই হয়ে গেল, তাতে আগুনের চিহ্নমাত্র নেই, সে-যে এইমাত্র জ্বলে উঠেছিল তাই মনে হল না। বুড়ো অঙ্গীকার-পত্রখানি দ্রুত মুড়ে ফেলে আধবোজা চোখে তাকাল ফাউস্টের দিকে, মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখতে থাকল।

কপালে করাঘাত করলেন ফাউস্ট, চোখ বুজে চিৎকার করে বলে উঠলেন—তুমি যাও, তুমি এখান থেকে চলে যাও শয়তান।

—আমি ত এখন যেতে পারি নে, তুমি আমাকে ডেকে এনেছ, তুমি অঙ্গীকারপত্রে সই না করলেও আমার চলে যাওয়ার উপায় নেই। যতক্ষণ না তুমি আমাকে মুক্তি দিচ্ছ আমাকে থাকতেই হবে।

—যাও, যাও, বেরিয়ে যাও সম্মুখ থেকে। টলতে টলতে ফাউস্ট জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন। জানলার ওপরে কনুই রেখে দু'হাতের চেটোর মধ্যে মাথাটাকে প্রাণপণে চেপে ধরলেন তিনি।

মৃত্যু! সর্বত্র মৃত্যু! মৃত্যু আর মহামারী।—জানলার নিচে গীর্জার সেবকগণ অদ্ভুত শিরস্ত্রাণে কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে হেঁটে চলেছে। তাদের হাতে ঝুলছে আগুনের পাত্র, তাতে পুড়ছে ধূপ গন্ধক ওষুধি। তারা পেছনে পেছনে চলেছে একটা ঠেলা গাড়ির, গাড়িতে কাপড় দিয়ে ঢাকা এক-গাড়ি মৃতদেহ। সেইদিকে তাকিয়ে ফাউস্ট বিড়বিড় করে বললেন, মাত্র একটা দিনের জন্যেও যদি ক্ষমতা

হাতে পেতাম !

—তুমি কি চাও ? সত্যি যদি চাও ত একদিনের জন্যে সে-ক্ষমতা তুমি পেতে পার।

ফাউস্ট তড়িৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন। অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকালেন তিনি আগন্তুকের দিকে। প্রচণ্ড আবেগে তাঁর মুখ থম্‌থম্‌ করছে।

—আর তার বিনিময়ে কি আমার আত্মা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে ? কথাটা উচ্চারণ করতেও যেন তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছিল।

—না। এই দিনটি তোমারই হবে, একান্ত নিজস্ব তোমার, দিনটিকে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারবে। দেখ। বলেই সে ফাউস্টের বালু-ঘড়িটা তুলে এনে উলটে দিল। ঘড়ির ওপরে আঙুল রেখে বলল, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ; কিন্তু তার আগে তোমাকে অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে, চব্বিশ ঘণ্টা পরে এই বালু-ঘড়ির সমস্ত বালু নিঃশেষ হয়ে গেলে, আমার শর্তের কাছে মাথা নত করার জন্যে তোমার যদি অনুশোচনা হয় তুমি অঙ্গীকারপত্র ফিরিয়ে নিতে পারো।

ফাউস্ট অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলেন, এই মহামারী কবলিত মানুষদের বাঁচানোর ক্ষমতা কি আমার হবে ? অপলক তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন।

—এখন তুমি আমার প্রভু। তুমি যা আদেশ করবে তাই সম্পন্ন করব আমি।

—বেশ তবে তাই হোক। দাও শর্তনামা। আমি সই করব।

আগন্তুকের মুখে ফুটে উঠল জয়ের পরম হাসি, তার কোটরগত চোখ দুটি আগুনের গোলার মতন গনগনিয়ে উঠল। সে শর্তনামা মেলে ধরল শিক্ষাগুরুর সামনে।

ফাউস্ট শর্তনামায় সই করতে কলমের জন্যে হাত বাড়ালেন কিন্তু আগন্তুক তাঁকে বাধা দিল, নিজে সে তার আলখাল্লার তলা থেকে একটা লাল পালকের কলম বের করল।

—তোমার নিজের কালি, ফাউস্ট, তাই দিয়েই কেবল এই শর্তনামায় স্বাক্ষর করা চলবে। বলে সে ফাউস্টের কালির দোয়াত মেঝেয় উলটে দিল।

ফাউস্টের চোখে জিজ্ঞাসা। তিনি তাকালেন তার দিকে।

—এক ফোঁটা রক্ত, ফাউস্ট। সে হাত বাড়িয়ে তাঁর হাত টেনে নিল নিজের হাতে তারপর কব্জিতে খচ্‌ করে বসিয়ে দিল কলমের তীক্ষ্ণ ডগাটা, এক ফোঁটা

রক্ত টিপে বের করে নিয়ে এল। সেই অমোঘ কালিতে কলমটাতে ভিজিয়ে দিল ফাউস্টের হাতে।

ক্ষণকালের জন্যে দ্বিধা করলেন ফাউস্ট তারপর অকম্পিত হাতে স্বাক্ষর করলেন তিনি।

—একদিনের জন্যে ত ? জিজ্ঞেস করলেন তিনি। কিন্তু আমার যদি ইচ্ছে হয় ওহে শয়তান আমি কি তার আগেই এ শর্তনামা ফিরিয়ে নিতে পারব না ?

শয়তান ব্যগ্র হাতে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। আবার তার চক্ষু জ্বলে উঠল, বজ্জাতিতে ভরে উঠল তার মুখ।

—একটা দিনের জন্যে……পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছিলেন ফাউস্ট।

ফাউস্টের কথা শেষ না হতেই শয়তান বলে উঠল, হ্যাঁ…বালু-ঘড়ির বালু নিঃশেষ হয়ে গেলে তখন।

৭

শয়তান অন্তর্হিত হল। ফাউস্ট তাঁর কব্জির আহত জায়গাটার রক্ত চিহ্নের দিকে তাকিয়ে যে অঙ্গীকার-পত্রে এই মাত্র তিনি সই করেছেন তার শব্দগুলিকে মনে মনে ওজন করতে লাগলেন, "হ্যাঁ, আমি আমার নাম ও রক্ত দান করেছি কিন্তু না, আমার আত্মাকে বিক্রি করিনি আমি। চব্বিশ ঘণ্টা! কম সময় নয়, এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু করা সম্ভব!"

তাঁর দরজার কড়া নড়ে উঠল। বহু কণ্ঠের সম্মিলিত চিৎকার শোনা গেল বাইরে থেকে। বিষণ্ণ শোকার্ত সেই চিৎকার ফাউস্টকে অত্যন্ত বিচলিত করল। তিনি জানলা খুলে নিচেয় তাকালেন।

তাঁকে দেখে জনতা কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল—সাহায্য কর ফাউস্ট, বাঁচাও।

—দাঁড়াও, একটু ধৈর্য ধর, আমি আসছি।

দরজার হাতল ধরে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন ফাউস্ট, ক্ষণকাল ভাবলেন, মনে মনে বললেন, আমি বাঁচাব এদের, শয়তানের নামে আমি রক্ষা করব এই অসহায় মানুষগুলিকে।

দরজা খুলে তিনি জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জনতা তখন সিঁড়ির

মুখে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। একটি নারী ফাউস্টকে দেখে দৌড়ে এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল। করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাল—ফাউস্ট, ফাউস্ট, আমার স্বামী বড় ভাল লোক সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান। সে এখন মুমূর্ষু। তুমি পুণ্যবান তাকে বাঁচাও ফাউস্ট।

ফাউস্ট বললেন—নিয়ে এস তাকে আমার সামনে।

দু'জন তাকে ধরাধরি করে ফাউস্টের কাছে নিয়ে এল। ফাউস্টের পায়ের কাছে রাখল তাকে। ফাউস্ট নত হয়ে মুমূর্ষুর বুকের ওপরে হাত রাখলেন, ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠলেন—শয়তানের নামে বলছি, তুমি বেঁচে ওঠো।

বিস্ময়কর ফল ফলল। লোকটি সোজা হয়ে উঠে বসল। দু'চোখের অবুঝ দৃষ্টি বুলোতে থাকল চারধারে যেন হঠাৎ কোন ঘন্টার শব্দে চকিত হয়ে স্বাভাবিক ঘুম থেকে জেগে উঠেছে সে। মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল সমগ্র জনতার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। তারপরই হৈ-চৈ চিৎকারে ফেটে পড়ল জনতা, তাদের স্বরে বিস্ময়ের অবধি নেই।

'অদ্ভুত কাণ্ড', 'অলৌকিক ব্যাপার' জনতার মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকল কেবল।

এরই মধ্যে আবার একটি যুবতী এসে ফাউস্টের হাতে চুমু খেল। তার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে মিনতি জানাল—তুমি পুণ্যবান, ভগবানের লোক, আমার মাকে বাঁচাও। তার প্রাণ দাও তুমি। আমি সারা জীবন যীশুর কাছে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করব। সিঁড়ির নিচে মাদুরের ওপরে শুইয়ে রেখেছিল সে তার মাকে, আঙুল দিয়ে দেখাল তাঁকে।

ফাউস্ট নেমে আসতে থাকলেন, জনতা পরম শ্রদ্ধায় সরে সরে গিয়ে তাঁকে পথ করে দিতে লাগল। তারা তাঁর আলখাল্লার প্রান্ত স্পর্শ করতে, চুমু খেতে নত হল। ফাউস্ট এসে মৃতপ্রায় মহিলাটির ওপরে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন—তিনি অপলক দেখতে থাকলেন সেই নিদর্শন যা তাঁর সমস্ত শক্তিকে নিরর্থক করে দিচ্ছে। মহিলাটির বুকের ওপরে পড়ে আছে ক্রুশাবদ্ধ যীশুর মূর্তি। ফাউস্ট মুমূর্ষুর বুকের ওপরে হাত রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু একটা অদৃশ্য বাধায় ঠেকে বার বার ফিরে আসছিল সেই হাত। অক্ষম তিনি তখন উন্মাদের মতন রোগীর যৎপরোনাস্তি নিকটে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে উঠলেন—শয়তানের নামে...কিন্তু সেই ফিস্‌ফিস্ উচ্চারণ পর্যন্ত

তার গলা দিয়ে বেরোতে পারল না। তিনি মরিয়া হয়ে উঠে শেষমেশ সেই অদৃশ্য প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে গায়ের জোরে সেই মৃতপ্রায় মানুষটির বুকে হাত রাখতে চাইলেন কিন্তু তাঁর কব্জিতে এমন একটা তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রণা সুরু হল যেন একটা জ্বলন্ত তলোয়ার কব্জিতে বিঁধে দিয়েছে কেউ। তাঁর অবশ হাতখানা এক পাশে ঝুলে পড়ল। তাঁর মুখ মলিন হয়ে গেল। কপালে দেখা দিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তাঁর। কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বে কাঁপতে থাকলেন তিনি ও আর একবার সর্বসামর্থ্য সংহত করে ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তির শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে অবনত হলেন, প্রবল স্রোত পেরিয়ে পাড়ে উঠতে সাঁতারু যেমন প্রাণপণ লড়াই করে তিনি তেমনি কঠোর চেষ্টায় তিল তিল করে রোগীর বুকের দিকে হাত এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। ক্রুশ চিহ্ন থেকে নিজের দৃষ্টি যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখলেন তিনি। মেয়েটি তার মায়ের মাথাটা কোলের মধ্যে নিয়ে বসেছিল। ফাউস্টের দুর্দশা দেখে সে ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর মূর্তি তাঁর মুখের সামনে তুলে ধরে কেঁদে উঠল—ফাউস্ট বাঁচাও, যীশুর দোহাই, মাকে আমার বাঁচাও তুমি।

ফাউস্ট কেঁপে উঠলেন, পিছু হটলেন। তাঁর মনে হল যেন তাঁর মুখে কেউ একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে। প্রবল আঘাতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তাঁর। একটা অদৃশ্য দুর্জয় শত্রুর আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে তাঁর বাহু দুটো সামনে প্রসারিত হল, মাথাটা সরে গেল পেছনে।

একটা ভয়ার্ত কলরব উঠল জনতার মধ্যে।

পবিত্র ক্রুশের সামনে যেতে পারছে না ফাউস্ট, বলাবলি করতে লাগল সকলে।

ফাউস্ট তখন ছুটলেন। পাথরের সিঁড়ি ভাঙতে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে টাল্‌মাটাল ফাউস্ট প্রাণপণে ছুটছেন। ছুটছেন যাঁকে তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন সেই মহতোমহীয়ান শক্তির সামনে থেকে, যে-শক্তি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে কঠিন হয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, তাঁকে করেছে নির্মম আঘাত। ফাউস্ট ছুটেছেন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, ফাউস্ট ছুটেছেন আত্মরক্ষা করতে। ফাউস্ট ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। আর তাঁর পেছনে জনতার ক্রুদ্ধচিৎকার ক্রমশ গগনবিদারী হয়ে উঠছে। তাঁদের ক্রোধ মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠছে ক্রমশ।

—হাঁ, ফাউস্ট আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছে ঠিক; কিন্তু ঈশ্বরের করুণায় নয় শয়তানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। শয়তান ওঁর সঙ্গী ওর সাকরেত। ওঁকে ঢিল মারো,

পাথর ছোঁড়।

হাঁ, পাথর, পাথর ছুঁড়ে মারো, মারো ওকে, মারো, চতুর্দিক জুড়ে চিৎকার গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মস্ত পাথরের টুকরো সাঁ করে এসে তাঁর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজার পাল্লায় দড়াম করে আছড়ে পড়ল পাথরটা। তারপরে আর একটা, তারপরে আরও একটা, তারপরে একসঙ্গে অনেকগুলি—কতকগুলি দরজায়, কতকগুলি দেয়ালে কতকগুলি ফাউস্টের ঘাড়ে পিঠে আছড়ে পড়ল, তাঁর ঢিলেঢালা আলখাল্লাটা তাঁকে অনেকখানি রক্ষা করছিল বটে কিন্তু ওতে আর কত ঠেকবে, তিনি খুবই আহত হতে থাকলেন। শেষমেশ একটা মস্ত ঢিল এসে তাঁর কানের পাশে রগে লাগল, লাগল এসে একটা কপালে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল রক্তের ধারায় চোখ অন্ধকার হয়ে গেল তাঁর, তিনি কোনমতে ছুটে এসে ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে চেয়ার টেনে চাপা দিলেন দরজা। জনতার রাগ তখন নির্মম হয়ে উঠেছে; ঝাঁকে ঝাঁকে ঢিল এসে পড়ছে দরজায়, তাদের চিৎকারে আকাশ ফেটে যাচ্ছে।

হতাশায় গ্লানিতে ও আঘাতে ক্লান্ত অবসন্ন মানুষটি তার পড়ার ঘরে এসে ঢুকলেন। জনতার ক্রোধ জনতার ঢিল নয়—মুমূর্ষু মহিলার বুকের ওপরকার অদৃশ্য মহাশক্তির প্রতীক ক্রুশবিদ্ধ যীশু মূর্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মার খেয়ে মর্মাহত বিপর্যস্ত তিনি দেহে মনে একেবারে ভেঙে পড়লেন এবার।—হায়, এই তাঁর আত্মত্যাগের পরিণাম, আর এরই জন্যে তিনি তাঁর অবিনশ্বর আত্মাকে বিপন্ন করেছেন!

তখনও দড়াম্ দড়াম্ শব্দ হচ্ছে, থান থান পাথর এসে আছড়ে পড়ছে দরজায় জানলায়। জানলার শার্শি ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়ছে, দেখতে দেখতে জানলার একখানা কাচও আর আস্ত রইল না। তিনি তাঁর অবশিষ্ট দিন ক'টাকে নিয়ে জুয়া খেলেছিলেন, তাঁর সমগ্র ভবিষ্যৎ-অস্তিত্বকে দান করেছিলেন রোগ থেকে মহামারী দূর করার দুরাশায়। তিনি হেরে গেলেন, সর্বস্ব হারালেন তিনি। তাঁর মনে পড়ল বালু-ঘড়ির সমস্ত বালু নিঃশেষ হওয়ার আগেই শয়তানের কাছ থেকে তিনি তাঁর তমসুক ফিরিয়ে নিতে পারেন।

"আজ আর আমার কাছে জীবনের মূল্য কতটুকু", ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন তিনি "আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই, আর কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই আমার। বিশ্বাস আমাকে পরিত্যাগ করেছে, আমি নিজে হাতে জ্ঞানকে নির্বাসিত করেছি। কোন কর্তব্য পালনের দায়িত্বও নেই আজ আমার? আত্মত্যাগের প্রশ্নও

অবান্তর। আমার জীবন এখন একটা অভিশাপ মাত্র।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, এখন যদি তিনি মরে যান তা হলে শয়তানের সঙ্গে তার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সেই ভাল; মনে মনে বললেন ফাউস্ট, তাই হোক।

তিনি একটা পেঁট্‌রা খুললেন। একটা কালো রঙের বোতল বের করলেন পেঁট্‌রা থেকে। বোতলের গায়ে খোদাই করা আছে একটা নরকংকালের চিত্র। চিত্রের মাথায় ধনুকের মতন বাঁকা করে লেখা রয়েছে "পান কর এবং আত্মবিস্মৃত হও"। একটা কাচের পাত্রে তিনি বোতল থেকে খানিকটা ঢেলে নিলেন— তরল জলীয় বস্তুটার কোন রঙ নেই কেবল মৃদু মিষ্টি একটু গন্ধ। তিনি দু'হাতের অঞ্জলিতে ধরে পাত্রটি ঠোঁটের কাছে তুলে নিলেন—"হে বিষ, তুমি আমাকে মুক্তি দাও।" বলে তিনি বিষটা গলায় ঢেলে দেবেন, সেই মুহূর্তে একটা নিরাকার ছায়া দেয়ালের গা থেকে ভেসে এসে মূর্তি ধারণ করল। তার একখানা হাত কব্‌জি চেপে ধরল ফাউস্টের। ফাউস্ট দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শয়তান।

—না, এমন করে তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এখনও বালু-ঘড়ির বালু ফুরোতে অনেক দেরি আছে। শয়তান হতভাগ্য মানুষটির হাত থেকে পাত্রটি কেড়ে নিল।

—তার মরার সময়টা স্থির করার অধিকারও কী নেই মানুষের? জিজ্ঞেস করলেন ফাউস্ট।

শয়তান আবার পাত্রটা তুলে ধরল তাঁর চোখের সামনে, বলল, তাকাও এর ভেতরে।

ফাউস্ট পাত্রটার মধ্যে তাকালেন, বর্ণহীন তরল পদার্থ ছাড়া প্রথমে তাঁর চোখে আর কিছুই ধরা পড়ল না। কিন্তু পলকের মধ্যেই সেখানে পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি দেখলেন, হঠাৎ বাষ্পে পরিণত হল সমস্ত জিনিসটা; দেখতে দেখতে এক দুগ্ধফেননিভ জ্যোতির্ময় রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, প্রাণের সাড়া জাগল তাতে। পলক পড়তে না পড়তে বাষ্প-কুয়াসা মিলিয়ে গেল, এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলেন তিনি, জীবন ও যৌবনের এক বিস্ময়ের ছবি ফুটে উঠল তাঁর চোখের সামনে—একখানি স্মিত মুখ তাকাল তাঁর দিকে। জীবনের আনন্দে উচ্ছল, প্রাণ-শক্তিতে দুর্জয়, আত্মবিশ্বাসে বলিষ্ঠ সুন্দর এক তরুণের মুখচ্ছবি দেখলেন তিনি।

যৌবনকে চিরকাল ভালবেসে এসেছেন ফাউস্ট; কিন্তু যৌবনের এই গৌরব-

দৃপ্ত প্রতিচ্ছবি কখনো চোখে পড়েনি তাঁর। কখনো দেখেন নি প্রাণ-প্রাচুর্যের এমন বিস্ময়, আত্মবিশ্বাসের এমন প্রোজ্জ্বল রূপ।

—বিষ-পাত্রে এ কী দেখছি আমি? ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠলেন ফাউস্ট।

—মৃত্যু নয় ফাউস্ট, জীবন। জীবন তোমাকে যৌবনের মনোহরণ রূপে প্রলুব্ধ করছে। কানে কানে বলল শয়তান।

—কে তুমি আমার কানে কানে জীবনের কথা বলছ?

—কাকে বলে মনে হয় তোমার? আমার বহু রূপ আছে; কিন্তু তুমি আমাকে ভাল করেই জান ফাউস্ট। আমি শয়তান।

—তুমি এই সুন্দর দৃশ্য আমার চোখের সামনে তুলে ধরে কেন সময় নষ্ট করছ? বাঁচবার সাধ আর আমার এতটুকু নেই।

—হতভাগ্য ফাউস্ট, কেন তুমি মরতে চাও, এখনও ত বাঁচার মতন বাঁচাই হল না তোমার।

—জীবনের ওপরে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। ক্ষুব্ধ গলায় বলে উঠলেন পরম সুধী বিষণ্ণ মানুষটি।

—আবার পাত্রটির দিকে তাকাও। শয়তান কানে কানে বলল।

ফাউস্ট চোখ তুললেন। যৌবনের দৃশ্যটি মিলিয়ে গেছে। বুদ্‌বুদ্‌ উঠছিল তখন। মনে হচ্ছিল যেন পদার্থটা ফুটছে। দু'পলকেই তরল পদার্থের সে চঞ্চলতা শান্ত হল ঊর্ধ্বস্তরে আলো ও আঁধারের স্ফুলিঙ্গ দ্রুত বেগে ছুটাছুটি করতে লাগল ও ক্রমশ একটা বীভৎস চেহারা ফুটে উঠে থাকল সেখানে। কয়েকখানা ভগ্ন হাড় চোখে পড়ল ফাউস্টের। মানুষের মাথার খুলিও একটা দেখলেন তিনি, খুলিটার চারধারে কৃমিকীট কিলবিল করছে—তাঁর মনে হল, ও যেন তাঁরই মাথার খুলি, তাঁরই অবয়বের একটা অস্পষ্ট আদল যেন রয়েছে সেখানে।

—এ-ই মৃত্যু, ফাউস্ট, তুমি এ-কে চাও? ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল শয়তান।

বিষ-পাত্রটাকে প্রবল বেগে মেঝেয় আছড়ে মারলেন ফাউস্ট, তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।

—অনেক দিন বেঁচে থেকে জীবনটাকে আমি ভাল করে জেনে গেছি, আমার ঘেন্না ধরে গেছে জীবনের ওপরে। কেঁদে ফেললেন ফাউস্ট।

শয়তান বলল—না ফাউস্ট, তুমি কেবল পুঁথি পত্রের খবরই রাখ, আনন্দ কী জান না। আসলে আনন্দই জীবন। শয়তান হাসল।

—আনন্দ দিয়ে আমার কী হবে? আমি বৃদ্ধ, বয়েসের ভারে পঙ্গু, আনন্দলাভের অযোগ্য একটা জরাক্রান্ত স্থবির।

—আমি তোমাকে যৌবন দান করব ফাউস্ট, সব সওগাতের সেরা সওগাত দেব তোমাকে। ওই যে, তাকাও, দেখ, বিষের পাত্রটা যেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ফাউস্ট, সেদিকে আঙুল তুলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল শয়তান। আবার ফাউস্ট সেখানে দেখতে পেলেন সেই তরুণ মূর্তি। সুঠাম সুদর্শন শরীর, গভীর অভীক চোখ, গর্বোদ্ধত ভঙ্গি।

ফাউস্টের গলা জড়িয়ে ধরে শয়তান নিঃশ্বাসের স্বরে বলল—ওই সেই চেহারা, তোমার মনের মধ্যে এতটুকু বাসনা করা মাত্র যা তুমি হতে পার।

ফাউস্ট একটা আর্তনাদ করে উঠলেন। সেই আর্ত চিৎকারের মধ্যে আশা ও নৈরাশ্য, লোভ ও যন্ত্রণা কামনা ও ভয় সমস্বরে বেজে উঠল। তিনি দু'বাহু বিস্তার করে শয়তানের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর বিষণ্ণ-পাণ্ডুর মুখ অশ্রুসিক্ত। আগ্রহ ব্যাকুল চোখে মিনতি। নিরুপায় মানুষটি ভেঙে পড়ে বললেন—দাও, আমাকে তুমি ওই অমিত যৌবনের অধিকারী কর শয়তান।

মনের ভিতরে নিদারুণ দ্বন্দ্ব সংঘাতে হৃতশক্তি ফাউস্ট অবসাদে চোখ বুজে ফেলেছিলেন। তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁর অতি-সন্নিকটবর্তী শয়তানের মুখে-চোখে কী মনোভাবের আভাস সঞ্চার করল তিনি দেখতে পেলেন না।

শয়তানের চোখ জ্বলন্ত কয়লার মতন ধক্‌ধক্ করছিল, মুখে ফুটে উঠেছিল কঠোর কুটিল রেখা। সে সাপের মতন হিস্‌হিস্ শব্দ করে স্বগতোক্তি করল—শেষমেশ এইবার তোমাকে আমি বাগে পেয়েছি।

৮

ভরা দিন। ফাউস্টের পড়ার-ঘরের বালু-ঘড়ির বালু নিচের অংশে যে পরিমাণ নেমে এসেছে তাতে করে অনুমান ঘণ্টা তিনেক হবে ফাউস্ট শর্তনামায় সই করেছেন।

ঘরের মাঝখানে একটা ওক কাঠের টেবিল। এক ফালি আলো বাঁকা হয়ে এসে পড়েছে টেবিলের ওপরে। সে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চিৎ হয়ে শোয়া ফাউস্টের টানটান শরীর। তাঁর হাত দু'খানি বুকের ওপরে ভাঁজ করা, মনে হচ্ছে

যেন একটা শব।

শয়তান সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল, বলে উঠল—আমার, তুমি প্রায় মুঠোর মধ্যে এখন আমার। 'দিব্য দীধিতি'র অলোক শক্তির সঙ্গে বাজীতে আমি জিতবই। সে উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা তুলল, চিৎকার করে বলল—শয়তানের শক্তিকে রুখতে পারে কার সাধ্য!

ঘরের মধ্যে জ্বলছিল একটা অগ্নিকুণ্ড, প্রচণ্ড দাহে এবার তার আগুন দাউদাউ করে উঠল। অগ্নিকুণ্ডের সেই প্রবল দহনে সাদা কয়লার ওপরে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল শয়তান, লেলিহান শিখার মধ্যে মুখ গুঁজে উন্মত্ত শক্তিতে ফুঁ দিল তার ভিতরে, সে অমিত নিঃশ্বাসের বাতাসে পাগল আগুন শয়তানকে বেষ্টন করে খা-খা করে উঠল, নারকীয় নৃত্যে ও সঙ্গীতে উদ্দাম হয়ে উঠল তার লেলিহান শিখা। শয়তান তার মধ্যে থেকে কী একটা বস্তু টেনে তুলল, টানতে টানতে বেরিয়ে এল অগ্নিকুণ্ড থেকে। বস্তুটা একধরণের ভাসমান পদার্থ অগ্নিশিখার মতন তার রঙ তাকে ঘিরে নাগিনীর মতন ফুঁসছে দুলছে লক্ষ লক্ষ বর্ণালি শিখা। শয়তান সেই অতিপ্রাকৃত পদার্থ দিয়ে ফাউস্টের শরীরটাকে ঢেকে দিল ফাউস্টের দেহ আবৃত করে পদার্থটা ঝুলে পড়ল মেঝে পর্যন্ত। তখন সে তার আলখাল্লার ভিতর থেকে একটা ছোট্ট আরশি বের করল। আরশিখানা হাতের চেটোয় রেখে ফাউস্টের মুখের ওপর থেকে আগ্নেয় আরবরণটি সরিয়ে আরশিখানা মুহূর্তের জন্যে ধরে রাখল বৃদ্ধ ফাউস্টের জীর্ণ জৌলুসহীন গোঁফ-দাড়িতে বিছ্‌ছিরি মুখের ওপরে তারপর আবার করে আগ্নেয় আবরণে ঢেকে দিল তার মুখ এবং আরশিখানা নিজের চোখের সামনে ধরে জিভে তালুতে একটা নারকীয় খুশীর শব্দ করল। কারণ আরশিখানিতে বন্দী হয়ে গেছে বৃদ্ধ ফাউস্টের মুখচ্ছবি। সে করুণ মুখে উদ্বেগ, কম্পিত ঠোঁটে আকুল আকুতি, দৃষ্টি শয়তানের দিকে স্থির। আরশিখানা শয়তান সযত্নে বুকের মধ্যে রেখে দিল যেন একখানা দুর্লভ রত্ন।

শয়তান এখন তার হাতখানাকে তিনবার ওঠাল নামাল শেষে টেবিলটার চারধারে দ্রুত ঘুরতে থাকল। সে যত ঘুরছে আগুনের শিখা ততই ক্ষিপ্ত হচ্ছে। লক্ষ-লক্ষ শিখার নাগিনী ফণাবিস্তার করে ফাউস্টের মৃতের মত দেহখানা ঘিরে দাউ দাউ করছে। সে শিখার ফণা ঘরের ছাদ দেয়াল ছেয়ে ফেলেছে, ছড়িয়ে পড়েছে ঘরখানার কোণায় কোণায়—সব খানে; যেন গোটা পাঠাগারটাই একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠেছে। সে অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠছে নারকীয় দীর্ঘশ্বাস, নারকীয় সঙ্গীত; পৈশাচিক গর্জন আর নৃত্যে পূর্ণ হয়ে গেছে ঘরখানা

কিন্তু সে নরকের আগুনে ঘরের কোন কিছুতেই আগুন ধরছে না, পুড়ছে না কোন কিছুই। কেবল ফাউস্টের দেহের ওপর কার আগ্নেয় আবরণটা ফুলে কেঁপে ক্রমাগত উৎক্ষিপ্ত আর বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন তার ভিতরে ভীষণ একটা ওলট পালট চলছে।

—যথেষ্ট হয়েছে থামো এইবার, পিশাচগণ তোমরা শান্ত হও। শয়তান আদেশ করল। আর পলকে সব শান্ত হয়ে গেল। অগ্নিশিখা অন্তর্হিত হল। নারকীয় সঙ্গীত থেমে গেল। সেই আগ্নেয় আবরণটির সেই গলিত স্বর্ণ কিরণ আর নেই। সে এখন বিবর্ণ ধূসর হয়ে লেপটে আছে ফাউস্টের ওপরে, তার নিচে দেহটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

শয়তান দ্রুত হাতে আবরণটা তুলে নিল। আদেশের স্বরে বললে—ওঠ, জাগো, ভোগ কর এইবার তোমার জীবন।

সেই বুড়ো ফাউস্ট আর নেই। তার জায়গায় সুদর্শন একটি যুবক। পরিধানে তাঁর স্বর্ণখচিত শুভ্র রেশমী পোশাক।

তিনি উঠে বসলেন। চতুর্দিকে তাকালেন তিনি। তারপর লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন মেঝেয়, পরম আরামে হাত পা ছড়িয়ে আলস্য ভাঙলেন তিনি, যেন একটা দীর্ঘ সুনিদ্রার পর জেগে উঠেছেন। তাঁর সুন্দর সুঠাম সুগঠিত দেহ, তনু শরীরে অনতিস্থূল জঘন-জংঘা, গর্বোদ্ধত পেশল গ্রীবা, মাথায় একমাথা ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ; তাঁর দেহের নবনীত পেলব লাবণ্য শক্তির প্রাচুর্যে উজ্জ্বল। তিনি ইতালীয় রীতিতে সজ্জিত। তাঁর শ্বেত অঙ্গাবরণ, শুভ্র অন্তর্বাস, স্বর্ণখচিত পোশাক স্পর্শ করে আছে সুবর্ণ নির্মিত পাদুকা, আলখাল্লা আর টুপিতে গোঁজা রয়েছে পাখির কালো পালক।

তাঁর নিষ্পাপ নির্মল মুখে জীবনের দিব্য বিভা, তিক্ত সংসারাভিজ্ঞতার রূঢ় চিহ্নের লেশমাত্র নেই সেখানে। তাঁর কালো চোখের তারায় তারায় ঝিকমিক্ করছে সাহস ও কৌতূহল, তাঁর ভাবে ও ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস ও অবিচল শক্তির আভাস ঝলমল করছে।

শয়তান পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিল তার সৃষ্টিকে। তার দৃষ্টিতে সন্তোষ, আত্মপ্রসাদ।

হঠাৎ অগ্নিকুণ্ড থেকে একটা ছায়া শরীর বেরিয়ে এল। শয়তানের অন্যতম অনুচর সেই ছায়া-মূর্তি ধীরে ধীরে রক্তমাংসের অবয়ব ধারণ করতে থাকল আর সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের পূর্ব-মূর্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকল ক্রমশ। নব দেহে

শয়তান এবার ফাউস্টের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পেছনে হাত নেড়ে তার বিলীয়মান পুরোনো শরীরকে সরে যেতে সংকেত জানাল। ক্ষীয়মাণ ছায়া-মূর্তি সে আদেশে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

শয়তান পৃথিবীর মানুষের দেহ ধারণ করেছে এবার। ফাউস্ট নতুন জীবনের উপযুক্ত সঙ্গীর মতন প্রশংসনীয় মূর্তি ধরেছে সে। তার অবয়বে উদ্ভিন্ন যৌবন, দেহে শক্তির প্রাচুর্য, ভঙ্গিতে অহমিকা।

আধুনিকতার চরম তার পোশাক-পরিচ্ছদ। উজ্জ্বল কালো রেশমে গোলাপী বর্ণ বিকীর্ণ তার আঙরাখা। শরীরের সঙ্গে সেঁটে বসা তার জামা প্যান্ট, জুতো, এমনকি মাথার টুপিটাও তার কালো। কালো আঙরাখার গোলাপী পাড় জুতো ছুঁয়ে আছে। প্রতি পদক্ষেপে তার শরীর থেকে ঠিকরে পড়ছে অতিপ্রাকৃত এক জ্যোতি। তার মাথার সঙ্গে শক্ত করে সাঁটা টুপিতে আঁটা রয়েছে একটি লম্বা পালক, নরম লাল যেন নরকের ফুল, মাথা নোয়ালেই প্রায় তিন ফুট সে-পালক মাথার ওপরে সোজা খাড়া হয়ে থাকে। তার আঙরাখার নিচে কোমরে ঝুলছে রত্নখচিত একখানি সরু তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

সে ফাউস্টের সামনে এসে তাকে একটা দীর্ঘ কুর্ণিশ করল। বলল—তোমার ভৃত্য, শয়তান। কিন্তু ফাউস্টের দৃষ্টির আড়ালে তার কুটিল ভ্রূ-ভঙ্গির নিচে চোখের তারায় ফুটে উঠল নারকীয় হাসি ও বিদ্রূপ।

ফাউস্ট ঋজু শরীর শক্ত করে ঘুরে দাঁড়ালেন, হাত তুললেন, হাসলেন, হাসিতে উদ্ধত ভঙ্গি যেন শয়তানের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বেন, জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার ভৃত্য? পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির প্রভু তুমি আমার ভৃত্য? একটা সম্পূর্ণ দিন তুমি আমার আজ্ঞাধীন?

—হাঁ, বালু-ঘড়ির শেষ বালুকণা না ঝরে পড়া তক আমি তোমার চাকর। বালু-ঘড়ির ওপর হাত রেখে বলল শয়তান, তুমি কী চাও, তোমার জন্যে এখন আমি কী করব, আদেশ দাও।

—আমার বাসনা অনেক। তার মধ্যে কোনটা তোমাকে পূর্ণ করতে বলব ভেবে ওঠা শক্ত। মুহূর্তকাল আগেও আমি মৃত ছিলাম। সবে আমি বাঁচতে শুরু করেছি। আমার গোটা জীবন অপব্যয়ে বরবাদ হয়েছে। আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি ওসবে আর আমার রুচি নেই। আমি চাই বাঁচতে, আমাকে বাঁচতে দাও, দাও পৃথিবী যা দিতে পারে সব—সমস্ত দাও। আমি সব, সমস্ত চাই।

—ভয় নেই। আমি তোমাকে সব সরবরাহ করব, সমস্ত বাসনা পূর্ণ করব তোমার। ছাখ।

শয়তান অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঘুরে বাহু উত্তোলন করল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা নিরবয়ব ছায়া উঠে এল সেখান থেকে। ধীরে ধীরে সেই সূক্ষ্ম ছায়া স্থূল হল শেষে গোলাপী অলকে শুভ্র ত্বকে চোখ ঝলসানো রূপ নিয়ে এক মোহিনীর নগ্ন শরীর হয়ে উঠল। এসে দাঁড়াল ফাউস্টের সামনে। প্রাণময় সে-দেহে রক্তের উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তার মুখখানি নিষ্পাপ নির্মল কিন্তু তার মদির চোখে কামনা, তার প্রসারিত বাহুতে আত্মসমর্পণের আকৃতি।

শয়তানের চোখ জ্বলে উঠল। ফাউস্টের দিকে সে একটা তীক্ষ্ণ ধূর্ত দৃষ্টি হানল। তার মুখে ফুটে উঠল একটা হিংস্র তৃপ্তির স্মিত হাসি। মনে মনে বলল—আবার সাফল্য। দাবার সেরা চাল কুইন গ্যামবিট—তোমাকে টোপ ফেলে কত আত্মাকেই না আমি কেড়ে নিয়েছি। বুড়োদের বেলা আমি চালি নাইটের চাল, মেয়েদের বেলা ক্যাসল-এর। আর আমার সেরা চাল কুইন-এর চালে মাত করি যত তরুণ ধুরন্ধরদের।

ফাউস্ট যুবতীকে ধরতে একটা পা বাড়িয়েছিলেন। শয়তান দাঁড়িয়েছিল পেছনে। একটা নিষ্ঠুর মতলবে তার হিংস্র চোখ জ্বলছিল, চোয়াল উঠেছিল শক্ত হয়ে। তার হাতটা এসে পড়ল তাঁর কাঁধে, সে তাঁকে এগোতে দিল না। শয়তানের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে সেই মুহূর্তে যুবতীর দেহটি গেল মিলিয়ে।

ফাউস্ট শয়তানের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন, স্বপ্ন দেখাচ্ছ? আমি আদেশ করছি শয়তান, অতঃপর আর কোন মায়ার খেলা খেলবে না আমার সঙ্গে; আমি চাই জীবন্ত জিনিস।

কীই বা স্বপ্ন আর কীই বা বাস্তব? শান্ত গলায় বলল শয়তান, বস্তু শেষ হয় কোথায়, কোথা থেকে শুরু হয় স্বপ্ন?

কূট তর্ক রাখ, দর্শনের বুলি শুনতে চাইনে আমি। সে-সব বুড়ো ফাউস্টের ব্যাপার। আজকের জন্যে আমি বাস্তব পৃথিবীটাকে দেখতে চাই, আমি চাই দৃশ্যমান জগৎটাকে।

তার উত্তরে চৌকশ খেলোয়াড়ের মতন নিপুণ কৌশলে শয়তান তার আলখাল্লাটা একটা দ্রুত সুন্দর ভঙ্গিতে জালের মতন ছড়িয়ে দিল দুজনের মাঝখানে।

—তুমি আমাকে আদেশ করেছ। তাই হোক। আমার এই আলখাল্লার

ওপরে উঠে এস।

বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল ফাউস্টের চোখে। তিনি ক্ষণকাল কী দেখলেন শয়তানের মুখে তারপর উঠে এলেন আলখাল্লার ওপরে। শয়তানও তার পাশে এসে দাঁড়াল। দু'হাতে তাঁর কোমর শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল—আমি তোমাকে দেখাব তামাম দুনিয়া।

ফাউস্ট তার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে বললেন—তুমি আমাকে দুনিয়ার যত ভোগের বস্তু তাই কেবল দেখাও।

—বেশ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। শয়তান ফাউস্টকে শক্ত করে ধরে ভ্রূ-কুঁচকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে জানলার বন্ধ পাল্লার দিকে তাকাল। গোটা ফ্রেম শুদ্ধ শার্শির পাল্লা দেয়াল থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এল কাৎ হয়ে কিছু দুর শূন্যে ছিট্‌কে গিয়ে হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পায়ের তলায় আলখাল্লাটা শিরশির্ করে উঠল, কাঁপল মুহূর্তকাল তারপরেই হাল্‌কা বোঝার মতন স্বচ্ছন্দে তাদের নিয়ে ভেসে উঠল। টেবিলের ওপরে ক্ষণেক ভেসে থাকল যেন দ্বিধা করছে, যেন বুদ্ধিসম্পন্ন কেউ, কিছু ভেবে নিচ্ছে, হয়ত তার পিঠের ওপরে সওয়ার প্রভু দু'জনকে গুছিয়ে বসার সময় দিচ্ছে, তারপরেই যেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে এমন একটা নিশ্চিত ভঙ্গিতে অর্ধবৃত্তাকারে একটা পাক খেয়ে আলখাল্লাটা সোঁ করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাইরে এসে তাঁরা তীব্র বেগে শহরের আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে গেল বৃত্তাকারে গির্জা প্রদক্ষিণ করে রোডা থেকে অনেক মাইল দূরে সরে গেল তাঁরা। তাঁরা যখন গির্জা পার হয় শয়তান ঘাড় ঘুরিয়ে গির্জা থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে।

ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার মতন বেগে বাতাস সাঁ সাঁ করে বয়ে যাচ্ছিল তাঁদের ওপর দিয়ে। কিন্তু ফাউস্ট লক্ষ্য করলেন, তাতে করে তাঁর না হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট না হচ্ছে দেখতে অসুবিধে। আলখাল্লাটা খুব পাতলা বোধ হচ্ছিল কিন্তু সেটা যে দারুন শক্ত তাও অনুভব করতে পারছিলেন তিনি. তিনি বাতাসের ওপরে ভর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকতেও পারছিলেন অনায়াসেই, বেশ স্বচ্ছন্দেই দেখতে পারছিলেন মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন নিচেকার বিস্ময়কর দৃশ্যগুলি—কত বিচিত্র দেশের ওপর দিয়েই না তাঁরা উড়ে যাচ্ছিলেন।

—কোন্ দেশ দেখতে চাও, ফাউস্ট, কোথায় নামবে? জিজ্ঞেস করল শয়তান।

—আগে ত সব দেখি তারপর স্থির করব। জবাব দিলেন ফাউস্ট।

আদেশের অপেক্ষা নেই আলখাল্লাখানি দিক পালটাল। চলল দক্ষিণ পূব দিকে। দেশের পর দেশ স্রোতের মতন বয়ে যেতে লাগল নিচে দিয়ে। নদী পর্বত হ্রদ অরণ্য সমতল পার হয়ে যেতে যেতে ফাউস্টের মনে হল তিনি যেন পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ঘরটাতে দাঁড়িয়ে আর একবার মৃদু ঘূর্ণায়মান ভূ-গোলকটাকে দেখে নিচ্ছেন।

শয়তান বলল—যদি তুমি কাছে থেকে কোন দেশকে দেখে নিতে চাও ত বল। আলাখাল্লা সে-দেশের আকাশে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। যদি মাটিতে নামতে চাও বল, তাও পারবে তুমি।

তাঁরা উল্কার মতন ছুটে চলেছিলেন তুষারকিরীটী আলপ্‌স্‌-এর ওপর দিয়ে তার তীক্ষ্ণধার শৃঙ্গগুলি পার হয়ে। তখন বহুদূর নিচে অসংখ্য হ্রদ দেখলেন ফাউস্ট, তাঁর মনে হল যেন নুড়ির মতন ছোট ছোট উজ্জ্বল মসৃণ বহুমূল্য কাচ-মণি প্রস্তর সব একটা বিশাল নীল আস্তরণের ওপরে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। ভূমধ্যসাগরে এসে পড়লে ফাউস্টের আদেশে তাঁরা সমুদ্রের অল্প উঁচুয় নেমে এলেন, সমুদ্র জুড়ে ঘুরতে থাকলেন তাঁরা, ফাউস্টের চোখে পড়ল স্পেনের অসংখ্য জাহাজ।

শয়তান বলল, স্পেনের বাণিজ্য-জাহাজের বিরাট বহর ব্যবসা করতে বেরিয়েছে। ওরা জানে না, অচিরেই ওরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

পলকে তাঁরা সাগর ঘুরে পৃথিবীর শীর্ষ পর্বতমালা উৎরে মরুভূমিতে এসে পড়লেন। গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রখর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে ধূ-ধূ বিশাল বালুকা বিকীর্ণ প্রান্তরে লক্ষকোটি দীপ্ত নক্ষত্রের মতন ঝিক্‌মিক্‌ করছে। মুহূর্ত মধ্যে সেখান থেকে চলে গেলেন ঘন গহন বিপুল অরণ্যাঞ্চলে, পেরিয়ে এলেন সমুদ্র উপকূলে। সেখানে থামলেন তাঁরা একটুখানি।

—এই হল 'নুবিয়া,' শয়তান বলল, শিগ্‌গিরই এই নুবিয়ার জনসাধারণের ভাগ্য একাকার হয়ে যাবে সাগর পারের এক নতুন দেশের শ্বেতকায়দের সঙ্গে। তারা বলবান হয়ে উঠবে। কারণ দুনিয়ার অন্যান্য জাতির চেয়ে শ্বেতকায় জাতিরাই আমাকে সেবা করতে বেশী উৎসাহী।

—নতুন দেশ, ফাউস্ট মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি নাম শুনেছি। শ্বেতকায়দের দেশগুলি দেখবার আমার ভারি ইচ্ছে, আমাকে নিয়ে চল সেখানে।

আবার তাঁরা মায়াবী গতিতে ছুটে চললেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কখনো তাঁরা এসে পড়ছেন প্রলয়ান্তক প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে, কখনো শান্তির নীল-নির্জন পেরিয়ে যাচ্ছেন। প্রকৃতির সকল প্রতিরোধের বিরুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলখাল্লা সমুদ্র পর্বত সূর্য পেরিয়ে অনায়াস গতিতে উড়ে যাচ্ছে। বহু নিম্নের পুঞ্জ মেঘে দৃষ্টি আবৃত না হলে ফাউস্ট কখনো দেখছেন, উদ্বেল আকুল অনন্ত সমুদ্র—তার পরিবর্তনশীল বর্ণবিলাস, তার এই শান্ত ভাব, এই রুদ্র মূর্তি, লক্ষকোটি উর্মি-নাগিনীর সরোষ গর্জন, কখনো বিস্ময়কর গগনস্পর্শী বিশাল জলস্তম্ভ রচনা, কখনো পর্বত-প্রতিম ঢেউয়ের ভয়ংকর মেঘনাদ। তারই মধ্যে কোথাও বিশাল শরীর লিভাইঅ্যাথন কোথাও দৈত্যসদৃশ তিমিঙ্গল মাথায় জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে লেজের ঘায়ে তুলকালাম করে নিজের ঝরনা ধারার কুয়াসায় পরম সুখে খেলা করছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও সমুদ্র ভাল লাগল না ফাউস্টের, মনে হল বড় পরিত্যক্ত, বড় নির্জন, একটা জাহাজও চলছে না কোনদিকে, একটা পাখিও উড়ছে না, চোখে পড়ছে মানুষের হাতের চিহ্ন কোন্‌খানে।

শয়তান ফাউস্টের মনোভাব বুঝতে পেরেছিল, বললে, এমন একদিন আসবে যেদিন তোমার স্যাকসনি শহরের ছোট-বড় নানা পথের মতন এই সমুদ্রেও সমুদ্রগামী জাহাজের বহু ছোট-বড় যাত্রাপথের চিহ্ন পড়বে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এমন বিরাট ও এত অসংখ্য সমুদ্র জাহাজ পাখির ঝাঁকের মতন সার বেঁধে এই সমুদ্র পথে আসবে যাবে। প্রাচীন পৃথিবী থেকে একদিন কয়েকখানি জাহাজ এ পথে রওনা হয়েছিল তাদের একখানা মাত্র ফিরতে পেরেছিল আর সব কোথায় হারিয়ে গেল কেউ জানে না কিন্তু আমি জানি, শয়তান চোখের কোণে তাকাল তাঁর দিকে, তার চুপ চোখে ব্যঙ্গ।

ফাউস্ট মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আবার তাঁর চোখে পড়ল জলের পরে কেবল জল, তাঁর আর জল ভাল লাগলছিল না, জল দেখে দেখে তাঁর চিত্ত বিকল হয়ে উঠেছে সামান্য সমতলভূমি দেখার জন্যে তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন যেন কতকাল তিনি মাটির মুখ দেখেন নি। তখনই তাঁর চোখে পড়ল বিন্দু বিন্দু কতকগুলি কালো চিহ্ন সমুদ্রের জলে ভাসছে। দেখতে দেখতে সেগুলি ক্রমশ দ্বীপভূমির আকার পেতে থাকল, এক লহমায় তিনি উষ্ণ, ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিলাসবহুল এক নতুন মহাদেশের আকাশে এসে হাজির হলেন, মর্মর মুখর নিবিড় অরণ্যাঞ্চল ও দিগন্ত বিস্তৃত স্বর্ণশীর্ষ শস্যক্ষেত্র নিয়ে মহাদেশটি খুশীতে ঝলমল করছে।

—এক পুরুষও হয়নি শ্বেতকায় জাতি এ মহাদেশটির সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু

আমার নামের গৌরবে তারা ইতিমধ্যেই এ দেশের মাটিতে এক বিরাট সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছে। কারণ আমি হলাম প্রভু, এই দুনিয়াদারির মহামান্য মালিক, বিদ্রূপ-তিক্ত ঘৃণার কণ্ঠে হেসে উঠল শয়তান। তারপর নির্লিপ্ত-ভঙ্গিতে মাথা কাৎ করে জিজ্ঞাসা করল—এর পর আর কোথায় যাবার ইচ্ছে, নাকি মজা লুটবার সুখভোগ করবার কোন জায়গা ভেবেছ? অথবা বল, চির-তুষারের দেশ দেখবে, দেখবে সেইসব অজ্ঞাত দেশ যেখানে আজ অবধি মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। কিংবা কি প্রাচ্যদেশে যেতে চাও? যেতে চাও ওফির কি ক্যাথাই-এ, না, যাবে সেইসব দেশে যে দেশের নাম কেবল ভূগোলে পড়েছ কিংবা শুনেছ লোকমুখে, কখনো চোখে দেখনি?

—না, শয়তান, না, অজানা মানুষের মধ্যে একাকী বেড়িয়ে বেড়ানোর সাধ নেই আমার, অপরিচিত ভাষা-ভাষীদের মধ্যে যাব না আমি, সময় হয়ে যাচ্ছে, আমার আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, আমাকে তুমি আমার স্বদেশের মানুষের কাছে নিয়ে চল। না, না আমার ইচ্ছে হচ্ছে ইতালি যেতে, সেখানে আমার ছাত্রজীবন কেটেছে, একমাত্র সে দিনগুলির কথা মনে পড়লেই আজও আমার বুক খুশীতে ভরে ওঠে।

—তা হলে ইতালি, বলল শয়তান। অমনি বাঁক ফিরল, সাঁ সাঁ শব্দে হাওয়া কেটে বিদ্যুৎগতিতে খেয়ালের খেলায় মত্ত নির্জন সমুদ্র পেরিয়ে চলল আলখাল্লা। যে গতিতে তাঁরা এসেছিলেন তার দ্বিগুণ গতিতে এবার ফিরে চলেছেন তাঁরা। অনেক উঁচু দিয়ে চলছিলেন। সেই উচ্চতা ও গতিবেগের দরুন সমুদ্রকে ফাউস্টের মনে হচ্ছিল খরবেগে প্রবহমান এক জ্যোতির্ময় অবলেপের মতন। তাঁর ভাল লাগছিল না। তখন আলখাল্লার গতিবেগ কিঞ্চিৎ শ্লথ হয়েছে অদূরে দ্বীপের আভাস দেখতে পেয়েছেন তিনি। অচিরেই তিনি ডাঙা দেখতে পাবেন ভেবে তাঁর অ-ধৈর্য মন শান্ত হল।

—ইংল্যাণ্ড, শয়তান বলে উঠল তক্ষুনি। আমরা ইংল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে যাচ্ছি, একদিন এই দেশ সমস্ত দুনিয়াদারীর মালিক হবে। আলখাল্লার বেগ আরও মন্দীভূত হয়েছে তখন, নিচেও নেমে এসেছে অনেকখা ন, ফাউস্ট এখন আলাদা আলাদা করে দেখতে পাচ্ছেন ছোট বড় গ্রাম-গঞ্জ জনপদ খেত-খামার নদী হ্রদ। একে একে তিনি ফ্রান্স জর্মনী এমন কি তাঁর প্রিয় স্যাকসনীও পার হয়ে গেলেন, ডিঙিয়ে গেলেন আল্‌পস্; আবার এসে পড়লেন সুইজারল্যাণ্ডে অবশেষে ইতালির আকাশে পৌঁছলেন তাঁরা।

দিনের আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। গোধূলির ম্লান ছায়া নেমেছে শহরে, ইতস্তত আলোর বিন্দু ফুটে উঠছে একটি একটি করে।

—থাম, আদেশ করলেন ফাউস্ট।

তাঁকে ঘিরে বাতাসের উন্মত্ত সাঁ সাঁ শব্দ থেমে গেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আলখাল্লা, হাল্কা হাওয়ায় তার কোণগুলি পৎ পৎ করতে থাকল। ফাউস্ট তার একটা ধার ধরে ঝুঁকে পড়ে তাকালেন নিচের দিকে। একটা কঠোর বিদ্রূপ ঠোঁটে ঝুলিয়ে শয়তান দেখছিল তাঁকে। হঠাৎ বাজি পোড়ানো শুরু হল। একঝাঁক বাজি ছড়িয়ে পড়ল আকাশে—সোনালি ঝরনায়, রঙিন তারায়, কমলা-রং শিখায় আর রূপালি সর্পিল রেখায় রেখায় ছেয়ে গেল আকাশ।

—নিশ্চয় একটা মস্ত মাইফেল হচ্ছে ওখানে, ফাউস্ট উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আমি আরও নিচে নেমে যেতে চাই, আমি আরও কাছে থেকে উৎসব দেখতে চাই! অতি দ্রুত অথচ এতটুকু না দুলে আলখাল্লাটা নিচে নামতে থাকল, যখন জনতার নাচগান ও প্রত্যেকটি মানুষের মুখ তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন তখন থামল আলখাল্লা। যেখান থেকে বাজি পোড়ানো হচ্ছিল আর যেখানে মশালগুলি জ্বলছিল দাউ দাউ করে মাইফেলের সেই কেন্দ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন ফাউস্ট। নাচ-গান তখন খুব জমে উঠেছে। আনন্দমুখর জনতার স্বর ও সঙ্গীত থেকে থেকে ভেসে আসছিল ফাউস্টের কানে।

শয়তান তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিল। সে তার দু' হাত উঁচু করে তুলল অমনি তার মাঝখানে এসে হাজির হল ফাউস্টের পড়ার ঘরের সেই বালু-ঘড়ি। দেখা গেল বালু-ঘড়ির প্রায় অর্ধেকটা বালিই নিচের অংশে ঝরে পড়েছে। জিভে আর তালুতে একটা তৃপ্তির শব্দ করে শয়তান ঘড়িটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিলে সেটা ভাসতে ভাসতে আবার বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফাউস্ট তন্ময় হয়ে দেখছিলেন। পরম আড়ম্বরে সাজানো জমকালো এক বিরাট প্রাসাদের বিশাল চত্বরে জমে উঠেছে উৎসব।

ফাউস্ট শয়তানের দিকে তাকালেন, ব্যাপারটা কী, এত নাচ গান হৈ-চৈ উচ্ছ্বাস বাজি পোড়ানো কার জন্যে—?

শয়তান হেঁট হয়ে ফাউস্টের কাঁধে হাত রাখল, বলল, আজ পারমার রাজকন্যার বিয়ে।—ইতালির সবচেয়ে রূপসী গরবিণী যুবতী পারমা।

—রাজকুমারী পারমার নাম কেনা শুনেছে, সারা য়োরোপ জুড়ে তার রূপের খ্যাতি। ফাউস্ট উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, আমি এই রূপসীকে দেখব।

শয়তান ফাউস্টের আরও কাছে এলেন, তাঁকে দু'হাতে জাপটে ধরে কানে কানে বললেন—মৃদু অথচ পরিষ্কার শোনা গেল তার স্বর—আজ রাতে সে তোমার হবে ফাউস্ট।

৯

রাত্রি নেমেছে। দিনের শেষ আলোটুকু গ্রাস করে গাঢ় হয়ে উঠেছে অন্ধকার। সে যেন কেবল এই আতসবাজির বর্ণালি রোশনাইকে আরও নয়নাভিরাম করে তোলার জন্যে। কালো ভেলভেট-নরম অন্ধকারের পটভূমিতে আলোর মালায় সাজানো পারমার রাজপ্রাসাদটিকেও দেখাচ্ছে অলৌকিক যেন একটা দুগ্ধফেন শুভ্র আতসবাজি ফেটে অজস্র শ্বেত বুদ্‌বুদ্ হয়ে প্রাসাদের গায়ে লেপ্‌টে থেকে কাঁপছে থরথরিয়ে।

গ্রীসীয় স্থাপত্য রীতিতে প্রস্তুত তনু স্তম্ভ ও অর্ধগোলাকৃতি খিলানে কারুকৃত বিশাল প্রাঙ্গণটির বর্ণাঢ্য শিল্পকর্মে মনোরম সূক্ষ্ম পর্দার আবরণ এখন গুটিয়ে রাখা হয়েছে। বহু জনসমাগমে ও গ্রীষ্মের উত্তাপে উষ্ণ প্রাঙ্গণটিতে সন্ধ্যার শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে অল্প অল্প। সুরা-তৃপ্ত অতিথি নারী ও পুরুষরা তারাতপ আকাশের নিচে আলোর মালায় উজ্জ্বল চত্বরে নাচে গানে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। খিলান থেকে রুপোর দড়িতে ঝুলোনো প্রদীপগুলিতে পুড়ছে গন্ধ তেল। মৃদু বাতাসে প্রদীপগুলি আস্তে আস্তে দুলছে আর গন্ধ তেলের সুরভি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

প্রাসাদের দূর প্রান্তে ব্রোঞ্জের চারিটি নৃত্যপর রতিমূর্তির উল্লম্বমুখ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিচে গোলাপী পাথরের বৃত্তাকৃতি বিস্তৃত জলাধারে বৃষ্টিধারার মতন ঝরছে সুরভিত জলের ফোয়ারা। সমকেন্দ্রাভিমুখ সে ফোয়ারা মাথার ওপারের আকাশে রচনা করেছে উপুড় করে রাখা পাত্রের মতন এক চন্দ্রাতপ। নিচের জলাধারের তলায় সাজানো সোনালি আলোর রোশনাই তাকে দিয়েছে চোখ ধাঁধানো এক মায়াবী রূপ, বিস্মিত দর্শক দেখছে, যেন জলকণা নয়, আকাশ থেকে অজস্র সহস্র ধারায় নিরন্তর ঝরে পড়ছে লক্ষ কোটি দিব্যজ্যোতি পুষ্পরাগ মণি।

সেই ফোয়ারার মুখোমুখি প্রাঙ্গণের বিপরীত প্রান্তে একটি অনতি উচ্চ প্রশস্ত দরদালান। সেখান থেকে সবুজ আঙুরলতায় ঘেরা মর্মর সোপান হয়ে চলে গেছে প্রাসাদে প্রবেশের অলিন্দ। তারই প্রান্তে বুঁটিদার রেশমী পর্দায় ঘেরা একটি সুদৃশ্য বেদী। সেই বেদীর কোমল গদীর ওপরে রেশমী চাঁদোয়ার নিচে অবসর বিনোদন করছেন পারমার রাজকুমারী।

ঘণ্টা তিন হল বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। রাজকুমারীর দিকে দুই মদির আধবোজা চোখ পেতে পায়ের তলায় শুয়ে আছেন তাঁর স্বামী। ফ্লোরেনসের এই পুরুষটির দেহ যেমন সুগঠিত তেমনি শক্ত। গায়ের রং কালো, অনুজ্জ্বল। চুল গোঁফের রংও ঘন কৃষ্ণ। আবেগপ্রবণ মানুষটির এই রং তাঁর ছায়ানিবিড় চোখের সঙ্গে দারুন মানানসই। খুব সম্ভব মানুষটির অতুলনীয় শক্তি এবং সুঠাম শরীর তদুপরি অসিযোদ্ধা হিসাবে তাঁর বিপুল খ্যাতিই রাজকন্যাকে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর দিকে। সেটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না, কেননা গোটা ইতালিতে তাঁর বুদ্ধি ও রূপের প্রশস্তির অবধি ছিল না, সুতরাং অবধি ছিল না পাণিপ্রার্থীরও— য়োরোপের হেন দেশ ছিল না যেখান থেকে কোন পুরুষ আসেনি তাঁকে প্রার্থনা করতে।

স্বামীর মাথা রাজকন্যার কোলে। কন্যা স্বপ্নমগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে আর আস্তে আস্তে তাঁর চুলের মধ্যে বিলি কাটছেন। রাজকন্যাও কালো। কিন্তু সে কালো রূপে রয়েছে অপরূপ এক রহস্য, সে যেমন নিঃশব্দে নিকটে টানে তেমনি নিষ্ঠুরভাবে দূরেও ঠেলে দেয়; রাজকন্যার মধ্যে আসলে রয়েছে এক ধরণের নির্লিপ্ততা যা ঔদ্ধতের মতনই মনে হয়। রাজকন্যার মাথায় পুঞ্জ পুঞ্জ ঘনকৃষ্ণ চুল, মাথা ঈষৎ নড়লেই সে-চুল থেকে হালকা নীলের একমৃদু আভা ঝিকিয়ে ওঠে। তারই নিচে উপবৃত্তাকার একখানি মুখ, মুখের কোমল ত্বকে কচি জলপাই পাতার লাবণ্য; কিন্তু চোখ দুটিতেই বস্তুত যত বৈশিষ্ট্য তাঁর। যার দিকে তাকান সে-ই বন্দী হয়ে যায়, মুগ্ধ হয়ে থাকে এমনই রহস্যময় সে-চোখ, এমনই বাসনার দীপ্তি সেখানে; অথচ সে মোহিনী দৃষ্টিতে এমনই এক ঔদ্ধত্য আর সংযমের শাসন যে অতিবড় দুঃসাহসীও প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। তাই ফ্লোরেন্সের ভাগ্যবান মানুষটির প্রতি অতিথি পুরুষদের ঈর্ষার অবধি ছিল না। ঈর্ষার অবধি ছিল না উপস্থিত যুবতীদেরও; রাজকন্যার সহজাত লাবণ্য আর পুরুষ-ভোলানোর অনায়াস শক্তিকে তারা হিংসে করত সবাই।

রাজকন্যার সেই অহংকার আর তাঁর খামখেয়ালি মেজাজ অবশেষে হার

মেনেছে, এই প্রথম ভালবাসার জালে বন্দী হয়েছেন তিনি। এতকাল তিনি কেবল বাসনা-বিহ্বল পুরুষদের নিয়ে খেলা করেছেন। আস্তে আস্তে মোহের জাল ছড়িয়ে দিয়েছেন তারপর প্রতারিত মানুষটি যখন নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে সেই জালে, জালে পড়ে প্রাণপণ ছটফট করেছে নিস্পৃহ গবেষকের মতন নির্লিপ্ত থেকে দূরে বসে সেই মজা উপভোগ করেছেন তিনি। একজনকে নিয়ে সেই খেলা এইভাবে যখন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে তখন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আর একজনকে নিয়ে আর এক খেলায় মেতেছেন। এই নিষ্ঠুর খেলাই ছিল তার ব্যসন এতকাল, শেষমেশ এই ফ্লোরেন্সের মানুষটি……

—প্রিয়, স্বামীর বুকে নত হয়ে নিঃশ্বাসের স্বরে উচ্চারণ করলেন রাজকন্যা, তুমি না তাকাচ্ছ আমার নর্তকীদের দিকে, না অন্যকোন অভিরাম দৃশ্যের দিকে অথচ আমার প্রভুর চোখের তৃপ্তির জন্যে আমি সযত্নে কত কিছুরই না আয়োজন করেছি।

—চোখ হৃদয়েরই পরিচয় দেয়, উত্তর দিলেন পুরুষ, পরম শ্রদ্ধায় তাঁর হাতখানি হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন, বললেন, আজ থেকে চিরকালের জন্যে আমার হৃদয় তোমার হল. একে তুমি উষ্ণ রেখো, আমিও তোমার হৃদয় উষ্ণ রাখতে চেষ্টা করব প্রাণপণ।

নরম নম্র অবনত রাজকন্যা তাঁকে গভীর মমতায় আদর করতে থাকলেন, সে সঙ্গে তাঁর অকপট হৃদয়ের প্রতিজ্ঞা সত্যার্মথিত করে উচ্চারিত হতে থাকল নিঃশ্বাসের স্বরে। হায়, তিনি কি জানতেন এত তাড়াতাড়ি সে-প্রতিজ্ঞা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে তাঁর।

প্রাঙ্গণে তখন আনন্দোৎসব জমজমাট। আসব-দেবতা বাক্থাই-এর দেবদাসীরা নাচছে। নাচে যোগ দিয়েছে প্রায় পঞ্চাশটি তরুণী। তাদের পরনে, সূক্ষ্ম রেশমের প্রাচীন গ্রীসীয় ঢলঢলে পোশাক। তারা সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে দুলছে, সার বেঁধে নাচতে নাচতে হঠাৎ হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে যাচ্ছে আবার হাত ছেড়ে দিয়ে আপন পায়ের ওপরে ঘুরছে। ঘাগরা ফুলে ফেঁপে তাদের জানুজঘনের লাবণ্য মেলে ধরছে দর্শকের তৃষিত চোখের সামনে। নাচের তালে তালে বাজছে বীণা, উঠছে ঐকতান-সঙ্গীত, বিচিত্র ভঙ্গিতে লীলায়িত হয়ে উঠছে নৃত্যপরা রমণীদের অসম্বৃত রূপ। দেয়ালের গায়ে গায়ে ফুলকাটা রেশমী চাঁদোয়ার নিচে সারি সারি আরাম-কেদারায় বসে অতিথিরা অপলক চোখে উপভোগ করছে নাচ।

সহসা সে-উৎসবে বাধা পড়ল। ফোয়ারার সামনেকার রুদ্ধদ্বার দেউড়ির বিশাল পাল্লাটো দু'পাশে সরে গেল। উন্মুক্ত দেউড়ির সামনে জনতার জলদগম্ভীর কোলাহল চকিত করল সকলকে। একটি সোনালি-চুল-বালক-ভৃত্য উঠোন পেরিয়ে সবুজ পাথরের সিঁড়ি টপকে একেবারে রাজকুমারীর সামনে এসে পড়ল। একহাঁটু মুড়ে তাকে অভিবাদন করতে বিরক্ত রাজকুমারী ভ্রু কুঁচকালেন।

—কী ব্যাপার!

—আগন্তুক, অনাহূতের দল পূর্বদেশের লোক!

একদল অবাঞ্ছিত মানুষের মুখোমুখি হয়ে বিস্মিত বিভ্রান্ত সে প্রাণপণে ছুটে এসে এখন হাঁপাচ্ছিল।

দাঁড়িয়ে উঠে উদ্ধত গম্ভীর স্বরে শুধোলেন রাজকন্যা—কে সিংহদ্বার খুলে দিয়েছে? বাইরে আর কোন নিমন্ত্রিত অতিথি নেই। অনাহূত যারা আসতে চাইছে আমার আদেশের অপেক্ষা করতে বল তাদের। তুমি যাও। আমি যতক্ষণ না তাদের পরিচয় পাচ্ছি তারা এখানে যেন না ঢুকতে পায়।

কিন্তু রাজকুমারীর আদেশ ঘোষিত হতে না হতেই সিংহদ্বারের রক্ষীরা একপাশে ছিটকে পড়েছে, উন্মুক্ত দ্বার-পথে ঢুকে পড়েছে এক বিস্ময়কর শোভাযাত্রা। অতুল ঐশ্বর্য আর বিপুল আড়ম্বরের সেই দৃশ্য দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেছে সকলের চোখ। তার বর্ণাঢ্য আলোর মালার [illegible] জ্যোতি চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে সকলের। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের এতক্ষণকার উজ্জ্বল আলোর রোশনাই এই শোভাযাত্রার আলোর প্রখরতার তলায় চাপা পড়ে ক্ষীণ প্রদীপ শিখার মতন টিম্‌টিম্‌ করছে। অতিথিদের চোখের সামনে যেন ইন্দ্রজাল রচনা করেছে কেউ, তাদের বিস্মিত অভিভূত করে দিয়েছে। তারা আচ্ছন্ন চোখের সামনে যেন দেখছে আকাশ জোড়া লক্ষকোটি জ্যোতির্ময় চুণী-পান্নার সমারোহ।

শোভাযাত্রাটি ধীরে ধীরে সিংহদ্বার পেরিয়ে প্রবেশ করল প্রাঙ্গণে। যারা নাচছিল তারা যে যেখানে যেমন ছিল বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অভ্যাগত রাজপুরুষেরা তাদের আসনে মূর্ছাহতের মতন অপলক তাকিয়ে আছে শোভাযাত্রার দিকে। উদার ব্যয়-বাহুল্যে রচিত পারমার রাজকুমারীর উৎসবে উৎকীর্ণ অভিরাম দৃশ্য, দীপ্যমান আলো ও রাজকীয় ঐশ্বর্যের জাঁক-জমকে অভ্যস্ত মানুষগুলিও অবাক হয়ে গেছে: সৌন্দর্য ও সম্পদের এমন চোখ-ঝলসান দৃশ্য আর কখনো চোখে পড়েনি তাদের।

কিন্তু সব বিস্ময়কেই বুঝি অভিভূত করে দিয়েছে দুটি বিশাল শরীর শ্বেতহস্তী। রাজোচিত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে তারা। তাদের গর্বিত গমনভঙ্গির সঙ্গে আত্মস্থ মহিমায় আন্দোলিত হচ্ছে শুঁড়। তাদের শুভ্রদন্তে সোনার জরি জড়ানো, মাথায় রেশমের সূক্ষ্মকারুখচিত আচ্ছাদন তার ওপরে সোনার শিরস্ত্রাণ, গলায় ঝুলছে রুপোর ঘন্টি। তাদের রাজকীয় গমনভঙ্গিতে আন্দোলিত সে ঘন্টি অপূর্ব ছন্দে বাজছে মৃদু-মন্দ। হস্তী দুটির দু' পাশে শ্রেণীবদ্ধ ভৃত্যের দল শ্লথগতিতে এগুচ্ছে। তাদের হাত দুটো বুকের ওপর রাখা। এই বিচিত্র শোভাযাত্রার সব আগে একজন যোদ্ধা। তার হাতে একখানা খোলা তলোয়ার। প্রখর আলোয় ভাস্বর সে তলোয়ার হিংস্র ক্ষুধায় জ্বল জ্বল করছিল। প্রাচ্যের পোশাকে সজ্জিত সৈনিকটিরও আপাদমস্তক ব্যক্ত করছিল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির দুর্জয় কাঠিন্য।

কিন্তু সব ছেড়ে হাতি দুটিতেই নিবদ্ধ হয়েছিল সকলের চোখ। হাতি দুটির মাঝখানে বহুমূল্য ভূষণে শোভিত প্রাচ্যের সুকুমার মখমলে মোড়া একটি রাজাসন। আসনে একজন সুদর্শন যুবক। উপবিষ্ট যুবকের পরিধানে প্রাচ্যের রাজবেশ, যদিও তাঁর দেহের গঠন ও ত্বকের বর্ণ দেখে তাঁকে য়োরোপীয় বলেই মনে হচ্ছিল সকলের। তাঁর ভঙ্গিতে ঔদ্ধত্য ও দৃষ্টিতে রাজকীয় অবজ্ঞা। তাঁকে বেষ্টন করে আছে এক অলৌকিক জ্যোতির আবরণ তাতে করে তাঁর উদ্ধত ভঙ্গি ও অবজ্ঞা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে স্পষ্ট করে তুলেছে এক অপরূপ রূপকথার পরিবেশ।

শোভাযাত্রাটি ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ পার হয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ির সামনে এসে থামল। হাতি দুটি শুঁড় শূন্যে তুলে বৃংহণ করে অভিবাদন জানাল রাজকুমারীকে।

রাজকুমারী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আগন্তুকদের এই উদ্ধত অনধিকার প্রবেশ রাজকুমারীকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করেছিল কিন্তু এখন এই রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে সে ক্রোধ অপরিসীম বিস্ময়ে রূপান্তরিত হয়েছে। তার স্বামী তার হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে সেও এই জাদুকরী দৃশ্যের মধ্যে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছে তখন। যে-সব প্রাসাদরক্ষী আগন্তুকদের বাধা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল তাদেরও স্তব্ধ করে দিয়েছিল এই রহস্যময় আগন্তুক, তাঁর বহুমূল্য পরিচ্ছদ, রাজকীয় গাম্ভীর্য ও অনুগামীদের পোশাক-আশাক এবং তাদের মুখের নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি। দু'জন অনুচর সিঁড়ির দু'পাশ থেকে উঠে এল রাজকুমারীর

সামনে। একজন তার পায়ের কাছে রাখল অসামান্য নিপুণতায় তৈরি সোনা ও রূপোর নানা আকারের পাত্রে শাল উড়ুনী ও বিচিত্র বর্ণের বহুবিধ পোশাক; আর একজন বিবিধ মণিমুক্তামণ্ডিত একটা হাতির দাঁতের বাক্স রেখে তার ডালাটা খুলে দিতেই চারদিককার জ্যোতির্ময় শুভ্র আলোতে ঝলমলিয়ে উঠল ভিতরকার দুর্লভ মাণিক্যখচিত সব অলংকার।

বিভ্রান্ত রাজকুমারী আত্মসম্বরণ করতে প্রাণপণ লড়ছিলেন। তাঁর চোখ দুটোকে মনে হচ্ছিল, শিকারী ময়ালের দৃষ্টির টানে স্তম্ভিত পাখির চোখের মতন। তাঁর দৃষ্টি প্রাচ্যের রাজপুত্রের দিকে অপলক নিবদ্ধ। এমন একটি পুরুষই বুঝি ছিল তার জীবনের স্বপ্ন আত্মার কামনা। এমন একটি পুরুষই বুঝি আচ্ছন্ন করেছিল তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, এমন একটি পুরুষেরই পথ চেয়েই বুঝি তিনি অপেক্ষায় ছিলেন এতকাল।

অনেক চেষ্টার পর রাজকুমারী কথা বলতে পারলেন এতক্ষণে; কিন্তু তাঁর স্বর কেঁপে গেল, কণ্ঠ নিচু ও উচ্চারণ শ্লথ হল, বললেন—কে তুমি, কেন এখানে এসেছ, আমার কাছে তোমার কী দরকার?

ফাউস্ট, সেই ফাউস্ট, শয়তানের নিপুণ কৌশলে পরম ঐশ্বর্যবান তিনি কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু মুখের ভাষার চেয়েও মুখর ও অনেক বেশী অর্থবহ চোখের ভাষা উত্তর দিল। তিনি পারমার রাজকুমারীর নিখিল-নন্দিত রূপের খ্যাতি শুনেছেন, শয়তান সেই বিশ্ব-সুন্দরীকে তার বাহুলগ্না করে দেবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অথচ সে-রূপসীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন তাঁর মনে হল এ অপরূপা তাঁর দুর্লভ সিদ্ধিরও অতীত পরম আকাঙ্ক্ষার অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। কিন্তু দু'জনই দু'জনের পানে তাকিয়ে অপলক। যেন এক অমোঘ আকর্ষণ একসূত্রে বেঁধে ফেলেছে দু'জনকে।

দু'জনের সেই মুগ্ধতার অবসরে নিঃশব্দে রাজকুমারীর আসনের পেছন থেকে একটি অবয়বের আবির্ভাব ঘটল। কালো পোশাকের এক শক্তিশালী পুরুষ এসে পাশে দাঁড়াল রাজকুমারীর। দেহ তার একটা মস্ত ঢিলেঢালা আলখাল্লায় ঢাকা। ওপর দিকে বাঁকানো ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ চোখ, উষ্ণীষের পেছনে প্রলম্বিত তার দীর্ঘ লাল পাখির পালক। কেউ তাকে এখানে ঢুকতে দেখেনি, সে যে কোথা থেকে কেমন করে এল কেউ জানে না। রাজকুমারীকে অভিবাদন করে বিনীত কণ্ঠে সে বলল, নিখিল বিশ্বের পরমা সুন্দরীকে উপহার দেওয়ার জন্যে আমার প্রভু তাঁর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নিয়ে এসেছেন, আপনি গ্রহণ করুন।

রাজকুমারী তার কথায় কান দিল না, বুঝি কানেই গেল না তার কথা। সে তাকিয়েই ছিল ফাউস্টের দিকে, তাকিয়েই থাকল—তার চোখ বিস্ফারিত অধরোষ্ঠ ঈষৎ উন্মীলিত মনে হল যেন সে মন্ত্রাবিষ্ট হয়ে গেছে। ফাউস্টও তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তারও চোখে উদগ্র আগ্রহ, যৌবনের অসহ্য কামনা শিখার মত জ্বলছে সেখানে। এবার তিনি তার রাজাসন ছেড়ে তড়িৎ সুন্দর ভঙ্গিতে দ্রুত নেমে এলেন। সে গতি তাঁর যৌবনের অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত অমিত শক্তির পুঞ্জ উন্মোচিত করল, উদ্ভিন্ন হল প্রাণ-প্রাচুর্যের দিব্য বিভা, হৃদয়ের নবীন কোমল যৌবন-মাধুর্য প্রকাশিত হল। তার দৃষ্টিতে টলটল করছে নিষ্পাপ মনের নির্মল আলো, মুখে জ্বলজ্বল করছে ভয়লেশহীন ঔদ্ধত্য—যৌবনের স্বপ্নে মগ্ন তিনি মোহময় হয়ে উঠেছেন। পেছনে তাকিয়ে তিনি তাঁর আদেশের অপেক্ষায় স্থির অনুচরদের ইঙ্গিত করলেন। তারা এগিয়ে এল, বয়ে নিয়ে এল স্বর্ণখচিত একটি অপরূপ পদ্ম। পদ্মটি দু'হাতের মধ্যে ধরে প্রধান অনুচর মাথা নত করে এসে দাঁড়াল ফাউস্টের সামনে। পুনরায় ইঙ্গিত করতে সে ধীর পায় এগিয়ে যেতে থাকল রাজকুমারীর দিকে। ফাউস্ট তার পেছনে পেছনে এগোতে থাকলেন। পদ্ম থেকে এক অদ্ভুত গোলাপী আলো এসে পড়ছে অনুচরটির মুখে। সেই আলোহিত নরম বিদ্যুৎ-বিভা ক্রমশ মেদুর হয়ে আসছে আবার আস্তে আস্তে আপন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে যেন এক অলৌকিক প্রক্রিয়া চলছে তার ভিতরে। রাজকুমারীর সামনে এসে অনুচরটি একপাশে সরে দাঁড়াল। ফাউস্টও থামলেন। দুটি পরম উৎসুক চোখ মেলে দেখতে থাকলেন তার অপরূপাকে।

ফাউস্ট তাঁর অনুচরের দিকে হাত বাড়ালেন। ভৃত্য তার হাতের স্বর্ণপদ্ম সযত্নে তুলে দিল ফাউস্টের হাতে। ফাউস্ট মাথা নত করে রাজকুমারীর সামনে ধরলেন পদ্মটি। বললেন—এ আমার সাধ্যের সুন্দরতম উপহার, এ উপহারের যোগ্য একমাত্র তুমিই। যৌবনের নিটোল কণ্ঠের সেই বিনম্র ভাষা ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা রাজকুমারীকে নতুন করে আবার পুলকিত অভিভূত করে দিল।

ফাউস্টের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মটি স্বতঃই তার কোরক বিস্তার করল, অপাবৃত করল অভ্যন্তরকার এক জ্যোতির্ময় পদ্মরাগ মণি। মানুষের হাতের মুঠোর মতন মস্ত সেই পদ্মরাগ মণি-শিল্পের এমনই দক্ষ কারুতায় উৎকীর্ণ যে তার ভিতরকার বহু কৌণিক প্রান্ত থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতন ক্রমাগত বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ অন্ধ করে দেওয়া উজ্জ্বলন্ত এক রক্তবর্ণ জ্যোতি ; সে আপনা থেকেই

কখন প্রোজ্জ্বল কখনো নিষ্প্রভ হচ্ছে—মনে হচ্ছে নরকের অপদেবার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলজ্বলিয়ে উঠছে সে। উপস্থিত মানুষদের ওপরে তার প্রভাব দেখে মনে হয় মণিটির মধ্যে কোন অপার্থিব বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। রাজকুমারীর স্বামী, বালক-ভৃত্য, পার্শ্বচর যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে যেন কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধ হয়ে গেছে তারা—মনে হল নিঃশব্দে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে তার মধ্যে, তারই বিদীর্ণ আলো দারুণ আঘাত করেছে সকলের চোখে। দু'হাতের চেটোয় চোখ ঢেকেছে কেউ, কেউ বাহুর ভাঁজে মুখ গুঁজেছে, কেউ হঠাৎ আলোর ধাক্কা সামলাতে পেছনে হটে গেছে—বিহ্বলতা মূর্তির মতন কাঠ করে ফেলেছে সকলকে।

কিন্তু রাজকুমারী না। তিনি বিহ্বল হয়নি। হঠাৎ অনাবৃত পদ্মরাগ মণির প্রখর দীপ্তি দিশাহারা করতে পারেনি তাঁকে। বরং মনে হল তাঁর স্বভাবের অন্তঃসারে মগ্ন কোন চৈতন্য যেন সে আলোর স্পর্শে জেগে উঠল, সাড়া দিল। যে আলোর প্রভাবে অবশ হয়ে গেছে তাঁর স্বামীর শরীর তারই প্রবল শক্তি অভিভূত করে দিয়েছে যেন তাঁর নিজের অন্তরের আত্মসম্বরণের সামর্থ্য ; তিনি আলোর টানে অসহায়ের মতন আনত হয়ে পড়লেন। ফাউস্ট তৎক্ষণাৎ পদ্মকোরকগুলিকে সংবৃত করে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজকুমারীর দিকে। রাজকুমারী ফাউস্টের চোখে চোখ রাখলেন। সে চোখে নক্ষত্রের মতন দপ্‌দপ্‌ করছিল কামনা, ভেজা আকাশের মত ছল্‌ছল্‌ করছিল শরণাগতি, ভক্তিতে ভেঙে পড়ছিলেন যেন তিনি। তাঁর পায়ে বল ছিল না, শ্লথ পায় কোনমতে ফাউস্টের দিকে এগিয়ে আসছিলেন তিনি, একটা স্নায়বিক উচ্ছ্বাস কান্না হয়ে ভেঙে পড়ল তাঁর মধ্যে, তিনি দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন, ফাউস্ট টেনে নিলেন তাঁকে বুকের মধ্যে। প্রিয়তম, আবেগ ভরাট গলায় বলে উঠলেন ফাউস্ট, তোমার সুন্দরতার খ্যাতি সুদূর প্রাচ্যে আমার কানে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে। আমি শুনেছি কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস পাইনি। গোটা পৃথিবীতে তোমার তুলনা নেই। অতুলনীয়া, আমার ভালবাসার দাবি, তুমি আমার সঙ্গে এস।

আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি, রাজকুমারীর চোখ বড় হয়ে উঠেছে তাঁর চোখের মণি জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্রের মতন, তিনি নিঃশ্বাসের স্বরে বলে উঠলেন, আমি তোমার কণ্ঠ শুনেছি স্বপ্নে, তোমার শক্তির তোমার যৌবনের তোমার কামনার স্পর্শ পেয়েছি সেই কণ্ঠে। ওগো, আমি তোমারই জন্যে জন্মেছি, আমি তোমার, ওগো আমার প্রভু, আমি একান্তই তোমার, চিরকালের জন্যে তোমার,

তুমি আমাকে নাও।

তাঁদের ঠোঁটে ঠোঁট মিলল এসে। পরম আসক্তির আবেগে অস্থির দুজনে ওষ্ঠলগ্ন হলেন। কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই ঘুরে দাঁড়ালেন ফাউস্ট। তাঁর বললব্ধ পুরস্কার আলতো হাতে বুকে টেনে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। উঠে বসলেন হাতির পিঠে। হাতিগুলি সমস্বরে বৃংহণ করতে লাগল যেন জয়ধ্বনি করছে। আবার প্রাঙ্গণ পার হয়ে ফিরে চলল মিছিল, সিংহদ্বার পেরিয়ে গেলে ভীত সন্ত্রস্ত অতিথিরা সন্তর্পণে ছায়ার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে চুপি চুপি দরদালানের দিকে এগোতে থাকল। যারা দালানে ছিল তারা চোখ মেলল, যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। গা ঝাড়া দিয়ে চারদিকে তাকালেন রাজকুমারীর স্বামী। অকস্মাৎ সমস্ত ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। তিনি শূন্য বেদীর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হয়ে চোখ ফেরাতে যাবেন চোখাচোখি হয়ে গেল শয়তানের সঙ্গে। তার কটাক্ষে বিদ্রূপ, সে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

ক্রোধে ক্ষোভে দুঃখে একটা মর্মান্তিক গর্জন করে উঠলেন প্রবঞ্চিত পুরুষ। তাঁর সর্বস্বাপহরণের মূল বলেই মনে হল মানুষটাকে। মুহূর্তে কোষ মুক্ত করলেন তরবারি; একটি ক্ষিপ্র চিতার মতন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার বুকে। পলকে সেখানে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল নিপুণ যোদ্ধার তীক্ষ্ণধার ইস্পাত ফলক। ছিন্নমূল বৃক্ষের মতন সশব্দে শয়তান পড়ে গেল মাটিতে। তার পতনের বত্যাঘাতে দীপশিখা দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল। সে দৃশ্যের সামনে অবশ হয়ে গেল উপস্থিত সকলে। চারধারে একটা নীরবতা, একটা থমথমে ভাব ছড়িয়ে পড়ল। সেই স্তব্ধ পরিবেশকে ঘোরতর বিভীষিকায় আচ্ছন্ন করে নিহত মানুষটার দেহ থেকে একটা ছায়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আকার পেতে থাকল। চক্ষের নিমেষে আগেকার জায়গায় আগেকার মানুষটাকে ভীষণ কৌতুকে হাসতে দেখল সকলে। তার পায়ের তলায় তখনও পড়ে আছে তার নিহত শরীর। নবকলেবর মানুষটা সেই নিহত শরীর থেকে আস্তে করে তরবারিখানা টেনে বের করল আর তেমনি ত্বরাহীন কঠিন শীতল ভঙ্গিতে তরবারিখানা মুঠোয় ধরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল ফ্লোরেনসের যোদ্ধার সামনে তারপর গোখরো যেমন করে ছোবল মারে নিমেষে তার বুকে আমূল বসিয়ে দিল তরবারিখানা। একটা ব্যাকুল আর্তনাদ করে রাজকুমারীর স্বামী লুটিয়ে পড়লেন মেঝেয়।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের সমস্ত বাতি নিভে গেল। প্রাঙ্গণ প্রাসাদ জুড়ে প্রচণ্ড বেগে বইতে লাগল নিদারুণ ঝড়ের বাতাস।

১০

সবে পূব আকাশে আলোর আভাস লেগেছে, রাত্রির কালো পর্দাটা সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সেই আলো-অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের মাথায় এক প্রাসাদ। প্রাসাদের মিনার চূড়ায় উষার আলোর আল্পনা। প্রাসাদের কক্ষগুলিতে তখনও অন্ধকার। কেবল একতলার বিশাল ভোজন-কক্ষের একটা জানালাতেই শুধু জ্বলছে একটি মশাল তার আলো এসে ঠিকরে পড়ছে বাইরে। ভিতরে একটি ডিভানের ওপরে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে আছেন এক প্রণয়ীযুগল—ফাউস্ট আর পারমার রাজকুমারী।

চোখের গভীরে চোখ রেখে রাজকুমারী বাতাসের স্বরে বললেন, আহ্, তুমি কী সুন্দর!

ফাউস্ট আবেগে আশ্লেষে রাজকুমারীকে চুমু খেয়ে বললেন, তুমি তোমার নিজের রূপেরই প্রতিবিম্ব দেখছ আমার মুখে, কেননা, তোমার রূপের সঙ্গে তুলনা করা যায় নিখিল ভুবনে তেমন আর একজনকে দেখিনি আমি কোনদিন।

কিন্তু তুমি, রাজকুমারী তাঁর কণ্ঠ লগ্ন হয়ে আবার বললেন, তুমি পরম রূপসীর চেয়েও রূপবান, আমি পুরুষের মধ্যে চেয়েছিলাম পৌরুষ শক্তি আর মেধার সমন্বয়, আমি যোদ্ধা রাজনীতিক, রাজকুমার আর মনীষীদের মধ্যে আমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খুঁজেছিলাম; কিন্তু আমি তোমার মধ্যে তাঁর চেয়েও বেশী অনেক বেশী পেয়েছি, আমার সাধনার সব ধন পেয়েছি তোমার মধ্যে, সর্বোপরি আমার আকাঙ্ক্ষার অতীত অভাবিত পেয়েছি নয়নাভিরাম তোমার রূপ।

আমার রূপের কথা বল না, বাধা দিলেন ফাউস্ট। মানুষের মনের মধ্যে তোমার রূপ চিরকালের জন্যে আঁকা হয়ে আছে, তারা যতকাল বাঁচবে তোমার রূপ ততকালের—তোমার রূপ দীর্ঘায়ু। কিন্তু আমার……, যেন অস্থির কোন তোলপাড় চলছে ভিতরে তারই তাড়নায় রুদ্ধশ্বাস হলেন তিনি অসমাপ্ত কথার মাঝখানে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বিষণ্ন হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

ফাউস্টের মধ্যে যে অলৌকিকতা রাজকুমারী তারই আকর্ষণে যেন মোহাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। ফাউস্টের দৃষ্টি, স্পর্শ তাঁর গলার স্বর রোমাঞ্চিত করছিল রাজকুমারীকে।

আমি তোমার জন্যে সব ছেড়ে এসেছি মুহূর্তের জন্যে ভাবিনি, বিচার করিনি, রাজকুমারী অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, আমার কোন ক্ষোভ নেই। অদৃষ্টে আমার যাই

থাকুক কোনদিন অনুশোচনা করব না আমি। তোমার অগাধ ঐশ্বর্য বিপুল প্রাসাদ কিন্তু এ সবে আমার লোভ নেই। ও-ত আমারও আছে। তোমার আরও আছে, আছে পরম পাণ্ডিত্য তার কিছু কিছু তোমার পুঁথিপত্রে আমি পড়েছি। তোমার আছে শক্তি স্বভাবে সৌষ্ঠব কিন্তু আমার জানা অনেক পুরুষের মধ্যেও তা আছে কিন্তু সব মিলিয়ে সর্বোপরি তোমার রূপ-লাবণ্য তোমার যৌবন আমার রক্তে ঢেউ তুলেছে, কাঁপছে দুলছে আমার বুক।

ফাউস্টের মুখে অন্যমনস্কতার ছায়া, তিনি যেন মাঝে মাঝে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছিলেন, রাজকুমারীর বড়বড় সরল দুটি চোখে নির্মল মুগ্ধতা দেখতে দেখতে এবার তিনি আঁৎকে উঠলেন, সরে বসলেন রাজকুমারীর কাছ থেকে। একটা নিষ্ঠুর স্মৃতির আঘাতে তাঁর মুখ ধূসর হয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর পড়ার ঘর, বালু-ঘড়ি। ঘড়িটা একেবারে তাঁর চোখের সামনে দৃষ্টির সমগ্র পরিধিটা জুড়ে এসে দাঁড়াল, তিনি দেখলেন, বালু-ঘড়ির উপরের অংশের সবটুকু বালিই প্রায় নিঃশেষিত, শয়তানের জাদু-উড়ুনি থেকে নেমে আসা থেকে রাতের এই অতিপ্রাকৃত অভিযান, পুরস্কাররূপে এই বিশ্ব-সুন্দরীর হৃদয় মন অধিকার রাজকুমারীর একটি কথায় নিষ্ফল মায়ায় মিলিয়ে গেল।

তাঁর রূপ যৌবনের প্রসঙ্গে ফিরে এল তাঁর স্মৃতি। বিভীষিকা ফুটে উঠল তাঁর চোখে—তার কাছেই কিনা যৌবনের কথা বলা হচ্ছে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যার দেহকে জড়িয়ে ধরবে জরা, উবে যাবে এই ঐন্দ্রজালিক যৌবন, জেগে উঠবে একটা কঙ্কাল—বিজ্ঞানে দর্শনে বীতরাগ হৃতাদর্শ একটা বীভৎস অতীত। জেগে উঠবে একটা মানুষ যার কোন আশা নেই ভরসা নেই, নেই কোন ভবিষ্যৎ —অন্তঃ অসার যে একটা মানুষের বিকৃত আকৃতি মাত্র। কিন্তু যাই ঘটুক একটা বিষয়ে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর অবধারিত নিয়তির নির্দিষ্ট সময়টি এসে যাবার আগেই তিনি তাঁর নিজের রক্তে স্বাক্ষরিত শর্তনামাটি শয়তানের কাছ থেকে যে করেই হোক উদ্ধার করে নেবেন।

ফাউস্ট উঠলেন, রাজকুমারীকে টেনে নিলেন কাছে, মশাল-দানী থেকে একটা মশাল তুলে নিয়ে বললেন, এসো। কোমর জড়িয়ে ধরে তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। মশালের আলোয় রাজকুমারীর কালো এলোচুল, সুডৌল কাঁধ, শাঁখের মতন সাদা সন্নিবদ্ধ স্তন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর মুখে সর্বাঙ্গমথিত বাসনার উচ্ছ্বাস, এক নিবিড় কামনায় তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, বুক ওঠানামা করছে দ্রুত। ফাউস্ট তাঁকে বুকে করে ওপরে উঠে গেলেন।

অতি যত্নে সাজানো সুন্দর শোবার ঘর, মস্ত পালঙ্কে দুধের ফেণার মতন নরম সুরভিত বিছানা। ঘরে ঢুকে ফাউস্ট দেওয়ালগিরিতে মশালটি রাখলেন তারপর সন্তর্পণে রাজকুমারীকে দাঁড় করিয়ে দিলেন মেঝেয়। দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এক সর্বাঙ্গ মথিত বাসনার আবেগে দু'জনেই কাঁপছিলেন, পলকে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন তাঁরা, দু'জন দু'জনকে নিবিড় করে ধরে রাখলেন বুকের মধ্যে—রাজকুমারীর ব্যাকুল যৌবন সর্বাঙ্গমথিত তৃপ্তির সুখে বুকের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, এইমাত্র তিনি পেয়েছেন এই অনাস্বাদিত অপার্থিব ভালবাসা, কোনদিন তিনি ভাবতে কি বিশ্বাস করতেও পারেন নি এমন ভালবাসাও আছে যা মানুষের সত্তা অবধি আর্দ্র আচ্ছন্ন মগ্ন করে দেয়। আর ফাউস্টের? তাঁর মধ্যে জ্বলছে তখন তাঁর মুমূর্ষু অপ্রাকৃত যৌবনের শেষ স্ফুলিঙ্গ—প্রবল শিখায় তৈলহীন প্রদীপ যেমন শেষবারের মতন দপ্ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। ভালবাসা এবং যৌবন থেকে জন্মের মতন শেষ বিদায় নেওয়ার আগে জীবনের শেষ সুখ নিংড়ে নেবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় পাগল তখন তিনি।

ধীরে ধীরে তাঁরা আলিঙ্গন মুক্ত হলেন। বেপথু রাজকুমারীর মাথা তাঁর বাহুতে। রাজকুমারীকে বহন করে পালঙ্কের কাছে এগিয়ে এলেন ফাউস্ট। রাজকুমারীর কামনা-অলস আধবোজা দুই চোখ ফাউস্টের মুখের ওপরে অপলক। ফাউস্টেরও তাই। দু'জনেই দু'জনের ভালবাসার মোহে অর্ধমূর্ছিত। যেন একটা অলৌকিক জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে তাদের সত্তার ভিতর দিয়ে। তারই উথাল-পাথাল ঢেউয়ে টালমাটাল হ'তে হ'তে তাঁরা এখন ক্লান্ত অবসন্ন।

ফাউস্ট হাত বাড়িয়ে পালঙ্কের সামনে ঝুলোনো বুটিদার রেশমী পর্দা সরিয়ে দিলেন—দিতে দিতে শুনলেন তাঁর কানের অতি নিকটে মৃদু অথচ সুস্পষ্ট একটি স্বর—ফাউস্ট!

স্বর নয় আদেশ। এ আদেশ অবহেলা করে সাধ্য নেই তাঁর। তিনি বাহুলীনা রাজকুমারীকে পালঙ্কে রেখে স্বর লক্ষ্য করে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ছুটলেন। হঠাৎ পাশের একটা ঘরের থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে তাঁর ডান হাতটা কঠিন মুঠোয় চেপে ধরল। তাঁর আত্মার জিম্মাদার টেনে নিয়ে গেল তাঁকে ঘরের ভেতরে। এক হাতে তার সেই বালু-ঘড়ি আর এক হাতে, যে হাতে সে ফাউস্টকে ধরে আছে, সেই বন্ধকী তমসুক আত্মা বন্ধক রাখার সেই নির্মম শর্তনামা—শয়তান বালু-ঘড়িটা ফাউস্টের চোখের সামনে তুলে ধরল—ওপরের অংশে তার একবিন্দু বালি নেই।

দেখ, শর্তনামাটি মেলে ধরল শয়তান, আমি আমার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। একটি দিনের জন্যে আমি তোমাকে যৌবন দান করেছিলাম। এক ভোর থেকে আর এক ভোর অবধি সসাগরা পৃথিবীর ওপরে তোমার অপরাজেয় আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। তোমার কোন সাধ আমি অপূর্ণ রাখিনি। এখন কি তুমি তোমার শর্তনামা ফিরিয়ে নেবে ফাউস্ট? মুখে তার বিদ্রূপের হাসি কিন্তু চোখে তখন জ্বলছে তার ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কুটিল-কঠিন আলো।

একদিন, আর মাত্র একটা দিন, আর্তনাদ করে বলে উঠলেন ফাউস্ট, আর একটা দিনের জন্যে আমাকে যৌবন মঞ্জুর কর তুমি।

না, একটি দিনের শর্ত—দিন ফুরিয়ে গেছে। যা ছিলে তাই হও তুমি। জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ হও আবার।

শয়তানের মুখ থেকে শেষ শব্দটি উচ্চারিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ছায়া-শরীর ভেসে উঠল ফাউস্টের সামনে—ফাউস্টের সেই পুরোনো শীর্ণ শরীর পাকা চুল পাকা দাড়ি বিষণ্ণ জীর্ণ একটি মুখ। সে মুখ সে অবয়ব পলকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল, করুণ চোখে তাকিয়ে থাকল তাঁর তরুণ সত্তার দিকে। আর সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় ফাউস্ট অনুভব করতে লাগলেন তাঁর শক্তি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে, তাঁর পা কাঁপছে, পা দুটো তার শরীরটাকে যেন আর বইতে পারছে না। হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন ফাউস্ট, কোনমতে দুর্বল হাত দুটো উর্ধ্বে তুলে অক্ষম গলায় চিৎকার করে উঠলেন—আমি নতুন করে যৌবন পেয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছি যৌবনহীন জীবনই মৃত্যু।

শয়তান কঠিন দৃষ্টিতে দেখছিল তাঁকে, কোন জবাব দিল না।

বুড়ো ফাউস্ট এখন আর ছায়া মাত্র নয়, তাঁর যৌবনের ঐন্দ্রজালিক খোলসটা খসে পড়ে গেছে। নিঃশেষে মিলিয়ে যাওয়ার আগে পায়ের কাছে পড়ে ধুঁকছে। ধুঁকতে ধুঁকতে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—যৌবন···আমাকে আমার যৌবন ফিরিয়ে দাও।

জয়ের অহংকারে শয়তানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, পলকের জন্যে তার চোখের মণি দুটো দপ্ দপ্ করে উঠল জ্বলন্ত কয়লার মতন।

তাই হোক, বলল সে, কিন্তু মনে রেখো বিনিময়ে তুমি চিরকালের জন্যে আমার কেনা হয়ে গেলে।

ফাউস্ট
দ্বিতীয় পর্ব

১১

পৃথিবীর এক গোপন কোণে এক সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গে, এক স্খলিত প্রস্তর-স্তূপের প্রান্তে চিন্তান্বিত ফাউস্ট অন্যমনস্ক বসে আছেন। পৃথিবীর এখানে প্রাণের স্পন্দন নেই, এখানে পাখি ডাকে না, মাটির ওপরে হামা দিয়ে চলে না ক্ষুদ্রতম একটি কীটও। দিবস-রজনীহীন এ এক ধূসর পৃথিবী। এখানে পৃথিবী থর্‌থর্ করে কাঁপছে। বিকৃত মূর্তি অতিকায় কোন জঘন্য সরীসৃপের গাত্রচর্মের মতন ধরাপৃষ্ঠ কখনো সঙ্কুচিত কখনো প্রসারিত হচ্ছে এবং তারই দুর্গন্ধ নিঃশ্বাসের মতন এখানে ওখানে বিদীর্ণ পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে বিষাক্ত বাষ্প। এটা শয়তানের আস্তানা। পৃথিবীতে তার অনেকগুলির একটি প্রিয় বাসস্থান।

হাঁটুর ওপরে কনুই, হাতের চেটোয় গাল, ফাউস্ট দূরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখ মলিন, দেহ ক্লান্ত, আজ তিনি প্রবীণ ফাউস্টের চেয়েও অনেক বেশী মোহমুক্ত। যে-জরাজীর্ণ দেহ থেকে যৌবনের শরীরে মুক্তি পেতে, অফুরন্ত শক্তির অধিকারী হতে, নিজের আত্মাকে দাসখতে আবদ্ধ করেছিলেন ফাউস্ট সে-যৌবনই আজ তাঁর কাছে অবান্তর হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে হতাশ করেছে তাঁকে বিস্ময়-বিয়োগ। পূর্বজীবনে অনাস্বাদিত যে-ভোগস্পৃহা তাঁকে পুনর্যৌবনের জন্যে কাঙাল করেছিল, যে অতিপ্রাকৃত শক্তি তাঁর সকল রকম ভোগস্পৃহাকে তৃপ্ত করেছে আজ পরিতৃপ্ত ফাউস্টের আর তার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। সে-শক্তি আজ আর তাঁকে না জ্ঞানে, না আবিষ্কারে, না আকস্মিকতায়—কিছুতেই বিস্মিত করতে পারে না। সে-শক্তির বিভূতি তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় অপাংক্তেয়, যে-ক্ষুধা তাঁকে আত্মবিক্রয়ে প্রলুব্ধ করেছিল, যে-শক্তি অর্জনের জন্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মাতাল, আজ সে-সব—সমস্তই

তাঁর গায়ের ধূলোর মত মলিন মূল্যহীন হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

শয়তান পেছনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল ফাউস্টকে।

সে ডাকল, ফাউস্ট তোমার মনে তৃপ্তি নেই কেন ?

বিষণ্ণ গলায় ফাউস্ট বললেন, আমি একটা কুহকের মোহে আমার আত্মা বেচে দিয়েছি তোমার কাছে।

—কি চাও তুমি ? আরও নারী আরও প্রণয়-প্রার্থিনী চাও, রতিবিলাসে ডুবে যেতে, ডুবে থাকতে চাও তুমি, চাও মদমোত্ত চিত্ত ভুলানো রাত্রি, সুরা এবং সাকী ? বল, কী তোমার আদেশ ? আমি তোমার ইচ্ছা পুরণের জন্যে অপেক্ষা করছি।

ফাউস্ট একটু নড়ে উঠলেন কিন্তু জবাব দিলেন না, মুখও ফেরালেন না। যেমন ছিলেন, দূরের দিকে চোখ পেতে তেমনি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন।

শয়তান শুধোলো, তবে কি তুমি মানুষের ভাগ্যবিধাতা হতে চাও ? যে শক্তির অধিকারী হতে চাও তুমি তাই তোমাকে দেওয়া হবে, এমন কি যদি সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বর হতে চাও, তাও। দেখ, মুহূর্তে শয়তানের হাতে মণিমাণিক্যখচিত এক গুরুভার বৃহদায়তন রাজমুকুট আবির্ভূত হল। তুমি কি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাও, সম্রাট হতে চাও তুমি ?

ফাউস্ট এতটুকু নড়লেন না, জবাব পর্যন্ত দিলেন না।

তাহলে তোমার মনে আর লেশমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই ? তোমার সব আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ঘটেছে, বল ?

ফাউস্ট এতক্ষণে তাঁর মুখ ফেরালেন, বিষণ্ণ চোখ শয়তানের দিকে তুলে বললেন, একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট আছে আমার। সে আমাকে অনুক্ষণ ছায়ার মতন অনুসরণ করে, আমি তাকে নির্মমভাবে নির্বাসন দিয়ে বাসনার পঙ্কিল নরকে আকণ্ঠ ডুবে গেছি, তবু তাকে ভুলে যাইনি, ভুলতে পারিনি।

শয়তানেয় ভ্রূ জিজ্ঞাসায় তির্যক হয়ে উঠল, কী সে আকাঙ্ক্ষা তোমার, যা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছ না ?

আশ্রয়। নিষ্পাপতা।

নিষ্পাপ কখনো তুমি হতে পারবে না ফাউস্ট, তোমার আত্মা এখন আমার।

আমি আমার চারধারে একটা নির্মল নিষ্পাপ পরিবেশ চাই, মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন ফাউস্ট, আমি দেখতে চাই ফুলের মতন অমলিন শিশু-মুখ, যে-মুখে

লেখা নেই লোভের কথা, চোখে নেই কামনার শিখা, ভঙ্গিতে নেই অপরাধ-প্রবণতা। তুমি আমাকে আমার নিজের শহরে নিয়ে চল; যেখানে আমি আমার সুখের শৈশব কাটিয়েছি।

ভীমমূর্তি কুচক্রী শয়তান মনে মনে ভীষণ ক্ষেপে উঠল : তাহলে আমি ফাউস্টকে এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারিনি ; এখনও একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি ওর মধ্যেকার ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বর-প্রভাব। আমার বিপদ এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি দেখছি।

ফাউস্ট তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। শয়তানের চোখে দু'চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—আমার ইচ্ছে, আমি জন্মভূমিতে ফিরে যাব। আমি তোমাকে আদেশ করছি এক্ষুনি তুমি আমাকে আমার জন্মভূমিতে নিয়ে চল।

১১

সেদিন রোববার। ইস্টার পর্ব। দিনটি কমলা রংয়ের রোদে উজ্জ্বল, উষ্ণ বাতাস নরম আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে শহরের ওপর দিয়ে। রোডার রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ভিড়। মেয়ে-পুরুষ-শিশুরা তাদের সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে। তৃপ্তি ও শান্তির বাতাবরণ দিয়ে ঢাকা যেন সব কিছু।

প্রায় সকলেই যাচ্ছিল গির্জার দিকে। শিশুদের টুকটুকে গালে হাসির টোল, হাতে হাতে পদ্মফুল। বুক ফুলিয়ে হাঁটছে তারা।

দু'জন আগন্তুক শহরে ঢুকল। তারা সেতু পার হয়ে খিলানের মধ্যে দিয়ে দেউড়ি পার হল। তাদের একজন কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠদেহী মানুষ, গায়ে কালো আলখাল্লা মাথায় শিরস্ত্রাণ। শিরস্ত্রাণ থেকে একটা লম্বা লাল পালক পিঠের ওপরে দুলছে। তার সঙ্গীটি বয়সে তরুণ ও সুদর্শন, অবয়ব নিটোল নিখুঁত, রেশম ও মখমলের বেশ-বাস অতিশয় মূল্যবান। তারা রাজপথ বেয়ে হেঁটে চলেছে।

যুবকের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রত্যেকটি বাড়ি বাগান প্রতিটি মানুষকে তিনি গভীর উৎসাহে খুঁটে খুঁটে দেখছেন যেন পুরোনো বন্ধুকে নতুন করে বন্ধু করে নিচ্ছেন।

ফাউস্ট শয়তানের দিকে তাকালেন, জীবন এখানে যেন স্থির হয়ে এক-

জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, মেফিস্টো, আমি যৌবনে যেমন দেখেছিলাম তেমনি সব আছে, সব চলছে, কোথাও এতটুকু বদলায়নি।

তুমি এত সকালে সেই দিনগুলির কথা ভুলে গেলে? একটা দুর্বোধ হাসি ফুটল শয়তানের মুখে।

সহসা তখন সেই পুরোনো দুঃস্বপ্নের দিনগুলির কথা মনে পড়ল তাঁর, তিনি আঁৎকে উঠলেন। এক পুরুষ আগে কী ভয়ংকর মহামারীরই না প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এই শহরে। ফাউস্টের বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কিন্তু তখনই আবার তিনি ছেলেমানুষের মতন হেসে উঠলেন, কিন্তু চাকা ঘুরে গেছে মেফিস্টো, সে বিভীষিকার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। সবকিছু সেই আগেকার মতন, মনে হচ্ছে যেন আমিও ঠিক সেই আগেকার মতই আছি এতটুকু বদলাই নি।

একদল বয়স্ক লোক আর পদ্মফুল হাতে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে অবাক হয়ে দু'জনকে দেখছিল। ফাউস্ট তাদের মধ্যে একজন মোটাসোটা আমুদে মানুষকে ডেকে শুধোলেন—আজ তোমাদের কী উৎসব গো? হাতে হাতে পদ্মফুল, মুখে মুখে হাসি, পরনে সবাইর ঝকমকে পোশাক?

লোকটা গাধার পিঠে জ্বালানী কাঠ চাপিয়ে যাচ্ছিল, থেমে বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকল প্রশ্নকর্তার দিকে। একটু সামলে নিয়ে বললে, কোথা থেকে এসেছ হে? পবিত্র ইস্টারের নাম শোনো নি, তুমি কি তুরস্কের মানুষ? সে হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই আবার রওনা হল, যেতে যেতে যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই বলল, দেখ দেখ কী আজব জীব শহরে এসেছে, পবিত্র ইস্টারের-ই নাম শোনেনি কোনদিন।

আর একবার ফাউস্ট স্মৃতির তিক্ত স্বাদে শিউরে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সত্যি সত্যি তিনি অনেক বদলে গেছেন। জন্মভূমির মানুষের সঙ্গে তাঁর আর কোন নাড়ির যোগ নেই। তাদের সেই ভালবাসা তাদের আচার-ব্যবহার জীবন-যাপনের ধারা এমন কি চিন্তা-ভাবনা থেকেও তিনি আজ বিচ্ছিন্ন। এ শহরে সকলের কাছে তিনি যখন জ্ঞান-বৃদ্ধ নামে পরিচিত তখন এরা সবাই বালক-বালিকা। সে-দিন তিনি যাদের চিনতেন সেই সব যুবক-যুবতীরা সবাই আজ বৃদ্ধ অনেকেই হয়ত মরেও গেছে। ফাউস্ট বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন।

সবাই যাচ্ছে। সবাইর সঙ্গে তাঁরাও গির্জার দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁদের

চারধারে এলোমেলো মানুষের ভিড়। কুমারী মেয়েরা তাদের যৌবন সযত্নে আবৃত করে নম্র পায়ে হেঁটে চলেছে। আশেপাশে বাচ্চারা যাচ্ছে লাফাতে লাফাতে হৈ-হল্লা করে। এইসব দেখেশুনে ফাউস্টের বিষাদ কেটে গেল, প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। উৎসবের স্পর্শ তাঁকে সজীব করে তুলল।

যেতে যেতে পথের ধারে সুন্দর ছোট্ট একখানি বাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফাউস্টের। বাঁকা সোজা নানা নক্সায় তৈরি বাড়িটির ছাদ থেকে লাল টালির চাল এসে নুয়ে পড়েছে বাগানের ওপর। ধারে ধারে তার সারি সারি ফলের গাছ। মেফিস্টোর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মুগ্ধ চোখে বারবার বাড়িটাকে দেখলেন ফাউস্ট। তিনি তখনও জানেন না, কত কাছে এসে পড়েছেন সেই মানুষটির— যার সঙ্গে তাঁর বাকি জীবনের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে যাবে, যে তাঁর অস্তিত্বের গভীরে লালিত সমস্ত পবিত্র বোধের প্রতীক হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে তাঁর আধ্যাত্ম-শক্তির শেষ পরীক্ষার পরশমণি।

কুমারী মারগারেটের কথা বলছি। সুন্দরী মারগারেট মায়ের সঙ্গে ওই ছোট্ট বাড়িটিতে বাস করে। মাঝখানে চেরা সিঁথি, দু'পাশে নেমে এসেছে ঘন চিক্কণ সোনালি চুলের গোছা, কপালের দুপাশে অবাধ্য চুল বাতাসে কাঁপে। যুবতীর মসৃণ ত্বকে স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল বিভা, আকাশের মত নীল দুই টলটলে চোখে থৈ-থৈ করে জীবন—জীবনের আনন্দ। বয়েস তার সতের তবু এখনো যেন শিশু। শিশুরাই তার খেলার সাথী। তাদের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ করে, কানামাছি খেলে, মালা গাঁথে ফুলের আর পাঠশালায় শেখা শৈশবের গান গায় গুনগুনিয়ে। যেন একটি শতদলের কুঁড়ি, সবে ফুটতে শুরু করেছে, দলে পরিমলে সে যে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে তারই দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে সে জানলায় এসে দাঁড়ায়, আপনমনে গুনগুনিয়ে সারা বাড়ি পায়চারি করে।

ইস্টারের সকাল। মারগারেট গির্জায় যাবে। পরনে অনাড়ম্বর সাদা ফ্রক। জামার আটোসাঁটো হাতা কব্জি অবধি নেমে এসেছে, তার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে স্বাস্থ্যবতীর সুডৌল বাহুর ভাঁজ। কাঁধের সমান্তরাল গলাবন্ধ জামার ওপরে নগ্ন গ্রীবার ত্বক দেখা যাচ্ছে—টানটান মসৃণ দুধের সরের মতন সাদা; তার টলটলে দুই নীল চোখের মতনই নির্মল নিষ্কলুষ সেই ত্বক। মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে মারগারেট এসে ঘরে ঢুকল। রাস্তার পাশের ঘর। বাগানের ভিতর দিয়ে ঘরে এসে ছড়িয়ে পড়ছে নরম হাওয়া; তার টাট্‌কা সবুজ গন্ধে ভরে আছে ঘর। ঘরের আসবাব ওককাঠের, মসৃণ উজ্জ্বল। চওড়া তাকে

চকচক করছে উপাসনার বাসন-কোসন। তকতকে মেঝের একধারে গুছোনো রয়েছে গ্লাস বাটি ঝকঝকে থালা। মা জানলার ধারে বসে সেলাই করছেন— মুখে বাৎসল্যের প্রশ্রয়, চোখে প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি। সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে এই নিষ্পাপ নির্মল যৌবনার উপযুক্ত পরিচ্ছন্ন গার্হস্থ্য পরিবেশ।

মারগারেট এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে জনতার স্রোত। গির্জায় যাচ্ছে সবাই। সেও গির্জায় যাবে। উৎসাহে উত্তেজনায় তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বললে, মা, দেখ দেখ, কি ভিড় কি ভিড়, এরা সবাই গির্জায় যাবে, তাই না মা! হঠাৎ মারগারেট হেসে উঠল, হি-হি-হি, দ্রেম ব্যোমও তার ছেলেকে নিয়ে গির্জায় যাচ্ছে। ছেলেটা তার মায়ের চেয়ে অন্তত তিন গুণ বড় হবে, হবে না মা ?···

মা, মা, ওই পরদেশী দু'জনের দিকে তাকাও, কী সুন্দর আর দামী পোশাক ওদের, দেখ। ওরা আমাদের জানলা পার হয়ে গেছে, ওই যে যাচ্ছে, আহ্, ওদের মুখ যদি দেখতে পেতাম। ওদের মধ্যে যার বয়স কম, ওই যে, আঁটো পায়জামা পরা ফিকে নীল রংয়ের ঢিলে কোট গায় মানুষটি। দেখছ, কি রকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে, যেন রাজা, ঠিক দেখো, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, ওই মানুষটি অসাধারণ সুন্দর না হয়ে যায় না।

মা মৃদু ধমক দিলেন, তুমি জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তার মানুষ দেখবে আর বক্‌বক্ করবে, গির্জায় যাবে কখন শুনি ? তুমি নির্ঘাৎ দেরি করে ফেলবে। কি করে যে গির্জায় ঢুকবে বুঝিনে। উপাসনা শুরু হয়ে গেলে সব মানুষ যখন যে যার জায়গায় বসে পড়বে তুমি লাজুক মেয়ে কী যে করবে, জানিনে বাপু।

মা মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেলেন। আশীর্বাদ করে বললেন, আজকের এই শুভদিনের পাপমুক্ত শান্তি সারাজীবন তোমাকে ঘিরে থাকুক।

তোমাকেও ঘিরে থাক এই পবিত্র শান্তি, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললে মারগারেট, তারপর জানলার ওপরকার ফুলদানী থেকে একটা পদ্মফুল তুলে নিয়ে দরজা পর্যন্ত এল ; সেখান থেকে মাকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে দ্রুতপায় নেমে এল রাস্তায়।

তার দেরি হয়ে যাবে—ভয়ে ভয়ে দ্রুত হাঁটছিল মারগারেট। আর লঘু পায়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবছিল গত বছরের এই উপাসনার দিনটির কথা। সেদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তার লম্বা চওড়া বিপুল-দেহী দাদা। সে রাজকীয় বাহিনীতে চাকরী করে। এখন সে দূরদেশে যুদ্ধে গেছে। দাদার

সঙ্গে যেতে পেরে সেদিন তার গর্বের অবধি ছিল না। দাদার গায়ে ছিল সৈনিকের পোশাক কোমরে ঝুলানো ছিল মস্ত তলোয়ার। ওই তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে মাঝে-মাঝেই দাদা তাকে ভয় দেখাত। দাদার কথা ভাবতে ভাবতে আজকের দেখা পরদেশী, রাজপুত্রের মতন দেখতে, মানুষটির কথাও মনে পড়ল।

মনের মধ্যে বালিকা-সুলভ নানা স্বপ্ন ও স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অন্যমনস্ক মারগারেট গির্জায় এসে পৌঁছল ও সদর পেরিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ এক অপ্রীতিকর কালো মানুষের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে থমকে দাঁড়াল মারগারেট। কালো মানুষটি আর কেউ নয় মেফিস্টো, শয়তান। রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দরজার নিচের পৈঠায় দাঁড়িয়েছিল। থমথমে মুখ ভয়ংকর চেহারার মানুষটার দিকে তাকিয়ে তার স্বপ্নের সুতো ছিঁড়েখুঁড়ে তালগোল পাকিয়ে গেল—ভীষণ ভয়ে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। একটা অস্ফুট চিৎকার করে দু'পা পিছিয়ে গেল মারগারেট, হাত থেকে পদ্মফুলটা পড়ে গেল তার। ফাউস্ট দাঁড়িয়েছিলেন মেফিস্টোর পেছনে। দ্রুত দু'পা এগিয়ে এলেন তিনি, মেঝে থেকে ফুলটা কুড়িয়ে নিলেন, মধুর এক আনত ভঙ্গিতে ফুলটি তুলে দিলেন মারগারেটের হাতে।

ফুলটি হাতে দিয়ে সৌজন্যসূচক কিছু বলবেন ভেবেছিলেন ফাউস্ট ; কিন্তু মারগারেটের চোখে চোখ পড়তেই কেমন গুলিয়ে গেল সব। সর্বাঙ্গে একটা অজ্ঞাত আবেগের শিহরণ বয়ে গেল—এমন শিহরণের অভিজ্ঞতা আর কোনদিন কোথাও হয়নি তাঁর। শিহরণের সঙ্গে জড়িয়েছিল কিছু ভয় কিছু পরিচয়, সবার ওপরে একটা অস্পষ্ট আবিষ্কারের আনন্দ পাখির পালকের মতন নরম স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছিল তাঁর চেতনায়। একটা সহজাত বোধ যেন কানে কানে বলছিল—অবশেষে এইবার তুমি তোমার পরশমণি হাতে পেয়েছ। নিজেরই অজ্ঞাতে সর্বত্র যাকে তুমি খুঁজে বেড়িয়েছ জীবনভোর, এই সে।

মারগারেটও বিচলিত হয়ে পড়েছিল খুব। মুহূর্ত আগে মেফিস্টোর কালো কুটিল চেহারা দেখে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর পলকে সে কুৎসিত মূর্তি আড়াল করে এসে দাঁড়াল আলোকিত লাবণ্যের প্রতিমূর্তি, যুব-শক্তির পরম প্রকাশ সুদর্শন একটি পুরুষ, যার সামনে সব প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে, সহায়হীন হয়ে নতজানু হতে হয়। সচকিত মারগারেট তাকিয়ে থাকল। তার হাঁ হয়ে গেছে মুখ স্থির হয়ে গেছে চোখের তারা।

একটা আকস্মিক আবেগে কেঁপে উঠল দু'জনেই। দু'জনেই যেন একই ভবিতব্যের কাছে অভিভূত হয়ে পড়েছে। কয়েক পলক অভিভূত হয়ে থাকল তারা —আর সে-পলক ক'টাকেই অনন্তকাল মনে হল তাদের। তাদের হাত পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে মাঝখানে পরম পবিত্রতার প্রতীক শ্বেতপদ্মটি।

নিবিড় আবেশের সেই পলক ক'টি কেটে যেতেই যেন জেগে উঠল মারগারেট, জাদুর জাল ছিঁড়ে ছুটল সে, যেমন করে ভয়-পাওয়া খরগোস ছোটে। এক ছুটে সে প্রার্থনা-গৃহে গিয়ে ঢুকল।

মারগারেট চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল তবু দুই ব্যগ্র চোখে তাকিয়ে থাকলেন ফাউস্ট। তার আবেশ ভাঙল মেফিস্টোর কর্কশ স্বরে :

—একটা বোকা মেয়ে, ভয় পেয়ে যে দৌড়ে গিয়ে পুরোহিতের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে তোমার আদর পাওয়ার যোগ্য নয়।

ফাউস্ট বিষম রেগে গেলেন। মেফিস্টোর দিকে তাকিয়ে বললেন, রাখ তোমার আদর সোহাগ, দেহের লোভ আর দেখিও না আমাকে, সে-সব পুরোনো দিন আমি পেরিয়ে এসেছি। আর না। আমার হৃদয়ে নতুন আশা জেগেছে। পৃথিবী নতুন রঙে রাঙা হয়ে দেখা দিয়েছে আমার সামনে, আমি নতুন প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। ওই যুবতীর দেহে দেখেছি অনাবিল লাবণ্য আর আমার যা নেই, যা আমি হারিয়ে ফেলেছি সেই নিষ্পাপ সারল্য দেখেছি তার চোখে।

মেফিস্টো কুটিল ভ্রূকুটি করে দেখছিল ফাউস্টকে। সে কী বলল শোনা গেল না। তখন অর্গান বেজে উঠেছে ; সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনা-সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছে গির্জার অভ্যন্তর। সবার ওপরে সবার কণ্ঠ ছাড়িয়ে শিশু কণ্ঠ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে :

"তোমারে নমস্কার, হে প্রভু, রাজার রাজা।"

মেফিস্টো তাড়াতাড়ি দু'হাতে তার কান চেপে ধরল। ভয়ে আর ঘৃণায় তার মুখের চামড়ায় খেঁচুনি শুরু হয়েছে। সে আর থাকতে পারল না, এক দৌড়ে গির্জার একতিয়ার পার হয়ে পালিয়ে গেল।

মনের মধ্যে নিদারুণ উদ্বেগ আর উত্তেজনা নিয়ে মারগারেট ছুটে এসে প্রার্থনায় বসল। নিজেকে শান্ত ও সংযত করতে, প্রার্থনার মধ্যে মন দিতে চেষ্টা করল সে। এ সময়ে তার বাড়িতেও আর এক উত্তেজনা। অভাবিতের উপস্থিতিতে হক্‌চকিয়ে গিয়ে চক্‌মকিয়ে উঠেছেন তার মা।

জানলার পাশে বসে সেলাই নিয়ে মগ্ন ছিলেন তিনি। লক্ষ্যই করেন নি এক অতিকায় তরুণ তেজী সৈনিক কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। তার গায়ে চামড়ার জারকিন। জারকিনের শক্ত টানটান কলার ও কাঁধ হৃষ্টপুষ্ট মানুষটার পাটার মতন চেতান বুকটাকে কল্পনার দৈত্যের মতন বিশাল করে তুলেছে। একটা পাহাড়প্রতিম মানুষকে লাফ দিয়ে তাঁর বাগানের পথে ঢুকতে দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন। একটু পরেই ভেজান দরজা হাট খুলে গেল, দরজা থেকে গর্জনের মতন গম্ভীর গলার স্বর ছুটে এল তাঁর দিকে। দুটো দীর্ঘ হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার চোখ দুটো আনন্দে ঝক্‌ঝক্ করছে। তিনি চোখ তুলে এই অভাবিতের আকস্মিক আবির্ভাবে হচচকিয়ে গেলেন।

—ভালেনটিন!

—লম্বা ছুটি মা, ছুটি; হুর্‌র্‌রে!

—ভালেনটিন, খোকা! রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন মা। স্বরে একসঙ্গে ফুটে উঠল আনন্দ, বিস্ময়, স্বস্তি, বাৎসল্য।

ততক্ষণে ভালেনটিন লম্বা পা ফেলে মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুই বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে পুরে তাঁকে শিশুর মতন শূন্যে তুলে ফেলেছে। মা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠেছেন।

—দিন দিন তোমার ওজন কমে যাচ্ছে মা, মাকে আবার পায়ের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মুখ টিপে হাসল ছেলে।

—খোকা, আমার খোকা! মা মৃদু হেসে বলে উঠলেন, ইস্টারের এই পবিত্র দিনে প্রভুর কি সুন্দর উপহার!

—পুরো তিন সপ্তাহ মা, পুরো তিন সপ্তাহ তোমাদের সঙ্গে কাটাব আমি, তোমার সঙ্গে মারগারেটের সঙ্গে। মারগারেট কোথায়?

—মারগারেট চার্চে গেছে, ও এক্ষুনি ফিরবে।

—আঃ, কিসে চুল্‌কোচ্ছে খোচাচ্ছে এখানে, দুষ্টমি করে হাসল ভালেনটিন, মস্ত হাতটা জামার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এল একটা ছোট্ট বাক্স। মায়ের দু'হাতের অঞ্জলির মধ্যে বাক্সটা রেখে সে তার বিশাল থাবা দিয়ে খুলে ফেলল বাক্সটা। মা দেখলেন, একটা সুন্দর সোনার ব্রোচ চক্‌চক্ করছে ভিতরে।

ভালেনটিন বললে, জান মা, অনেক দূর থেকে এসেছে জিনিসটি, সেই ব্রানডেনবুর্গ থেকে। আর এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার এক দুর্লভ ভাগ্য। বলতে বলতে স্মৃতি জেগে উঠল তার মনে, সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

তারপর মা আর ছেলেতে গল্প করতে বসে গেল। ভালেনটিন মাকে শোনাল বিদেশে তার নানা অ্যাডভেন্‌চারের কথা, বিপদ আনন্দের কথা, মা আগ্রহের সঙ্গে জানালেন তাকে তার এখানকার সঙ্গী-সাথীদের কথা।

হঠাৎ বাগানের দিকের বন্ধ দরজাটায় ক্লিক করে একটা আওয়াজ হল। ওরা শুনতে পেলেন মারগারেট সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায় উঠে গেল তার ঘরে।

—আশ্চর্য ব্যাপার, মারগারেট গির্জা থেকে এসে আমাকে শুভেচ্ছা জানায় না এমন তো কখনো ঘটে নি। মনে হচ্ছে ওর শরীর খারাপ হয়েছে, তুমি বস বাবা, আমি দেখে আসছি ওর কী হয়েছে। মা শঙ্কিত হয়ে উঠে গেলেন।

মারগারেট তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে আছে বটে কিন্তু তার চোখ স্বপ্নমগ্ন। শূন্য দৃষ্টি জানলার দিকে মেলা। সে যেন আজ খুব বিব্রত অস্থির। সকালবেলাকার ঘটনা এক অজ্ঞাত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তাকে। অনুভূতিটা, সন্দেহ নেই, গভীর আনন্দের কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা গা ছমছমে ভয়, বুক কাঁপছে তার একটা অজানা আশঙ্কায়। উপাসনার সমস্তটা সময় সে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে তার রাজপুত্রের চেহারাটা মন থেকে মুছে ফেলতে, হাঁ রাজপুত্র বলেই মনে মনে ডেকেছিল সে তাঁকে। কিন্তু রাজপুত্রের চিন্তাটাকে কিছুতেই সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। উপাসনার শেষে গির্জা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় গির্জার বাইরে আর একবার দেখেছে সে তাঁকে। সে যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ভয়ে ভয়ে সে তাড়াতাড়ি তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে এসেছে কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে কেবলই তার কথা মনে হয়েছে, রাজপুত্র আর তার সঙ্গী তাকে অনুসরণ করছে, তার পেছনে পেছনে আসছে তারা। সে ছুটতে ছুটতে এসে তার ঘরে ঢুকেছে ভয়ে ভয়ে। নিচে তাকিয়েছে জানলা থেকে। তাদের কাউকে জানলার নিচে

না দেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ঠিকই কিন্তু তাদের না দেখে সে নিরাশও কম হয় নি।

মা এসে ঘরে ঢুকতেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল মারগারেট। মাথা হেঁট করে রইল। যেন ভয়, মাথা তুললেই মা তার মুখ দেখে একটা কলঙ্কের ব্যাপার জেনে ফেলবে।

—মারগারেট, মা, কী হয়েছে তোমার? মায়ের গলায় বাৎসল্য আর আশঙ্কা ফুটে উঠল।

—কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে মা, তা, তুমি কিছু ভেবো না মা, এটা এক্ষুনি কেটে যাবে। লাজুক মুখ তুলে মেয়ে জবাব দিল।

—ত চটপট নিচে নেমে এস। দেখ এসে, কে তোমাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে বসে আছে। মায়ের মুখ অনাবিল সুখের হাসিতে ভরে উঠল।

একটা বিস্ময়ের আঘাত চমকে দিল মারগারেটকে। তখনও তার রাজপুত্র তার মন জুড়ে আছে। সে মায়ের সঙ্গে নিচে নামতে নামতে মনে মনে সংকল্প আটছিল, 'রাজপুত্রকে' দেখলে তক্ষুনি সে পালাবে, একবার ফিরেও তাকাবে না তাঁর দিকে।

নিচে নেমে আসতেই খোলা দরজার পথে সে শুনতে পেল একটা উদাত্ত গলার উল্লাস। তার দাদা দু' হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে! দাদাকে দেখে সে হকচকিয়ে গেল। মুহূর্তকাল সে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল তার দিকে, যেন একজন প্রবঞ্চককে দেখছে, দেখছে এমন একজনকে যে তাকে নিদারুণ হতাশ করেছে। পলকে সে-পরাজিতের ভাবনাটা কেটে গেল তার, সে উচ্ছল সুখের একটা অব্যক্ত শব্দ করে ছুটে এল দাদার কাছে।

—ভালেনটিন, দাদা!

ভালেনটিন দু' হাতে বোনকে বুকের মধ্যে পুরে ফেলল, দৃশ্যটা দেখাচ্ছিল যেন একটা বিরাট বাদামী ভালুক তকতকে তাজা একটা ভোরের ফুল বুকে জড়িয়ে আছে। ক্ষণকাল। তারপরে তাকে বুক থেকে নামিয়ে একটু দূরে সরিয়ে কাঁধে হাত রেখে গর্ব আর প্রশংসার চোখে দেখতে থাকল।

—ঈশ্বর! নিশ্চয় তুমি সৌন্দর্যের জাদু-আপেল খেয়ে নিয়েছ। সত্যি, তুমি সেই ছোট্ট শিশুটি যখন বিছানায় পড়ে হাত-পা ছুঁড়ে খেলতে তখন কল্পনাও করতে পারিনি তুমি এত সুন্দর হয়ে উঠবে একদিন। সত্যি মা, আমি বলছি, রোডার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে আমার এই বোন, দেখো, শিগ্‌গিরই ওর একজন

প্রেমিক জুটে যাবে।

মারগারেট লজ্জায় আগুনের মতন লাল হয়ে উঠল। তক্ষুনি একটা আনন্দের ধ্বনিও ফুটে উঠল তার মুখে—দাদা তার হাতটা টেনে নিয়ে কব্‌জিতে পরিয়ে দিচ্ছিল একটা রুপোর সরু চেন। চেনটির সঙ্গে ঝুলছিল একটি ছোট্ট রুপোর ক্রুশ।

—আহ্, আমার দাদা কী ভাল! মারগারেট একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, আমি সব সময় এটা পরে থাকব দাদা, আর তুমি যখন আবার চলে যাবে বিদেশে, এটার দিকে তাকিয়ে তোমার কথা ভাবব। আচ্ছা, ক'দিন তুমি আমাদের কাছে থাকছ, দাদা? তোমার ছুটি ক'দিনের?

—তিন সপ্তাহ। কিন্তু দেখো বোন, এ ক'দিন দিনভোর আমরা সবাই মিলে কী হৈ-চৈ-ই না করি। এমন হৈ-চৈ করব যা চিরকাল আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যেন ভালেনটিনের কথার জবাবেই একটা বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি রাস্তা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ঘরে। জানলা থেকে তারা দেখল, দু'জন পরদেশী যাচ্ছে রাস্তা বেয়ে, তারা পেছন ফিরে তাদের বাড়িটা দেখছে, পরদেশীদের একজনের গায়ে কালো আলখাল্লা, সেই হাসছিল সেই অশুভ অট্টহাসি।

ভালেনটিন বাড়ি এসেছে ঘণ্টা দুইও হয়নি তখনো। তাদের বাড়ির পেছনে বাগানের শেষ কোণে গাছ-গাছালির আড়ালে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে কথা বলছিল ফাউস্ট আর মেফিস্টো।

মেফিস্টো—আমি তোমাকে বার বার বলছি ফাউস্ট, এ মেয়ের আশা তুমি ছাড়। এ মেয়ে থাক কোন পাদ্রীর জন্যে কিংবা কোন পাগলা প্রেমিক ঘুরুক ওর পেছনে পেছনে। তুমি না। তোমার যোগ্য নয় এ মেয়ে। আমি বলে রাখছি ঐ মেয়ের জন্যে তোমার আসক্তি তোমাকে বিপদে ফেলবে।

ফাউস্ট—এ মেয়েকে দেখে আমার মধ্যে যা জেগে উঠেছে, তা আসক্তি নয়, একে তুমি আসক্তি বল না মেফিস্টো, এ আমার প্রেম, যথার্থ প্রেম। বলতে বলতে প্রত্যয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন ফাউস্ট, এই প্রথম আমি প্রেমের স্পর্শ পেয়েছি, এই প্রথম অনুভব করেছি প্রেম কী! এ পৃথিবীর আর কিছুতেই আমার আকর্ষণ নেই, আমি মারগারেটকেই চাই, একমাত্র মারগারেটকে।

মেফিস্টো—না ওকে নয়, ওকে চেয়ো না তুমি, তোমার জন্যে আমি ওর চেয়ে

ঢের ঢের যোগ্য রূপসী খুঁজে আনব, অনেক মানব, রূপে-গুণে বুদ্ধিতে-বিদ্যায় তারা তোমায় অনেক বেশি তৃপ্তি দেবে, তারা এ মেয়ে থেকে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হবে, দেখো। বলতে বলতে মেফিস্টোর মনের ভয় গলায় ফুটে উঠল। তার বুঝি মনে হয়েছে এই সোনালি চুল লাবণ্যবতী এসে তার সব ষড়যন্ত্র ভেস্তে দেবে।

ফাউস্ট—কিন্তু আমি মারগারেটকেই ভালবেসে ফেলেছি; একমাত্র তাকেই আমি ভালবাসি।

মেফিস্টো বিড়বিড় করে উঠল—জানি, ভাল করেই জেনেছি।

ফাউস্ট—আমি তাকেই চাই, একমাত্র তাকেই, যা হুকুম করছি তাই কর। ওকে পাইয়ে দাও আমাকে।

মেফিস্টো—তুমি যখন হুকুম করেছ, অবশ্যি তামিল করব। রুষ্ট শোনাল মেফিস্টোর স্বর। তবু আবার বলছি, এ শুভ হবে না, তোমার ও তার দু'জনেরই বিপদ আসবে এতে করে, মারাত্মক বিপদ। যাক গে। যেন আত্মসমর্পণ করল মেফিস্টো।

সে তার আলখাল্লার ভিতর থেকে ব্রোঞ্জের একটা ছোট্ট বাক্স বের করে ফাউস্টের সামনে ধরল, বললে তাকাও। সে একটা বোতাম টিপল, ডালাটা তৎক্ষণাৎ ছিট্‌কে খুলে গেল আর ফাউস্টের চোখের সামনে ঝিকিয়ে উঠল সরু সোনার একটি চেন, হঠাৎ দেখলে মনে হবে সাধারণ কিন্তু আস্তে আস্তে তার সূক্ষ্ম কারুশিল্পের নৈপুণ্য মুগ্ধ করে দেবে দর্শককে। মেফিস্টো বললে—এই সোনার সুতোর বেড়িতে সে বাঁধা পড়বে তোমার কাছে। আর, একবার এই সোনার হার তার গলায় উঠলে তোমাদের ভবিতব্য আর কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

মেফিস্টো বাক্সটাকে আবার তার আলখাল্লার ভিতরে লুকিয়ে ফেলল তারপর নিঃশব্দ পায় গাছ-গাছালি পার হয়ে বাড়ির পেছন দরজায় এল। ভেজান দরজা ঠেলা দিতেই ঈষৎ ফাঁক হল মেফিস্টো ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে, সিঁড়ি বেয়ে চুপিসারে উঠে গেল ওপরে; মারগারেটের ঘরে এসে দাঁড়াল। ছোট একটি খাটে অপাপবিদ্ধ কুমারীর বিশুদ্ধ বিছানা তুষার-শুভ্র চাদরে ঢাকা—বিছানার ওপরে একটা বিরক্তির দৃষ্টি বুলিয়ে মেফিস্টো জানলার কাছে তার আলমারির সামনে এসে দাঁড়াল। সেখানে আসবার সময় তার চোখে পড়েছিল পেছনের দেয়ালে কুলঙ্গিতে যত্ন করে রাখা শিশুকোলে ভার্জিন মেরীর মূর্তি। দেখেই তার চোখ কুঁচকে গিয়েছিল, বিকৃত হয়ে উঠেছিল মুখের পেশী, তার

সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছিল নিদারুণ ঘৃণা। সে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে আলমারির টানায় মন দিয়েছিল।

একটা একটা করে সে টানাগুলি দেখছিল—কুমারী মেয়ের গোপন সঞ্চয় সব। সে দেখছিল আর সব সময় অনুভব করছিল তার পিঠে ভার্জিন মেরীর অপলক দৃষ্টি। তার পিঠটা শির্‌শির্ করছিল, অস্বস্তিবোধ করছিল সে। বাচ্চা মেয়ের মতন সব তুচ্ছ জিনিস সঞ্চয় করে রেখেছে মেয়েটা—কচি খুকি। পাপের কোন স্পর্শ কোথাও নেই দেখে অসন্তুষ্ট মেফিস্টো সবগুলি টানা আবার বন্ধ করে রাখল। কেবল আধখোলা রেখে দিল সব-ওপরের টানাটা। ওটার ভিতরেই সে রেখে দিয়েছে সেই ব্রোঞ্জের ছোট্ট গহনার বাক্সটা। এটা রাখবার জন্যেই সে ঢুকেছিল এখানে। কাজটা সন্তর্পণে শেষ করে সে ঘুরে দাঁড়াল এবং আগেরবারের মতন এবারও মেরীর মূর্তি চোখে পড়ামাত্র তার সারা শরীর ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। সে একটা ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে মেরীর মূর্তি থেকে যথাসম্ভব দূরে অন্য দেয়াল ঘেঁসে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

মেফিস্টো তখনো বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে গিয়েছে কি যায়নি মারগারেট দৌড়োতে দৌড়োতে এসে নিজের ঘরে ঢুকল। এক অভাবিত বোধের শিকার হয়ে উঠেছিল মারগারেট। সুখী অথচ কেমন উত্তেজিত উদ্বিগ্ন, দাদার আকস্মিক উপস্থিতিতে তার আনন্দের অবধি নেই, দাদা এসে বাড়িতে এক উৎসবের আবহাওয়া বইয়ে দিয়েছে, তবুও যেন কেমন একটা ভূতাশ্রিত ভাব তার, অপরিচিত একটা অনুভব ক্রমাগত তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, ঝেড়ে ফেলতে পারছে না সে কিছুতেই তার সেই 'রাজপুত্রের' চিন্তা, চিন্তাটা তাকে কেবলই শিহরিত করছে, হতবুদ্ধি করছে। কখনো সে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে, কখনো সে নির্জীব হয়ে যাচ্ছে, এই জ্বলে উঠছে ত তক্ষুনি আবার নিবুনিবু হয়ে যাচ্ছে কী যে হচ্ছে তার সে নিজেই বুঝছে না।

সে জানলার ধারে তার চেয়ারে বসতে যাবে তখন আধ-খোলা টানাটা দেখতে পেল সে, টানাটা বন্ধ করতে এসে তার চোখে পড়ল সেই গহনার বাক্সটার একটা কোণ। তক্ষুনি সেটাকে সে টেনে বের করল, বের করে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সে যখন এ-ঘর ছেড়ে যায়, মা ডেকে নিয়ে যায় তাকে, তখন টানাটা বন্ধ ছিল, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। তবে? এটা এলো কোথা থেকে, কে রেখে গেল? দাদা? মজা করার ব্যাপারে দাদার জুড়ি নেই, ওর স্বভাবটাই ওই রকম। আর যদি দাদা না হয় ত কে হবে, আনটি, আনটি

মারথা আমাকে অবাক করে দেবার জন্যে ইস্টারের এই অভাবিত উপহারটা এমন নিঃশব্দে রেখে গেছে ?

মারগারেট সম্ভব-অসম্ভব নানা রকম ভাবছিল ; কিন্তু তার সমস্ত ভাবনার গভীরে একটা 'নিশ্চয়' বোধ কাজ করছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এ তার রাজপুত্রের দান, আর কারো নয়, যে-করেই হোক এ তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। কিন্তু এ সম্ভাবনাকে মনের মধ্যে লালন করতে বেশীক্ষণ সাহস পেল না। সে বাক্সটা জানলার কাছে নিয়ে এল। বাক্সের গায়ে খোদাই করা নিপুণ কারুকার্য মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল সে। ডালার ওপরে আঁকা একটি অলৌকিক গাছ। তার ডালপালা মূল থেকে উঠে এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে, এমন তকতকে তাজা, যেন জীবন্ত। সে-ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে আবার মাথা বের করে উঁকি দিয়ে আছে বনদেবীরা—নিম্‌ফ আর স্যাট্যার।

সে হাতের তেলোয় রেখে বাক্সটার ওজন অনুমান করল, চেষ্টা করল বাক্সের ডালা খুলতে কিন্তু ডালাটা খুব শক্ত হয়ে সেঁটেছিল, সে খুলতে পারছিল না। হঠাৎ তার গা কেঁপে উঠল, সে ছুটে এসে বাক্সটাকে টানার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তার মনে হল, একটা অশুভ দৃষ্টি ওৎ পেতে তাকিয়ে আছে তার দিকে, একটা রহস্যময় প্রলোভন কেবলি টানছে তাকে, টানছে। তবু অসহায় সে কিছুতেই দূরে সরে যেতে পারছিল না, ছোট্ট বাক্সটার ভিতরকার অজানা বস্তুটা যেন তার চলচ্ছক্তি রহিত করে দিয়েছে। সে অনড় দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল আর লড়তে থাকল নিজের সঙ্গে। লোকজন যাতায়াত করছে, সে তাদের মধ্যে অন্যমনস্ক হতে চাইল কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও সে মন ফেরাতে পারল না বাক্সটা থেকে, পারল না সেই বাক্সটার সঙ্গে জড়িয়ে-থাকা সুদর্শন মানুষটির স্মৃতি থেকে—বাইরে পথের ওপরে তার দৃষ্টি অথচ চলমান জনতার সেই বিচিত্র মিছিল কিছুই সে দেখছে না ক্রমশ রাস্তার মানুষ বাইরের সমস্ত দৃশ্য তার দৃষ্টি থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠতে থাকল নানা অবাস্তব অতিপ্রাকৃত সব মুখ আলো আলেয়া : একটার ওপরে আর একটা এসে আগেরটাকে মুছে দিয়ে নতুন করে যেন ছবি আঁকছে ; কিন্তু সব সময় সে-সব কিছুর মধ্যে দুটি চিত্র বড় মধুর বড় সুন্দর—সে দুটির একজন সে আর একজন তার 'রাজপুত্র'। যে মনোরম আগন্তুক-বোধ প্রথমাবধি তার মনে প্রচ্ছন্ন একটা আবেশের প্রসন্নতা ছড়িয়ে দিয়েছিল এখন ক্রমশ তা প্রবল প্রকট হয়ে তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন আবিষ্ট করে

ফেলল। হেরে যাচ্ছে বুঝি সে, নিজের অজ্ঞাতেই সে দশ আঙুলে নিজের দু'হাত শক্ত করে ধরেছে, নিজের অজান্তেই সে কাঁপছে থরথর করে। সে জানছেও না, নির্মল হাসির মধুর লাবণ্য ফুটে উঠেছে তার দুটি নিষ্পাপ ঠোঁটে।

এভাবে কতিপয় মগ্ন মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর দিবা-স্বপ্ন ভেঙে গেল তার,সর্বাঙ্গে একটা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠল সে, আবার করে তাকাল টানাটার দিকে। ভয়ে আর দ্বিধায় স্তব্ধ হয়ে রইল ক্ষণকাল তারপর আত্মসমর্পণই করতে হল তাকে, বাক্সটা বের করে নিয়ে এল সে, দেরাজ-আলমারিটির ওপর রেখে তার সর্বাঙ্গে অস্থির হাত বুলোতে থাকল ; খুঁজতে থাকল ডালা-খোলার বোতামটাকে। অর্ধছাগ অর্ধমানুষ-এর একটা মূর্তির উঁচু শিংয়ে আঙুলের চাপ পড়তেই হুট্ করে ডালাটা হাট খুলে গেল, চোখের সামনে ঝিকিয়ে উঠল নিপুণ হাতের তৈরি সরু একগাছি সোনার হার হৃদ্‌পিণ্ডের আকৃতির একটা লকেট তার সঙ্গে। চোখ গোল আর গোলাপী হয়ে উঠল তার, হাঁপ ধরে গেল তার দমফুরিয়ে যাওয়া মানুষের মতন। সে তাকিয়ে রইল, কেবল তাকিয়ে থাকল। পড়ছে কি না পড়ছে এমনই মৃদু হয়ে এসেছে তার নিঃশ্বাস। দু'টি হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা, দেহ নিস্পন্দ যেন ভাবাবেশে সমাধিস্থ সে ; যেন কোন জাদুমন্ত্রে অবশ। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সজাগ করল মারগারেট জোর করে নিজের চোখ দুটোকে সরিয়ে নিল হারটা থেকে। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেই সে বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে দিল। সরে এল দেরাজ-আলমারিটার কাছ থেকে। অস্থির অসহিষ্ণু সে এসে তার চরকার সামনে বসল, চরকাটাকে অকারণে ঘোরাল খানিকক্ষণ তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল যেন কেউ টেনে তুলল, চক্‌মকে দুটি মোহিত চোখ আর থমথমে এক আবিষ্ট মুখ নিয়ে সে দৌড়ে এল আবার বাক্সটার কাছে, বাক্সটা হাতে করে বোতাম টিপল।

তক্ষুনি সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, একটু পরে মা এসে ঘরে ঢুকলেন। ভয়-পাওয়া বাচ্চার মতন ঘাবড়ে গিয়ে এলোমেলো হাতে বাক্সটা কোনমতে টানায় ঢুকিয়ে দিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল মায়ের দিকে। তখনও তার হাত তার পেছনে, টানার হাতলটা ধরে আছে সে তখনও, তখনও টানাটা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়ে ওঠে নি তার।

—মারগারেট মা, কী হয়েছে তোর, বল দেখি ? মা মেয়ের কাছে এগিয়ে এলেন। এই সকাল বেলায়ও তোকে কত হাসিখুশী দেখলাম, হাসছিলি গান গাইছিলি, এর মধ্যে এমন কী হল তোর ? একেবারে চুপমেরে গেছিস, তোর

মুখে রা নেই, খাচ্ছিস না, আমাদের সামনে পর্যন্ত আসছিস না, নিজের ঘরে একলা বসে আছিস, নিজেকে এমন আড়াল করে রেখেছিস কেন মা? নিচে চল, ভালেনটিন এক্ষুনি এসে যাবে, ওর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। আয়, ভালেনটিনের জন্যে পেইসট্রি কেক করেছি, ছেলেবেলা থেকেই ও এই পেইসট্রি কেক খেতে ভালবাসে। কেমন হয়েছে একটু চেখে দেখি আমরা দু'জনে, আয়।

—মা, ইস্টারের এই শুভদিনে হঠাৎ দাদা এসে পড়াতে দারুণ হকচকিয়ে গেছি, তা ছাড়া মানুষের এই ভিড়ের মধ্যে মিশে গির্জায় যাওয়া প্রার্থনায় যোগ দেওয়া ইত্যাদিও আমাকে কম উত্তেজিত করে নি—কেমন ক্লান্ত লাগছে এখন। বল ত একবার আন্‌টি মারথার সঙ্গে দেখা করে আসি। বনের পথে হাঁটলে আমি সুস্থ বোধ করব।

আস্তে, থেমে থেমে বলছিল মারগারেট আর মা তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, তাঁর চোখে উদ্বেগ, তিনি বললেন, যাবে বই কি নিশ্চয় যাবে। তারপর একটু থেমে হেসে বললেন, কিন্তু যাবার আগে একটু পেইসট্রি চেখে যাবে, ভুল না কিন্তু মা। মেয়েকে আর একবার অনুরোধ করে মা নিচে নেমে গেলেন। যেতে যেতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে একটু হাসলেন বটে কিন্তু অন্তরে অন্তরে মেয়ের জন্যে তাঁর উৎকণ্ঠার অবধি রইল না।

মা নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মারগারেট চোরের মতন তাড়াতাড়ি বাক্সটাকে টানা থেকে বের করে রুমাল দিয়ে জড়িয়ে ফেলল। জীবনে সে এই প্রথম মায়ের কাছ থেকে কিছু গোপন করল, জীবনে সে এই প্রথম করল প্রবঞ্চণার কাজ।

সে দৌড়ে নেমে গেল নিচে সোজা বাগানে গিয়ে ঢুকল, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রুমাল বাঁধা বাক্সটাকে আপেল-বাগানের একটা গাছের জটিল ডালপালার মধ্যে গুঁজে রাখল। মারগারেটের ভাবনার শেষ নেই। বাক্সটা গাছের ডালে লুকিয়ে রেখে এসেও সে ভাবছিল, কী করে, কোন জাদুমন্ত্রবলে, বাক্সটা তার ঘরে এল। বাক্সটার কথা ভাবলে তার 'রাজপুত্রে'র কথাটাও স্বতঃই মনে এসে যায়। তার বুকটা দুর্ দুর্ করতে থাকে 'রাজপুত্র'কে কেন্দ্র করে মনোরোম দিবা-স্বপ্নে ভরে ওঠে তার মন। এখনও তাঁর ভাবনাতেই মন ভরে গেল তার।

মারগারেটের আন্‌টি মারথা একজন বিধবা। ভদ্রমহিলা ভারি হাসিখুশী এবং রসিক। খাটো গোলগাল মানুষটির চোখ দুটিতেই যত রাজ্যের দুষ্টুমি। দেখলে মনে হয় এই শ্যামাঙ্গী মহিলা এককালে একজন ছট্‌ফটে সুন্দরী ছিলেন।

শহরের একটেরেতে এক খামার বাড়িতে বাস করেন তিনি। তাঁর বাড়ি থেকে দেখা যায় থিউরিনজিয়ার চিরহরিৎ বনভূমি। তার অবিরাম মর্মর ধ্বনি শোনা যায় সেখান থেকে। বাড়িটার চারধার ঘিরে আছে বড় বড় ফলের বাগান। যত্নের অভাবে গাছগুলি যদৃচ্ছা বেড়ে উঠেছে; কিন্তু তাই বলে রমণীয়তার অভাব নেই। বসন্তের স্পর্শ পেয়ে ইতিমধ্যেই কচি পাতায় আর রঙিন ফুলে পরম সমারোহে সর্বাঙ্গে মনোহর হয়ে উঠেছে।

তিনি এখন রান্নাঘরে। অকারণ কর্মব্যস্ততায় হৈ-চৈ করছেন। তাঁর স্বভাবের সঙ্গে তাঁর রান্নাঘরটির সুন্দর মিল আছে। ঘরটি বড়সড় আর আলো হাওয়ায় খোলা মেলা এবং চমৎকার ঝকঝকে পরিষ্কার কিন্তু তাঁর স্বভাবের অগোছাল ভাবটি ঘরের সর্বত্র স্পষ্ট—তরকারির ঝুড়ি, ডিমের খোসা ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে, মাংসের কাঁটায় ঝোলে কাপড় চোপড়, ধোয়া মোছা বাসন-কোসন ট াঁই হয়ে এখানে সেখানে পড়ে থাকে, ইত্যাদি।

শুধু একবার তাকিয়েই, ভদ্রমহিলার সরল স্বভাবটিকে চিনে ফেলা যায়। মমতা আছে, প্রশ্রয় আছে, আবেগ আছে, উদার প্রসারতা আছে মনের; আর আছে প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে অদম্য কৌতূহল। এ-সব নিয়ে মজা করতে তাঁর ভাষায় কি আচরণে কোন আড় থাকে না। অন্য দিকে অবশ্য মহিলাটি হঠাৎ রাগী আর কর্তৃত্বপরায়ণ তবু সবার ওপরে তিনি দয়ালু; পরের দুর্দশার কথা মন দিয়ে শোনেন। আর প্রণয় ব্যাপারে কেউ দুঃখে পড়েছে শুনলে চট্‌পট্‌ সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেন।

বয়েস আঠারো কি তারও কম নাদুসনুদুস একটা ছেলে, অথচ চেহারায় দশাসহি পুরুষের মতন দেখতে, এসে কড়া নাড়ল মারথার দরজায়। মারথা ভিতরে বসে থেকেই দরজার দিকে তাকালেন। ছেলেটা লজ্জায় মাথা নিচু করে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, হাতের টুপিটা দু'হাতে দুমড়াচ্ছে কেবল।

—কার্‌ল, দরজায় দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভিতরে চলে এস। চলে এস। ডাকলেন তিনি। ছেলেটা বিব্রত ভাবে কাঁধ নড়তে নাড়তে এলোমেলো

পা ফেলে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল। পাখির মতন ঘাড় কাৎ করে চোরা চোখে দেখতে থাকল মারথাকে। একটা অসহায় ভাব চেপে রাখতে ওর মুখের পেশী শক্ত হয়ে আছে।

—আহ্, দাঁড়িয়ে আছ যে? বস না, ওই চেয়ারটায় বস, তারপর বল, কী বলতে এসেছ বলে ফেল। ছেলেটা বসল বটে কিন্তু কিছুই বলতে পারল না চট্ করে; মেঝের দিকে তাকিয়ে সে কেবল দুর্বোধ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করছিল, বুঝি মনের কথাটা ঢেকে-ঢুকে বলতে চেয়ে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না।

—কেবল তো-তো করছ কেন, বলেই ফেল না কী বলতে চাও। উৎসাহ দিলেন মারথা, বললেন, না চাইলে বাছা এ দুনিয়ায় কেউ তোমাকে কিছু দেবে না। না চাইলে স্বর্গে মর্ত্যে, কোথাও কিছু মেলে না।

মারথার উৎসাহেও সাহস যুগিয়ে উঠতে পারল না ছেলেটি তেমনি লজ্জায় বোবা হয়ে বসে রইল।

অধৈর্য হয়ে মারথা বললে, অ বুঝতে পেরেছি, কী চাইতে এসেছ তুমি। ওই সেই এক ব্যাপার। একটি মেয়ে···হুঁ কি বল, তাই না?

ছেলেটা খুব জোরে জোরে তিনচারবার মাথা নাড়ল।

মেয়েটা তোমাকে ভালবাসে না, এই ত?

হাঁ, মানে না, সে আমাকে ভালবাসে না, এক নিঃশ্বাসে সব ক'টা শব্দ সে উচ্চারণ করে ফেলল।

সোনার চাঁদ ছেলে, তাকে এমন অবহেলা, দেখাচ্ছি মজা, সান্ত্বনার কথাগুলি স্বগত উক্তির মতন আওড়াতে আওড়াতে মারথা তার ভাঁড়ার ঘেঁটেঘুটে একটা শিশি বের করে নিয়ে এল। এই যে শিশি দেখছ বাছা, এতেই রয়েছে তোমার সব যন্ত্রণার শান্তি। ছেলেটির কাছে এসে শিশিটা তার চোখের সামনে তুলে ধরলেন মারথা। মাত্র তিনটি ফোঁটা, অব্যর্থ এর তিনটি ফোঁটা পৃথিবীর যে-কোন মেয়েকে নিয়ে আসবে তোমার জন্যে। খাও। তিন ফোঁটা কেন, যেটুকু আছে, সবটুকু খেয়ে নাও, যার নাম করে খাবে সে আজ রাতে পাগল হয়ে তোমার কাছে ছুটে আসবে —আর যে তোমাকে ভালবাসে তুমিও ছুটে যাবে তার কাছে, আজ রাতেই যাবে, আমি আগে থেকে সমঝে দিচ্ছি কিন্তু। মারথা শিশিটা উপুড় করে দিল ছেলেটির গলায়, পরম আগ্রহে সেও এক ঢোকে সব ওষুধটা গিলে ফেললে।

মারথা বললেন, এর জন্যে আমি তোমার কাছে দাম চাইব না, বুঝলে সুন্দর

ছেলে, চতুর চোখে হাসলেন মারথা, দু'হাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, কেবল একটা চুমু খাব।

ছেলেটা এই অভাবিত ব্যাপারে হকচকিয়ে গেল। ছটফটিয়ে উঠে কোন-মতে তাঁর বাহুর ফাঁস আলগা করে ছুটে পালাল, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে তাঁর চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল সে। মারথা জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল। বিধবার চোখ দু'টি অপমানে বিষণ্ণ। ছেলেটা চলে গেলে মারথা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথা ঝাঁকাল, না দিনকাল একদম পাল্‌টে গেছে, আমাদের বয়েসের কালে কত কী ছিল।

সেদিন মারথার জন্যে পাগল হত সবাই। আজ তাঁর কাছে মানুষ আসে কেবল বশীকরণের ওষুধ কবজ নিতে, পরামর্শ নিতে—মারগারেটও সেই পরামর্শের জন্যেই ছুটে আসছিল মারথার বাড়ির দিকে।

মারথা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার জানলা থেকে সামনে একটি চোখ জুড়োনো চমৎকার উপত্যকা দেখা যায়। সেখানে সারা গায়ে ফাটল ফোকড় নিয়ে প্রাচীন ওকগাছগুলি বিশাল ডালপালা আর ঘন পাতার গাঢ় ছায়া ছড়িয়ে আকাশ ঝেপে দাঁড়িয়ে আছে, পাশাপাশি গায়ে গা ঘেঁষে আরও কত গাছের ছায়া, তাদের মধ্যে মসৃণ রুপোলি বার্চ-এর সংখ্যাই বেশী। সেখানে সবুজ মাঠ, মাঠে রঙিন ডেইজিরা ফুটে আছে, সোনালি পাঁপড়ি ছড়িয়ে হাওয়ায় দুলছে বাটারকাপ। একদল ছেলেমেয়ে হৈ-চৈ করে খেলা করছিল সেখানে। বাচ্চার দলটাকে দেখা যাচ্ছে না। মারথা কেবল তাদের কলরব শুনছিল।

ওরা সব মারগারেটের খেলার সাথী। মারগারেটের অবসর কাটে এই শিশুর দলের সঙ্গে কানামাছি কি অন্য কোন মজার খেলা খেলে। সামনের পথ দিয়ে মারগারেটকে যেতে দেখে তারা ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরল, একটা নতুন খেলা খেলছি আমরা, তুমি আমাদের সঙ্গে খেলবে, এস।

মারগারেটের বগলে সেই বাক্সটা। সে হনহন্ করে হাঁটছিল, বললে, তোমরা খেলতে থাক আমি এক্ষুনি আসছি আন্‌টির বাড়ি থেকে। আন্‌টির সঙ্গে আমার জরুরী দরকার কিন্তু দরকার সেরে আসতে দু'চার মিনিটের বেশী দেরি হবে না।

একটু পরেই মারগারেট এসে রান্নাঘরে ঢুকল। দৌড়ে গিয়ে চুমু খেল তাকে তারপর টেবিলের ওপর রুমাল বাঁধা বাক্সটি রেখে রুমালের গিঁট্ খুলতে লাগল। তার মুখ গোলাপের পাপড়ির মতন টুকটুকে হয়ে উঠেছে, চোখ জ্বলছে সন্ধ্যাতারার মতন।

—দেখ দেখ আন্‌টি। উত্তেজনায় চেচিয়ে উঠল মারগারেট, আমার টানার মধ্যে কী জিনিস আমি পেয়েছি, দেখ। বাক্সটাকে হাতের চেটোয় রেখে সে বোতাম টিপল।

দেখেই মুখ হাঁ হয়ে গেল মাসির, বিস্ময়ের এক বিশাল শ্বাস ভিতরে টেনে নিয়ে তখনই ছাড়তে না পেরে আইঢাই করে সহজ হলেন। অতি সুকুমার সূক্ষ্ম কারুদক্ষতার তৈরি হারটাকে সন্তর্পণে তুলে নিয়ে লুব্ধ আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে থাকলেন। আর চতুর চোখে তাকাতে থাকলেন মারগারেটের দিকে।

আমার পুষি বেড়ালটির তাহলে প্রেমিক জুটেছে এতদিনে।

—না না মাসি কক্‌খনো না, লাজুক মেয়ের মুখখানা এবার গলানো সোনার রং ধরেছে, বললে, তোমাকে বলিনি বুঝি এটা আমি আমার টানার মধ্যে পেয়েছি? আর সেজন্যেই ত মাকেও ব্যাপারটা জানাই নি, শুনে মা হয়ত তোমার মতনই ভাববে, ভাববে দেখ মেয়েটা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে। এমন কি আমি ভালেনটিনকেও বলিনি। তোমার জন্যে ওই আর একটি সংবাদ —দাদা ছুটিতে বাড়ি এসেছে।

—ভালেনটিন এসেছে। সত্যি একটি সুসংবাদ শোনালে।

—হাঁ, এই ছাখো দাদা আমার জন্যে এই রুপোর কব্‌জি-মালাটা এনেছে।

—বাঃ কবজিতে রুপোর হারটা ভারি সুন্দর মানিয়েছে ত। তা আয়, এবার সোনার হারটা আমরা পরখ করে দেখি, দেখি গলায় পরলে কেমন দেখায়, আগে আমি পরে দেখি কি বলিস্‌।

মারথা হারটাকে হাতে করে এসে আরশির সামনে দাঁড়ালেন। হারটাকে কখনো গলার কাছে কখনো বুকের ওপরে রেখে, ঘাড়টাকে কখনো ডাইনে কখনো বায়ে বাঁকিয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখতে লাগলেন হারটা তার গলায় কেমন মানাবে—মুখে চোখে তাঁর তখন একটা রানী-রানী ভাব, বুঝি সত্যি তিনি হার পরে রাজেন্দ্রাণী হয়ে যাবেন। এদিকে মারগারেটের যেন আর তর সইছিল না, সে অধৈর্য হয়ে মাসির পেছনে দাঁড়িয়ে কেবল উঁকিঝুঁকি মারছিল কতক্ষণে সে হারটা নিজের গলায় পরবে।

—নে পরে ছাখ হারটা তোকে কেমন মানায়, এতক্ষণে মারথা হার পরার লোভ সামলে মারগারেটের হাতে দিল হারটা।

আর মারগারেট মুহূর্ত দেরি না করে হারটাকে গলিয়ে দিল গলায়। উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছিল, দুপ্‌দুপ্‌ করছিল, বুক, সর্বাঙ্গ জুড়ে একটা

অস্থিরতা তাকে মাতাল করে তুলেছিল, হার পরে আরশির দিকে তাকাতে তার দম বন্ধ হয়ে এল। মুগ্ধ হয়ে অপলক ক'মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল, আহ্, কী সুন্দর, কী সুন্দর।

মুগ্ধতার এই স্বর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা ছবি হয়ে ফুটে উঠল, তার রাজপুত্রের ছবি, এই হার তার গলায় দেখে 'রাজপুত্র' কতখানি খুশী হবে চিন্তা করতে সে চোখ বুজল। চিন্তাটা তার রক্তে প্রবল ঢেউ হয়ে তার পা থেকে মাথা অবধি দারুণ নাড়া দিয়ে গেল, একযোগে তার শরীর মন একটা সুখের শিহরণে থরথরিয়ে উঠল। ইস্টারের এই পবিত্র দিনটি তার জন্যে এত আনন্দ নিয়ে আসবে এ যে তার কল্পনার অতীত, স্বপ্নেরও অগোচর। অথৈ সুখে ভাসতে ভাসতে ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ নিজেকে নিজের মধ্যে সে নতুন করে আবিষ্কার করল। তার মধ্যে আর এক মারগারেটের আর্বিভাব ঘটেছে, নিজেকে একটা জ্বলন্ত শিখার মতন মনে হল তার। মনে হল তার, সে যেন সেই মানুষটি আর নেই আর একজন আর কেউ হয়ে গেছে সে, অদ্ভুত এক অজানা অনুভূতিতে, এক অতি নিজস্ব অনুভূতিতে, সে নতুন হয়ে উঠেছে। নতুন সেই অভাবনীয়ের আবির্ভাবকে নিজের সর্বাঙ্গে দেখার জন্যে চোখ খুলল সে—সেই চোখ সেই মুখ সেই লাবণ্য মসৃণ ত্বকের সেই বিভা অথচ তার ভিতরে যে মানুষটি সে-যেন আর সেই মানুষটি নেই। পাথর চাপা উৎসের মতন প্রবল বেগে সে উৎসারিত হতে চাইছে। ঝরণা হয়ে বয়ে যেতে চাইছে সে—সব ডুবিয়ে ভাসিয়ে উত্তাল হয়ে উঠতে চাইছে, সে যে কী চাইছে কিছুই বুঝছে না।

বাচ্চার দল তখন দরজার বাইরে এসে জড় হয়েছে। চিৎকার করে ডাকছে, মারগারেট, মারগারেট।

—আসছি, আসছি। যেন ওই সাড়া দেবার মধ্যেই সব আবেগ ঢেলে দিতে চাইল মারগারেট, এমন প্রাণপণ চিৎকার করে উঠল সে।

ছেলের দল তাকে পেয়ে পাগল হয়ে উঠল। তাকে ঘিরে নাচতে থাকল তারা। সূর্যের আলোয় মারগারেটের আবেগ-তপ্ত ত্বকের লাবণ্য আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বসন্তের ফুর ফুরে হাওয়ায় তার গতি-চঞ্চল শরীর কচি পাতার মতন থরথর করছে—মারগারেট হঠাৎ যেন বনদেবী হয়ে গেছে। বনদেবীর মতনই বাতাসের মতন হাল্কা হয়ে গেছে মারগারেট; বাচ্চাদের সঙ্গে সে যেন হাওয়ায় ফুলের পাঁপড়ির মতন উড়ে চলেছে বনের ছায়ার দিকে। বনচ্ছায়ার তৃণাঞ্চলে শিল্পীর আঁকা নক্সার মতন সেখানে ফুটে আছে ডেইজি, বাটার কাপ।

আধঘণ্টাও কাটে নি। মারগারেটের এই আকস্মিক পরিবর্তনে হতবাক মারথা তখনও তাঁর বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কেবলই ভাবছেন—কী কাণ্ড! কী হল মেয়েটার, কেমন করে হল। তাঁর সেই আচ্ছন্ন চিন্তায় বাধা দিল একটা গম্ভীর নরম স্বর। তিনি মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল দরজার ফ্রেমে আঁকা একটি কালো মুখ। মুখে অনুগ্রহ বিলানোর হাসি। তার কালো শিরোস্ত্রাণ থেকে ঝুলছে লম্বা একটা লাল পালক। দু'জনে চোখাচোখি হতে এবার মুখের মালিক ঘরে ঢুকল। তার কালো পোশাকের ওপরে রয়েছে পৃষ্ঠাবরণী। তাতে লাল পাড় বসানো।

—ক্ষমা করবেন সুন্দরী বনদেবী, আমি শ্রীমতী মারথাকে খুঁজছি, সে বলল।

সম্বোধন শুনেই গলে গিয়েছিল মারথার মন তিনি একটা কটাক্ষ হেনে বললেন —আমিই মারথা, আমাকে শ্রীমতী বললেন বটে, তা আমি কিন্তু আর বিয়ে করি নি, আমার হতভাগ্য স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে আমি একাই আছি।

—এমন একজন সুন্দরীর সান্নিধ্যে আসতে পেরে নিজেকে আমি তা হলে ভাগ্যবান মনে করতে পারি, কী বলেন! আমি শ্রীমতী মারথার জন্যে একটা উপহার এনেছি, উপহারটা তবে আপনারই, এই নিন। সে তার আলখাল্লার পকেট থেকে সোনার গোটা গোটা মোহর গেঁথে তৈরি একটা ভারি হার বের করল। বললে, লম্বারডিতে আপনার মাসতুত ভাই আছে না, সে-ই আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্যে এটা দিয়েছে আমার হাতে। হারটা সে এমনভাবে দু'হাতে ধরে রাখল যেন সে নিজেই মারথার গলায় হারটা পরিয়ে দিতে চায়।

মারথার তখন চোখ ভরা হতাশা, বললে, কিন্তু লম্বারডিতে ত কোন...বলতে বলতেই তিনি মাঝখানে থেমে গেলেন লোভের দু'হাত বাড়িয়ে ঝট্ করে তার হাত থেকে হারটা কেড়ে নিলেন। দৌড়ে গিয়ে আরশির সামনে দাঁড়ালেন তিনি। মুগ্ধতার নানা নিরর্থক শব্দ বেরুতে থাকল তাঁর মুখ থেকে। নিজের সৌন্দর্যের দর্পণে কিছুক্ষণ এভাবে ডুবে থেকে মারথা বললেন—অনেকদিন, হয়ত কয়েক বছর আমার সে খোঁজই নেয় নি, আমার এই কী যেন——যাক্, হাঁ এতদিন পরে এখন তার ছোট্ট মারথাকে মনে পড়েছে।...কিন্তু কি কাণ্ড দেখুন, আপনাকে এখনো বসতেই বলিনি, বসুন বসুন, আসুন দু'জনে আমরা একটু মদ্য পান করি।

মানুষটির মুখে তখন নিদারুণ ভয় ফুটে উঠেছে। নিষেধের ভঙ্গিতে সে একটা হাত শূন্যে তুলে ধরেছে। বলেছে—মদ! না না, ও আমি কস্মিনকালেও স্পর্শ করি নি। তবে হাঁ, সুন্দরী, আপনি যদি অনুমতি দেন ত আপনার জন্যে একটা

ককটেল তৈরি করে দিই আমি। এবং অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে কাবার্ডের কাছে গেল, কী করে যেন সে জেনেছে ওখানে আছে নানা ধরণের দেশী বিদেশী মদ। দক্ষ হাতে সে সেই নানা প্রকারের মদ থেকে অল্প বিস্তর ঢালল একটা বড় পাত্রে তারপর পাত্রের মুখে হাতের তেলো চেপে খুব ঝাঁকাতে থাকল। বললে, আমি এই মদ মেশানোর কায়দাটা আয়ত্ত করেছি পাডুয়াতে থাকতে। সে পাত্রটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। কাচের পাত্রের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রবল বেগে তলা থেকে উপর দিকে বুদ বুদ উঠছে, ফেনায় ফেনায় ভরে যাচ্ছে পাত্রের মুখ। দেখতে দেখতে লুব্ধ হয়ে উঠলেন মারথা, পাত্রটা ধরতে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

পাডুয়ার এই চমৎকার ককটেল খেতে আমার বড় সাধ হয়েছে, তিনি বিলোল চোখে চেয়ে আদুরে গলায় বললেন পুরুষটিকে। পুরুষ তাকে বাধা দেওয়ার ভান করল কিন্তু নারী বাধা মানলেন না, তিনি গ্লাস তুলে নিয়ে বড় এক ঢোক গিলে ফেললেন। কিন্তু মুহূর্ত যেতে না যেতে তিনি কাশতে শুরু করলেন, তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। বাতাসের জন্যে তিনি শূন্যে হাত ছুঁড়ে হাঁকপাঁক করতে থাকলেন। তাঁর চোখ দুটো যন্ত্রণায় বড় হয়ে উঠল যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। তাঁর ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল তাঁর শরীরের মধ্যে কোথাও বোলতার বাসা ছিল। খোঁচা খেয়ে এখন সেই বোলতাগুলি রেগেমেগে ঝাঁক বেঁধে তাঁকে কামড়াতে স্নরু করেছে। মেফিস্টো তাঁকে দেখছিল। শয়তানীর আনন্দে চোখ দুটো চকচক করছিল তার।

একটু পরেই একটা পরিবর্তন এল মারথার মধ্যে। কাশিটা থেমে গেল। স্নায়ুর খেঁচুনিটাও আর রইল না। তাঁর চোখে পুরুষটির প্রতি যে নীরব তিরস্কার আর ক্রোধ ফুটে উঠেছিল তাও মিলিয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল প্রণয়ের গভীর আবেশ, আবেগ। তিনি থেকে থেকে বড় বড় শ্বাস ছাড়ছিলেন আর আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলোচ্ছিলেন এবার তিনি ঝুয়ে পড়লেন পুরুষটির দিকে। তার চোখে চোখ রাখলেন।

বললেন, উঃ কি সর্বনেশে চোখ গো তোমার।

—হাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু আর বসব না এখন। আমি এখন আমার বন্ধুর কাছে যাব। ওই যে, সে দাঁড়িয়ে আছে। মেফিস্টো বনের মধ্যেকার ফাঁকা জায়গাটা দেখাল।

মারথা চোখ তুলতেই একটি সুদর্শন পুরুষ তাঁর চোখে পড়ল। পরদেশী

পোশাক-পরা মানুষটি একটা প্রাচীন ওক গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটি হাত তার মাথার পেছনে আর একটি হাত বুকের ওপরে। সে মারগারেটের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ঘাড় ফিরছে না। এতটুকু নড়ছে না সে; বুঝি চোখেও পলক পড়ছে না তার। মারগারেট ছেলের দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে ছেলের দল নাচছে আর গান গাইছে। পুরুষটি ছায়ার আড়াল থেকে দেখছে; মারগারেট তার উপস্থিতি টেরও পায় নি তখনও।

—ওই আমার বন্ধু। মানুষটি খুব সুন্দর, না? জান, উনি হচ্ছেন একজন রাজপুত্র। অতিশয় বিখ্যাত রাজবংশের ছেলে। দেখছ? ওই রূপসী মেয়েটির দিকে তিনি কি রকম মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ওঁর একটি পাত্রী চাই। পাত্রীর খোঁজেই বেরিয়েছেন তিনি। সুতরাং…

—মেয়েটি আমার ভাগ্নী, দারুণ চমৎকার মেয়ে…।

—আপনার মতন মিষ্টি মহিলার ভাগ্নী! বাঃ, তাহলে ত কথাই নেই, আপনি আমার বন্ধুকে সাহায্য করতে পারেন। ওদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারেন আপনার বাড়িতে। ওদের দু'জনের মন জানাজানির পক্ষে এ বাড়িটি খুবই ভাল, শহরের এক টেরেতে; নির্জনে সকলের চোখের আড়ালে ওরা নিশ্চিন্তে মেলামেশা করতে পারবে কাকপক্ষীও জানবে না। সুতরাং নিন্দে ছড়ানোর ভয় নেই।

—রাজপুত্র, সত্যি সত্যি রাজপুত্র…মারথা মাঝখানে থেমে গেলেন। বিস্ময়ে আনন্দে তাঁর গলা দিয়ে আর স্বর ফুটল না।

মেফিস্টো বললে, তাহলে আশা করি তুমি ওদের সাহায্য করবে?

—ও-ও, নিশ্চয়। তাছাড়া তুমিও ত আসবে এখানে, আসবে না? একটা আগ্রহের কটাক্ষ স্থির রেখে মারথা ফিসফিস করে বললেন। বলতে বলতে মেফিস্টোর হাতে হাত বুলোতে থাকলেন।

—অবশ্যিই, আমিও অবশ্যি আসব। হাতটা মারথার হাত থেকে টেনে নিতে নিতে বিড়বিড় করে উঠল মেফিস্টো। তারপর লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকাল। মারথার পিঠের দিকে তাকিয়ে একটা ভেঙচি কাটল সে।

ফাউস্ট অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের সেই আনন্দমুখর খেলা

দেখলেন। তাঁর এই দীর্ঘ বিস্ময়ের জীবনে কত কাণ্ডই ত ঘটল—জাদুর দৌলতে অভাবিত ঐশ্বর্যের জাকজমক, রাজকীয় আড়ম্বর, ভোগ-সুখ রতিবিলাস—আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির বাকি কিছু নেই, ঘুরেছেন গোটা দুনিয়া, তার অতীত তার প্রাচীন যা-কিছু, জাদুর দৌলতে সব—সমস্তই দেখা হয়ে গেছে তাঁর : দুনিয়ার পরমতম সুন্দরতাকে দেখেছেন, মুখোমুখি হয়েছেন চরমতম অবিশ্বাস্যের, গিয়েছেন পৃথিবীর গোপনতম অঞ্চলে, রহস্যের গভীরে পা রেখেছেন ; কিন্তু আজ এখন যা দেখছেন এমন দৃশ্য বুঝি আর কখনো দেখেন নি, এত মুগ্ধও বুঝি তিনি হন নি আর কিছুতে।

তিনি যেন পরীর-দেশের একটুখানি দেখার সুযোগ পেয়েছেন : পান্নার মতন সবুজ নরম ঘাসের প্রান্তর ধীরে ধীরে বাঁক নিয়ে ছোট্ট উপত্যকাটির দিকে চলে গেছে। ওরা সেখানেই হৈ-চৈ করে নাচছিল। উপত্যকা জুড়ে নক্ষত্রের মতন ফুটে আছে ডেইজি-ফুল আর বাটারকাপ ; তাকে রূপোলি পাড়ের মতন ঘিরে আছে বার্চ আর পপলার—বসন্ত-বাতাসের মৃদু নিঃশ্বাসে গাছগুলি কাঁপছে থরথর করে। এ-সবের পেছনে সশস্ত্র প্রহরীর মতন বিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে ওক বৃক্ষের প্রাচীন অরণ্য, যেন এই পরীর দেশে পরীরানীর পাশে কোন অবাঞ্ছিত এসে ঢুকে না পায় তার জন্য তারা সর্বদা সতর্ক।

বাচ্চাদের কণ্ঠে রূপোলি ঘন্টির স্বর, গলায় ডেইজি ফুলের মালা হাতে হাত ধরে তারা মারগারেটকে ঘিরে নাচছে, গাইছে কলরব করছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন বনের ডানাঅলা পরীদের শিশুরা সব। বিপদের এতটুকু আশঙ্কা টের পেলে মুহূর্তে তাদের নিরাপদ আশ্রয় গাছের ডালে ডালে অদৃশ্য হয়ে যাবে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মারগারেট। যে-কোন মুহূর্তে কিছু একটা করার জন্যে তৈরি, সর্বাঙ্গের ভঙ্গিতে সেই সতর্কতা। চোখ দুটি চকচক্ করছে, কৌতুকে কৌতূহলে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখের মণি। গাল দুটি লাল টুকটুক করছে, যৌবনের জোয়ারে আর খেলার আনন্দে ঝকঝক করছে ত্বকের বিভা। তার পরনে সাদা নরম গাউন। তার মসৃণতার ওপরে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে ঘাসের উজ্জ্বল সবুজ ছায়া। হাওয়ায় থেকে থেকে ফুলে ফেঁপে উঠছে গাউন কিন্তু তার কুমারী শরীরের মোহ কাটিয়ে উড়ে যেতে পারছে না, পরম আশ্লেষে সংলগ্ন হয়ে আছে তার শরীর। তন্বীর সুঠাম টানটান লঘু শরীরে এক অলৌকিক আলোর লাবণ্য টলটল করছে। যেন বনদেবী। যেন এই ফুল ঘাস অরণ্য নীলিমার সম্রাজ্ঞী সে।

তারা ফুলের খেলা খেলছিল। এই বনাঞ্চলে, এই একই খেলা কিছু রদ বদল করে হাজার বছর ধরে খেলে আসছে ছেলেমেয়েরা। ছেলেমেয়েদের গলায় থাকে ফুলের মালা বুকে ফুলের গুচ্ছ। তারা হাত ধরাধরি করে তাদের একজনকে মধ্যমণি করে তাকে ঘিরে ঘিরে ঘুরতে থাকে। মধ্যমণির হাতে থাকে একগাছি মালা। গান শেষ হলে বৃত্ত ভেঙে যায়; সবাই গা ঢাকা দেয় আশেপাশে। ওই মধ্যমণি তাদের খুঁজতে থাকে, যাকে খুঁজে পায় তার গলায় হাতের ফুল-হার পরিয়ে দিয়ে তাকে রাজা কিংবা রানী বানায় সে আবার মধ্যমণি হয় তখন। আবার নতুন করে খেলা শুরু হয়।

ফাউস্ট রুদ্ধ-শ্বাসে দেখছিলেন। তাঁর শ্বাস ফেলতে ভয় করছিল পাছে তাঁর পাপ-নিঃশ্বাসে এই স্বপ্নের ছবি মাকড়সার জালের মতন ছিঁড়ে যায়। তাঁর দৃষ্টি অপলক হয়েছিল মারগারেটের ওপরে। তিনি কেবল মারগারেটকেই দেখছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর পরবর্তী জীবনের যত অন্ধকার যত সংশয় সন্দেহ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর আবার করে ফিরে-পাওয়া যৌবনের যত আশা-আকাঙ্ক্ষা যত স্বপ্ন, যৌবনের যত উদ্যম উৎসাহ একটু একটু করে যেন পুনরায় ফিরে পাচ্ছিলেন তিনি। আগুনের শিখা যেমন করে সব পুড়িয়ে পবিত্র করে; সোনাকে গলিয়ে নিখাদ করে—যেমন করে ফিরিয়ে দেয় তার দিব্য বিভা মারগারেটের নিষ্কলুষ রূপের দীপ্তি তেমনি করে নিষ্পাপ করছিল তাঁকে। তিনি যেন মারগারেটের সর্বপাপঘ্ন সারল্যের শিখা অনুভব করেছিলেন তাঁর সত্তায়, তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে যেন জ্বলছিল সে। তাঁর চিত্ত জুড়ে এতদিন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল যত সুখ-স্পৃহা, অসার আনন্দের লোভ উত্তেজনা ইন্দ্রিয়ের পুলক কেবল—সেই সব সমস্ত নোংরার জঞ্জাল পুড়ে পুড়ে যেন ভস্ম হয়ে গেল, আর সেই ভস্ম জুড়ে জ্বলজ্বল করতে থাকল অকলুষ এক পবিত্র দীধিতি।

হাতে হাত ধরে ছেলেমেয়েরা তখন মারগারেটকে ঘিরে মস্ত বলয়াকারে ঘুরে ঘুরে গাইছিল—

বরের জন্যে পুষ্প-গুচ্ছ
পুষ্প গুচ্ছ, পুষ্প গুচ্ছ
বরের জন্যে পুষ্প গুচ্ছ, কনের জন্যে মালা।
ভুবন আলা ভুবন আলা ভুবন আলা।

গানের কলি যেন ফুল হয়ে ফুটছে মারগারেটের ঠোঁটে, ফুলের মতন তাজা রং ধরেছে তার মুখে। গানের কথাগুলি যেন দৈববাণী বয়ে আনছে তার কানে, যেন

একটা দুঃসাহসের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে বলছে বারবার।

খেলার আইন অনুসারে মারগারেট এবার হাত দিয়ে তার চোখ ঢাকল। ছেলেমেয়েরা এখন নতুন গান ধরেছে :

খোঁজ তারে হেথায়, তারে খোঁজ খোঁজ হোথায়
পেলে তাকে মুকুট দিও মাথায়
মুকুট দেবে শান্তি দেবে সুখ।
খোঁজ তারে সে-জন গেল কোথায়॥

গান শেষ করে সকলে বাতাস কাঁপিয়ে কলরব করে উঠে চারধারে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ ওকগাছের গুঁড়ির আড়ালে কেউ পপলারের আঁধার ছায়ায় গা-ঢাকা দিল। মারগারেট তখনও তার হাতের অঞ্জলিতে মুখ ঢেকে আছে।

ফাউস্ট নিজের অজ্ঞাতেই অবোধ এক প্রেরণায় এগিয়ে এলেন তার সামনে। এত কাছে থেকে দেখেন নি কখনো তিনি তাঁকে। তাঁর চোখ বিস্ফারিত হল, মুখে ফুটে উঠল শরণাগতি। মারগারেট তখনও চোখ টিপে ধরে আছে তার দু'হাতে। সে কিছুই জানতে পারে নি। খেলার নিয়ম অনুসারে চোখ বুজে খুঁজতে হবে। হাতে মালা আর চোখে অন্ধকার নিয়ে তাই মারগারেট পা বাড়িয়েছিল। দু'পা এগোতেই ফাউস্টের গায়ে তার হাত লেগে গেল। খেলার উত্তেজনায় মারগারেট চিৎকার করে উঠল—পেয়েছি, পেয়েছি, এই যে ধরে ফেলেছি। দেখি কার গলায় মালা দিচ্ছি আমি, বলে মারগারেট চোখ মেলেই অবাক। বিস্ময়ে তার চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসার অবস্থা। অবাস্তব অসম্ভব কিছু যেন তার সামনে—অস্বীকার করতে পারছে না, আবার স্বীকার করতেও ভয় করছে; একটা তীব্র আনন্দ ও আশঙ্কা একসঙ্গে তাকে গ্রাস করে ফেলল। কিন্তু চেতনাকে অভিভূত হতে দিলে না সে। সে ফাউস্টের কনুই ধরেছিল এবার বাহুতে চাপ দিল—পরখ করতে চাইল মানুষটা সত্যি মাংসের কিংবা মায়া—তার উত্তেজিত মস্তিষ্কের প্রতারণা কেবল। কিন্তু বাহুতে আলতো চাপ দিতেই একটা শক্ত পেশীর উত্তাপ তার সারা শরীর শিহরিত করে বয়ে গেল। মায়া নয় মিথ্যে নয় অবশেষে সত্যি সত্যি সে তার মনের মানুষের একেবারে কাছটিতে আসতে পেরেছে। এই সেই মানুষটি যে অকস্মাৎ তাকে আবৃত করে ফেলেছে একটা অজানা জীবন-বোধের আবেগে, অবশ করে দিয়েছে এমন ভালবাসায় যা সে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে জানত না বুঝত না। লাল হয়ে উঠল মারগারেটের মুখ, বুক দুর্‌দুর্‌ করতে থাকল। হাতটা শিথিল হয়ে নেমে এল তাঁর কনুই থেকে

আঙুলে আঙুলের স্পর্শ লাগল, সেই মগ্ন-চেতনায় আঙুলের পলকের আদরে সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল মারগারেটের ; সে কী এক ভয়ে হাত টেনে নিল তাঁর হাত থেকে। কিন্তু ফাউস্ট ছাড়লেন না, দু'হাতে তার দুটো হাত মুঠোয় পুরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন তার পায়ের কাছে, মাথা হেঁট করে মৃদু স্বরে বললেন,

—তোমার মালা মুকুট করে তবে আমার মাথায় পরিয়ে দাও।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল কুমারী, জলোচ্ছ্বাসের মতন একটা আবেগ কান্না হয়ে ভেঙে পড়ল তার শরীরে, কেঁপে উঠল মারগারেট তারপর আস্তে নত হয়ে ফুলের মালা মুকুট করে পরিয়ে দিল নতজানু মানুষটির মাথায়। দ্বিধামুক্ত এক অসীম বিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মারগারেটের চোখ দুটি, নির্মল সুখে সদ্য ফোটা সকালের ফুলের মতন আন্দোলিত হয়ে উঠছে তার শরীর। ফাউস্ট অতি সন্তর্পণে তার হাতে চুমু খেলেন, হাতখানাকে চেপে রাখলেন গালে।

ততক্ষণে ছেলের দল হাতে হাত বেঁধে তাদের ঘিরে বৃত্ত রচনা করেছে। এবার তারা প্রাণপণ চিৎকার করে গান ধরল ও দু'জনকে বেষ্টন করে নাচতে থাকল। আস্তে আস্তে তারা গানের শেষ কলিতে এল যেখানে এই খুঁদে প্রজাবৃন্দ স্বীকৃতি জানাচ্ছে তাদের এই রাজা বদলের।

এক দুই তিন, শেষ হল চুক্তি
তোমায় দিলেম মুক্তি
এল নতুন রাজা
তাকে মনের মত সাজা

পলকের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন নতজানু ফাউস্ট। দু'হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন মারগারেটকে। নক্ষত্র-উজ্জ্বল চোখ দুটি রাখলেন তার চোখে। চোখের গভীরে তাকালেন। নম্র আলোর মতন স্নিগ্ধ সেই চোখের নির্মল গভীরে টলটল করছে পরম বিশ্বাস আর অকৃত্রিম সারল্য—সেই অনাবিল আলোর জলে নিজের আবেগের প্রতিবিম্বও দেখতে পেলেন ফাউস্ট। দেখতে পেলেন ভালবাসার দুর্লভ এক হোমশিখা। তাঁর বুকের যত ভয়-ভীতি-সংশয়-সন্দেহ নিমেষে সেই আগুনে ছাই হয়ে গেল। প্রবল আবেগে অথচ পাছে ব্যথা পায় সেই সুবিবেচনায় ফুলের মতন নরম ছোঁয়ায় ফাউস্ট চুমু খেলেন মারগারেটের ঠোঁটে। অনাঘ্রাতা কুমারীর এই প্রথম ভালবাসার অভিজ্ঞতা। সেই প্রথম অভিজ্ঞতাই শেষ অভিজ্ঞতার মতন তার সমস্ত সত্তা জুড়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করে দিল মহীরুহের ঘন ছায়ার মতন এবং সেই মুহূর্তেই মারগারেট তার

হৃদয়-মন সর্বস্ব অঞ্জলি দিল তাঁর ভালবাসার পায়—শরীর? তা সে কিঞ্চিৎ বাধা দিল বটে কিন্তু সেই প্রতিরোধ প্রবল জলোচ্ছ্বাসের চাপে বালির বাঁধের মতনই অবিলম্বে ভেসে চলে গেল। কিন্তু এভাবে হঠাৎ সর্বস্ব খুয়োলে মানুষের যা হয়—মারগারেট হাঁপিয়ে উঠল যেন বুকের সবটুকু হাওয়া ফুরিয়ে গেছে তার, আয়ত চোখ বিস্ফারিত হয়েছে, মুখের লাবণ্য শিখা হয়ে জ্বলছে। অসহ্য পুলকে কন্টকিত আর অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিত সে নিজেকে সবলে ফাউস্টের বুক থেকে ছিন্ন করে আলোকিত সবুজের বেয়াবরু সমতল থেকে ওক অরণ্যের ছায়ার গভীরে নিজেকে আড়াল করতে প্রাণপণে দৌড়দিল। ছেলের দলও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। এটাকেও খেলার একটা অংশ ভেবে তারা হৈ চৈ করে আনন্দে নাচতে থাকল।

ফাউস্টও ছুটলেন মারগারেটের পেছনে। পাহাড়ী জমির চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ছুটছেন দুজন। ধাবমান একটা শুভ্র শিখার মতন দেখা যাচ্ছে মারগারেটকে। কখনো সেই শিখা পাহাড়ের ঢালুতে, গাছের আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে কখনো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে উৎরাইতে, খোলা আকাশের নিচে—ফাউস্ট সেই শিখা লক্ষ্য করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছেন, ওই যেন তার প্রাণ-শিখা, বুকে ধরে রাখতে না পারলে এক্ষুনি তিনি মরে যাবেন। মারগারেট ছুটছে যেন নিজেরই মধ্যে কার কোন নির্মম তাড়ায়। তার দ্বিধাবিভক্ত সত্তার এক অংশ যেন আর এক অংশকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে—নিজের মধ্যেকার একটা অপরিচিত একেবারে আনকোরা বোধ রমণীয় একটা ভয়ের স্বপ্ন হয়ে যেন তাড়া করছে তাকে, স্বপ্নটাকে ভাল লাগছে অথচ অপরিচিত বলে এবং সে তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলতে চাইছে বলেই যেন তার ভয়—সেই ভয় থেকে পালাতে প্রাণপণ ছুটছে মারগারেট।

অবশেষে পপলারের এক ঘন ঝাড়ের মধ্যে মারগারেটকে ধরে ফেললেন ফাউস্ট।

—মারগারেট, মারগারেট, হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলেন ফাউস্ট, বিনীত মিনতি জানিয়ে বললেন, তুমি আমার কাছ থেকে কেন এমন করে পালাচ্ছ? আমি ত সারাজীবন তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি, মারগারেট। অবশেষে তোমাকে যখন পেলাম তখন তুমি কিনা আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছ! দাঁড়াও, মারগারেট দাঁড়াও!

মারগারেট দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মারগারেট শুনছিল ফাউস্টের মিনতি-করুণ

আবেদন। রক্তোচ্ছ্বাসে তার মুখ টুকটুক্ করছে, একটা অজানা আবেগে থরথর কাঁপছে সে। সেই অজানা আবেগের তাড়নাতেই যেন স্বতঃস্ফূর্ত তার দু'বাহু প্রসারিত হল, দু'চোখ ছাপিয়ে কান্না নেমে এল গাল বেয়ে, রক্তের উত্তাপে দপ্ দপ্ করতে থাকল গাল, নিঃশ্বাসের মতন অস্পষ্ট স্বর স্ফুরিত হল তার ঠোঁটে —দু'হাতে সে জড়িয়ে ধরল ফাউস্টকে। ফাউস্টও তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন, পিষে ফেলতে লাগলেন তাকে বুকের মধ্যে, চুমোয় চুমোয় তাকে রুদ্ধশ্বাস করে ফেললেন।

ফিসফিস্ করে বললেন, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি তুমি মারগারেট, আমি তোমাকে ভালবাসি।

যে-মালা মুকুট করে পরিয়ে দিয়েছিল মারগারেট ফাউস্টের মাথায় সে-মালা এবার তিনি মারগারেটের গলায় পরিয়ে দিলেন—বললেন, আমি তোমাকে অভিষিক্ত করলাম মারগারেট, তুমি আমার রানী।

—আর তুমি, তুমি হলে আমার রাজা, নিঃশ্বাসের স্বরে বলল মারগারেট, আমি তোমাকে ভালবাসি। তারপর সবলে ফাউস্টের মাথাটা নিজের বুকের গভীরে চেপে ধরল, নরম ঠোঁটে পরম মমতায় চুমু খেল তাঁকে। তার অশ্রু টৈটম্বুর চোখের মণিতে ফুটে উঠল স্মিত হাসির চকমকি, সত্তা নিংড়ানো এক নিবিড় আনন্দে সর্বাঙ্গে দিব্য শিখার মতন জ্বলতে থাকল মারগারেট।

আমি তোমাকে ভালবাসি, মর্মরিত হয়ে উঠল ফাউস্টের স্বর, আমি আমার সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি মারগারেট। তুমি যে আমার কী আর কতখানি তা তুমি তোমার অতিবড় কল্পনায়ও অনুমান করতে পারবে না। তুমি আমার মধ্যে সঞ্চার করেছ আশা, নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি। আমি তোমার, ওগো আমার প্রিয়, আমি চিরদিনের জন্যে কেবল তোমারই।

১৫

তখন বেশ রাত। আলো-ঝিক্‌মিক রোডা শহরকে দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন জ্বলজ্বলে সুন্দর একটি খেলনা। অবশ্য রাত বেশী হলেও রাস্তা তখনো একেবারে নির্জন হয়ে যায় নি। মাঝেমধ্যে দু'চারজন পথচারী যাতায়াত করছিল। আর সরাইখানা, সরাবখানাগুলিও ছিল জমজমাট। পথ চলতে

চলতে মানুষ শুনতে পাচ্ছিল কোথাও কেউ হঠাৎ গলা-ছেড়ে গান গেয়ে উঠছে, কোথাও কারা সব গলা ফাটিয়ে তর্ক করছে।

মারগারেটের পাড়াটা এখন একেবারে নিঝুম ; অন্ধকারও সেখানে বেশ ঘন হয়ে জমে আছে। হয়ত পাড়ার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তাই আলো নেই কোথাও। কেবল মারগারেটের শোবার ঘরেই একটা ঢাকনা-দেওয়া আলো জ্বলছে। সে-চাপা আলোর রশ্মি অন্ধকার ভেঙে এসে রাস্তায়, রাস্তার পাশের দেয়ালে আছড়ে পড়েছে। সেই আলোকিত জায়গাটাকে মনে হচ্ছে যেন একটা কালো কাপড়ে ফর্সা কাপড়ের মস্ত একটা তাপ্পি। তারই অদূরে রাস্তার ওপরে, আলোর থামের ছায়ায় দু'বাহু বুকে ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছিলেন ফাউস্ট। তাঁর নিবদ্ধ-দৃষ্টি মারগারেটের আলোকিত জানলার ওপরে অপলক হয়ে আছে। জানলার পর্দায় একটা ছায়া আস্তে ধীরে এপাশে ওপাশে নড়ছে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই ছায়া অনুসরণ করে নড়ছে কেবল তাঁর চোখের জুটি মণি।

ফাউস্টের কাঁধের কাছে মেফিস্টোও দাঁড়িয়ে ছিল। অধৈর্য হয়ে উঠে এবার সে তাঁর শান্ত সমাহিত মনটাকে বিদ্রূপে ব্যস্ত করে তুলল। কীসের ভয় তোমার ফাউস্ট ? মেয়েটাতো নিজেই তোমার পথে আলো জ্বেলে রেখেছে।

বিরক্ত ফাউস্ট ভীষণ রেগে উঠে বললেন, তোমাকে নাক গলাতে হবে না, পাপ কোথাকার, তুমি দয়া করে চুপ থাক। ও মেয়ে এক দিব্য আলো, এত পবিত্র যে তোমার চিন্তাও ওকে স্পর্শ করতে পারবে না। কোন ক্ষতি করতে পারবে না তুমি মারগারেটের।

ধমক খেয়ে মেফিস্টো হাসল বটে কিন্তু বড় মিয়নো সে-হাসি। অহংকারে পুলকিত হওয়ার ব্যাপারটা যেন নেই। যেন কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব। ফাউস্টের দিকে তাকাল সে। তার সতর্ক দৃষ্টিতে ক্রূর কটাক্ষ, বলল, ও-মেয়েটার ক্ষতি করতে যাব কেন আমি। ও ত তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু তুমি বড্ড হ্যাংলা প্রেমিক ফাউস্ট। আজ তিনদিন ধরে মেয়েটার মাসির বাড়িতে গোপনে তোমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে, খুব জমিয়ে প্রেম করছ সেখানে তারপরেও দেখছি হা-পিত্যেস করে তাকিয়ে আছ তার দিকে যেন জন্মে দেখনি এমন মেয়ে।

রাগে ফেটে পড়লেন এবার ফাউস্ট। ঘুরে দাঁড়ালেন তার দিকে, মুখ সামলে কথা বল, মারগারেট আমার কাছে পরম পবিত্র জিনিস। তার নিষ্পাপ

সারল্য আমার শান্তির পথে সেতু। তোমার হাসি-মসকরা আমি জন্মের মত থামিয়ে দেব। আমি মারগারেটকে বিয়ে করব।

—বটে, তাই বুঝি, ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বলল মেফিস্টো, তা তুমি কি গির্জায় ঢুকতে পারবে? পাদ্রী যখন তোমার সামনে ক্রুশ তুলে ধরবে, তাকাতে পারবে সেই ক্রুশের দিকে? বেদীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বাইবেলের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারবে ত, পারবে ত আশীর্বাদ নিতে? উঁহু, পারবে না। বলত কবে থেকে পারছ না?

—ওঃ, তুমি, মেফিস্টো! চিৎকার করে উঠে হতাশায় ভেঙে পড়লেন ফাউস্ট, তাঁর গলা থেকে কাতর যন্ত্রণার বিলাপ বেরিয়ে এল, শয়তান, তুমি কী সাংঘাতিক জালে আটকে ফেলেছ আমাকে, তোমার দেওয়া সমস্ত উপহার কী নিদারুণ অভিশাপ হয়েউঠল আমার,—যৌবন, যৌবন দিয়েছে আমাকে, আহ্‌ কী অভিশপ্ত যৌবন! বুক খালি করে বড় একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর। নৈরাশ্যে আত্মিক-উদ্বেগে বিষণ্ণ মলিন হয়ে গেলেন তিনি।

তবু চিৎকার করে বলে উঠলেন, আমার মারগারেটকে আমি আর একবার দেখতে চাই; আর একবার। আর একবার আমি তার জীবন-দায়িনী মিষ্টি মুখখানি দেখব, হয়ত এই শেষবার, তবু শেষবারের মতন আর একবার আমি দেখবই, আমি দেখব।

বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, মেফিস্টোর গলায় ব্যঙ্গ ও আনুগত্য ফুটে উঠল এক সঙ্গে, বলল, যাই ওর ভাইটাকে ততক্ষণ কোথাও কোন কিছুতে ব্যস্ত নিযুক্ত রাখি। মেফিস্টো মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ফাউস্ট মারগারেটের জানায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ধীরে ধীরে রাস্তা পার হলেন. পার হতে হতে দুহাতের আঙুলগুলিকে আবেগে, উদ্বেগে, আকাঙ্ক্ষায় ক্রমাগত পিষ্ট করতে থাকলেন।

মারগারেটের বড় ছায়াটা জানলার কাছে এগিয়ে আসছিল তখন, ক্রমশ ছোট হয়ে আসছিল ছায়া, অবশেষে তার ছায়া-শরীরটা পর্দায় অস্পষ্ট অবয়বে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। জানালার পাল্লা দু'টো সরে গেল ভেতর দিকে, হাট খুলে গেল জানলা, পর্দা সরে গেল, এবার পরিপূর্ণ রূপ নিল মারগারেটের শরীর। মারগারেট জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে, স্বপ্নমগ্ন দুই আয়ত চোখ মেলে দিয়েছে অন্ধকার আকাশে, তারার মালা দেখছে মারগারেট। ফাউস্ট দু'পলক দ্বিধা করলেন, তারপরই বেড়ালের মতন দ্রুত নিঃশব্দ পায় বারান্দার মাথায় উঠে

পড়লেন। তাঁর নিঃশ্বাস রুদ্ধ, চোখ অর্ধ নিমীলিত, তিনি মারগারেটের আত্মার ধ্যানে মগ্ন, মারগারেটের শরীর নয় আত্মাকেই যেন অবয়বিত দেখছিলেন ফাউস্ট, মৃদু মেদুর আলোয় এমনই রহস্যময় বায়বীয় দেখাচ্ছিল মারগারেটকে। অপলক দেখছিলেন তিনি। মারগারেট নিজেরই অজ্ঞাতে প্রশান্তির নরম একটা শ্বাস ফেলল বড় করে শেষে জানালা বন্ধ করে দিতে পাল্লা দু'টোর ওপরে হাত রাখল।

তখন একটা হাত অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে এসেছে। হাতটা আলতো করে ছুঁয়েছে মারগারেটের হাত। হাতখানা ধীরে ধীরে আদর বুলিয়ে দিতে থাকল মারগারেটের হাতে, মারগারেট একটা নিঃশ্বাসের মতন মৃদু স্বর ও শুনতে পেল, স্বর যেন তাকে স্বপ্নের ভাষায় ভালবাসার কথা শোনাচ্ছিল। এ রোমাঞ্চকর ঘটনা একটু বিব্রত সন্ত্রস্ত করল তাকে। যেন এতক্ষণ মারগারেট জেগে জেগে যে-স্বপ্ন দেখছিল এসব যেন তারই একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক অপরিহার্য অংশ। স্বভাবতই মারগারেট বিগত ক'দিনের ঘটনার জাল বুনছিল কল্পনায়, কল্পনায় নতুন করে প্রবেশ করেছিল সেই অরণ্যের কিনারায়, ডেইজি বাটারকাপ ফুলের সমারোহে আকীর্ণ পান্নার মতন সবুজ তৃণাস্তীর্ণ মাঠে...তার রাজপুত্রের আলিঙ্গন থেকে ভীত হরিণীর মত উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছিল সে, ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলেছে তার রাজপুত্র......তারপরে পর পর ক'দিন ধরে মাসির নির্জন বাগানে দু'জনের নিভৃত সাক্ষাৎকার। চোখ বুজে মনের মধ্যে এতক্ষণ সে অতীতের যে দৃশ্যগুলির পুনরাবৃত্তি করছিল ধ্যানের মধ্যে, এখন চোখ মেলে দেখল সেই ধ্যানের সামগ্রীই আলোকিত হাত হয়ে তাকে স্পর্শ করেছে, তবে কেন সে ভয় পাবে সন্ত্রস্ত হবে বরং সে এখন সেই হাতখানিতে তার ঠোঁটের স্পর্শ রাখতে মনে মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করতে লাগল। এই হাত কয়েক ঘণ্টা আগে তার হাত স্পর্শ করেছে, মধুর গলায় এ হাতের মালিক বলেছেন—কী মিষ্টি হাত, কী নরম হাত! এ হাত আমাকে হতাশার অন্ধকার থেকে আশার সূর্য কিরণের জগতে নিয়ে যাবে। এখন সে হাতখানিই আবার হাত ধরেছে, তাকে আদর করছে। অন্ধকার পার হয়ে হাতের মালিক এসে দাঁড়িয়েছেন আলোয় : আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছেন তার চোখের দিকে।

নিঃশ্বাসের স্বরে ফাউস্ট বললেন—ওগো আমার প্রিয়, কী বিপুল আশায়ই না আমি তোমার চোখের দৃষ্টির অমলিন প্রীতির প্রার্থনা করছি অনুক্ষণ। ফাউস্ট আলতো ঠোঁটে চুমু খেলেন মারগারেটের আঙুলের ডগায়।

ওগো ফাউস্ট, আমার ফাউস্ট, মারগারেট পাতার শব্দের মতন মর্মরিত গলায় উচ্চারণ করল, ফাউস্টের হাতে একখানা হাত তার। অপর হাতখানা নিজের বুকে চেপে রেখে বলল—তোমার জন্যে আমার বুকের ভিতরটা কী ভীষণ আকুলই না হয়ে উঠেছে, তুমি কথা বললে, আমার বুকে সে স্বর গান হয়ে ওঠে, তুমি নিশ্বাস ফেললে সে বাতাস আমার বুকেদীপ্ত শিখায় লকলকিয়ে ওঠে, তোমার আদরের উষ্ণ তাপে আমার বুক গলতে থাকে বরফের মতন, আমি দুর্বল হয়ে যাই। তুমি আমার শীতার্ত বুকে তোমার স্পর্শের উত্তাপ হয়ে ওঠ, ওগো তুমি চিরকালের জন্যে আমার হাতখানি ধরে রাখ।

ফাউস্ট তার হাতের চেটোয় চুমু খেলেন, ঐকান্তিক মিনতির স্বরে বলে উঠলেন, আর তুমি তোমার এই হাতে ধরে রাখ ফউেস্টের জীবন।

হঠাৎ একটা উচ্ছ্বাসের টানে মারগারেটের বুক নিঃশ্বাসে আকণ্ঠ ভরে উঠল তারপর পরম অনিচ্ছায় আস্তে আস্তে তাঁর হাত থেকে হাত তুলে নিল সে। কিন্তু চোখ ফিরাতে পারল না। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বুকের মধ্যে উথাল পাথাল করছে একটা বিপুল আবেগ। কোন মতে নিজেকে সংযত করে অবশেষে সে জানলা বন্ধ করতে পাল্লা দুটো টেনে আনল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হে প্রিয় বিদায়, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। সে হাত নেড়ে তাঁকে চলে যেতে ইঙ্গিত করল।

ফাউস্টের বুক আচ্ছন্ন করে জমে উঠল ভয় : কয়েক মুহূর্ত মধ্যে এই জানালা বন্ধ হয়ে যাবে আর তিনি কোন দিন মারগারেটকে দেখতে পাবেন না, তার অর্থ তার ভিতরে যে দিব্য বিভা ছড়িয়ে পড়েছিল, যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল তাঁর মধ্যে সব সেই নিমেষে শেষ হয়ে যাবে জন্মের মতন। শেষবারের মতন আর একবার মারগারেটের সোণালি স্বর শুনবেন তিনি, শেষবারের মতন একটি চুম্বনে তার চিরন্তন-ভালবাসার শেষ চিহ্ন এঁকে দেবেন—তিনি চিৎকার করে উঠলেন, মারগারেট, চলে যেও না মারগারেট, মারগারেট তুমি আর একটু দাঁড়াও। তাঁর খেয়ালই নেই, তাঁর চিৎকারে মারগারেটের মা জেগে যেতে পারেন, কিংবা পথচারী কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। তিনি কাচের পাল্লায় জোরে চাপ দিলেন, মারগারেট আর তাঁর হাতের মাঝখানে পাতলা কাচের ব্যবধান তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল কতিপয় মুহূর্ত তারপরেই মারগারেটের দ্বিধা দুর্বল প্রতিরোধ ফাউস্টের প্রবল চাপের কাছে নতি স্বীকার করল, আস্তে আস্তে হাতের চাপ শিথিল হল মারগারেটের শেষে অকস্মাৎ হাট খুলে গেল পাল্লা দু'টো। ফাউস্ট

বাতাসের স্বরে আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন, আর একটি চুমু, মারগারেট বিদায় নেবার আগে তোমার হাতে আমার শেষ চুম্বন রেখে যেতে দাও।

মারগারেট হাত বাড়িয়ে দিল। ভীরু হাতটা তার মৃদু মৃদু কাঁপছিল, যেন মনে হচ্ছিল, ফাউস্টের প্রাণস্পর্শী কথা, তাঁর মিনতি-করুণ মুখ, তাঁর উজ্জ্বল চোখের তৃষিত দৃষ্টি সে হাত নেড়ে নেড়ে প্রাণপণে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে। ফাউস্ট তার হাত ধরে ফেলল, হাতখানা টেনে নিল তাঁর দিকে। নিজেকে সংবৃত করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে মারগারেট, বাধা দেবার শক্তি আর নেই তার—একটা তৃষিত আত্মার আকুল-মিনতি নিদারুণ উদ্বেগে যেন সহস্র কণ্ঠে হাহাকার করে তার বুকের কপাটে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল, সেই হাহাকারের করাঘাতে মূর্ছাহত মারগারেট ফাউস্টের আকর্ষণ প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে তার বাহুতে অবশ হয়ে পড়ল। তার চোখ নিমীলিত হল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। সে এক পরম ভাবের আবেশে অবসন্ন হয়ে থাকল ফাউস্টের বুকের ওপরে।

ফাউস্ট নিঃশ্বাসের স্বরে বলে উঠলেন—বিদায়, হে প্রিয়, বিদায়, ঈশ্বর তোমাকে পবিত্র রাখুন নির্মল রাখুন। বলতে বলতে ফাউস্ট তাকে আগ্রহে প্রবলভাবে বুকে চেপে রাখলেন, তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলেন—সে নিবিড় চুম্বনের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর লোলুপ বাসনা প্রবল নৈরাশ্য আর পরম আত্মনিবেদন।

মারগারেটের বাহু এতক্ষণ কণ্ঠলগ্ন হয়েছিল ফাউস্টের। ফাউস্ট তাকে চুমু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অবশ বাহু খসে পড়ল ফাউস্টের গলা থেকে। আশ্রয়চ্যুত একটা নরম লতার মতন ঝুলতে থাকল। মুখ হয়ে গেল নীল, যেন দেহে প্রাণ নেই। মনে হবে যেন ওই শেষ বিদায়ের চুম্বনের মধ্যে দিয়ে মারগারেট তার জীবনী শক্তির শেষবিন্দু অবধি ফাউস্টের মধ্যে সঞ্চালিত করে দিয়ে নিজে অবসাদে অচৈতন্য হয়ে গিয়েছে।

মারগারেটের মুখের দিকে তাকিয়ে ফাউস্ট ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি মারগারেটকে বুকের মধ্যে ধরে রেখেই জানলা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে নেমে এলেন তারপর খুব সন্তর্পণে তাকে পাঁজা কোলে তুলে এনে শুইয়ে দিলেন তার পবিত্র নির্মল ছোট্ট বিছানায়। খুঁজে পেতে ঘরের এক প্রান্ত থেকে জল নিয়ে এসে তার চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলেন, কপাল মুছে দিলেন আর ক্রমাগত ফিস্‌ফিস্‌ করে তার কানের কাছে তাকে নাম ধরে ডাকতে থাকলেন, তার হাতে হাত বুলোতে

থাকলেন আদর করতে থাকলেন। অনুক্ষণ একটা ভয় তাঁর হৃদপিণ্ডটাকে কেবলি মুচড়ে দিতে থাকল, কেবলই মনে হতে থাকল কার হাত ধরে যেন তিনি অন্ধকার পার হচ্ছিলেন, সে হঠাৎ তাঁকে ফেলে চলে গেছে আর অসহায় তিনি নিঃসঙ্গ একলা এক উষর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কেবল বাতাসের হা-হা শব্দ শুনছেন।

একটু পরেই শুক্‌নো বুকে জল এল, আর্ত বুকে সাহস ফিরে পেলেন ফাউস্ট। মারগারেটের চোখের পাতা তিরতির্ করে কেঁপে উঠল। ঠোঁট নড়তে থাকল অল্প অল্প মুখের নীল ভাবটা কেটে গিয়ে রক্তের মৃদু আভা ফুটে উঠল আবার, বুকের শক্ত চাপ ভাবটাও ক্রমে শিথিল হল। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে এতক্ষণে মারগারেট চোখ খুলল, প্রসারিত করে দিল তার দুই বাহু।

বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেফিস্টো মারগারেটের ঘরের জানলায় চোখ পেতে ছিল, সাফল্যের খুশীতে চোখ জ্বল জ্বল করছিল তার।

নিশুতি রাতের বাতাস নিঃসাড়। কেবল মারগারেটের ঘর থেকে তন্দ্রাগ্রস্ত মানুষের অব্যক্ত স্বর থেকে থেকে বাতাসে ঢেউ দিয়ে যাচ্ছিল। শেষে জানলার পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল শার্শির ওপরে টেনে দেওয়া হল পর্দা। গাঢ় অন্ধকার রাস্তায় ও দেয়ালে সাদা তাপ্পির মতন যে এবড়ো খেবড়ো আলোর বৃত্তটা লুটিয়েছিল এবার সেটি মিলিয়ে গেল।

শয়তানের রাজা মেফিস্টো আলস্য কাকে বলে জানে না। ফাউস্টকে মারগারেটের জানলার নিচে রেখে সেই যে সে চলে গিয়েছিল তারপরে এখন ফিরে আসা অবধি সে ছিল আরও বেশী কর্মব্যস্ত। মারগারেটের বাড়ি থেকে শহরের প্রায় আর এক প্রান্তে উবাখের সরাই খানা। ফাউস্ট যখন মারগারেটের ছায়ার দিকে তাকিয়ে তন্ময় তখন সেই সরাইখানায় পুরোদমে চলছিল গান আর মদ্যপানের মাইফেল। ফাউস্টকে রেখে সেই দিকেই গিয়েছিল মেফিস্টো। একজন বীর যোদ্ধার মতন সদর্পে পা ফেলতে ফেলতে সে এগিয়ে চলেছিল আর মনে মনে ভাবছিল :

আর একটা কড়া যোগ করতে হবে কর্তা, তাহলেই ফাউস্টকে অন্ধকারের জগতে চিরকালের জন্যে বন্দী করে রাখার যোগ্য শিকলটি তৈরি হয়ে যায়। তখন ওই যে ওই শ্রেষ্ঠ দেবদূত মাইকেল সেও তার আগুনে-তলোয়ার দিয়ে সে শিকল কাটতে

পারবে না, বিড়বিড় করতে করতে হিংসায়ঘৃণায় মেফিস্টোর কপাল কুঁচকে উঠল। সে কড়া আর কিছু নয় ওই জঘন্য মেয়েটার কাছ থেকে ফাউস্টকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এই শহর থেকেই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে দূরে, অনেক দূরে। ফাউস্টের মধ্যে পবিত্রতার আবির্ভাব হলে মেফিস্টোর পক্ষে সর্বনাশ। সুতরাং দিব্য আলোর বিরুদ্ধে বাজী জিততে ফাউস্টকে চাই একেবারে মুঠোর মধ্যে।

উবাখের শুঁড়িখানা এ অঞ্চলে ভীষণ বিখ্যাত। মাইল মাইল দূর থেকে মাতালের বাদশারা সব এখানে জড় হয়। বেড়ানো উপলক্ষে যারা শহরে আসে তারাও ভাল মদ খেতে চাইলে এখানেই আসে, আসে যারা মজা এবং মৌজ করতে চায়, চায় গলা ছেড়ে অশ্লীল গান গাইতে আর যে-কোন ছুঁতোয় ঝগড়া বাঁধিয়ে মার দাঙ্গা করতে। ছাত্ররাও আসে এখানে। আসে সৈন্যরা আর আসে মস্তানের দল, তারা মদ্যপানের ক্ষমতা আর দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধানোর যোগ্যতা অনুসারে মানপত্র দেয় নতুনদের, তাদের দলের সদস্যভুক্ত করে। উবাখের শুঁড়িখানার একটা বড় আকর্ষণ তার মাটির তলার ঘর। উঁচু খিলানঅলা চূণকাম করা সেই ঘরের দেয়ালের গায়ে গায়ে ছাদ অবধি সাজানো থাকে, থাকে থাকে সব বিশাল-বিশাল মদের পিপে। কোন কোন পিপা লম্বায় প্রায় বারো ফুট। টেবিলে টেবিলে পরিবেশন করা হয় ছোট ছোট পিপে আর বসবার জন্যে থাকে টুল অথবা আচাছা কাঠের হাতল শূন্য চেয়ার। কিন্তু ওখানে যারা যায় তাদের অধিকাংশই টুল চেয়ারের ধার ধারে না তারা পিপার গায়ে হেলান দিয়ে মেঝেয় পা টান করে বসতেই ভালবাসে, অনেকে আবার টুল কিংবা চেয়ারে পা রেখে পিপের গায়ে হেলান দিয়ে দুলতে ভালবাসে। ভালবাসে গ্যাজাতেও। গজ গজ করেই চলেছে সবাই। কোথাও কেউ হাঁটুর ওপরে হাত রেখে আধ বোজা চোখে দর্শন নিয়ে তর্ক বাধিয়েছে, কেউ রাজনীতি নিয়ে। কারো মুখে শোনা যাচ্ছে শিল্প বিজ্ঞানের কথা, কেউ বলে যাচ্ছে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ওর মধ্যেই আবার হাতা-হাতি মারামারিও চলছে, চলছে অশ্লীল মেয়ে-ঘটিত কেচ্ছা। এর মধ্যে হঠাৎ হয়ত কেউ গান জুড়ে দেয় আর সে গান যদি দলের সবাইর ভাল লেগে গেল তখন কথাটি নেই সকলেই সেই গানের ধুয়ায় গলা মিলিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়। ভূগর্ভের সেই রুদ্ধ গর্জন ছাদের গায়ের বাতাস চলাচলের পথ গলে রাস্তায় এসে পড়ে হাওয়ার ছড়িয়ে যায় অনেক দূর।

একটা পিপের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে একটি ছাত্র তখন-তখন গান বেঁধে গাইছিল। সেই স্বভাব-কবির গান সবে শেষ হয়েছে, মেফিস্টো ঠিক সেই সময়ে

এসে ঢুকল সেখানে। ছাত্রটি তার এক বন্ধুকে বিদ্রূপ করে গান বেঁধে গাইছিল ; গান শেষ হতেই একটা প্রচণ্ড হাসির ঝড় উঠল মস্ত ঘরটায়। হাঃ—হাঃ—হাঃ —সবাইকে ছাপিয়ে উঠল একজন দৈত্য মতন সৈনিকের অট্টহাসি—আচ্ছা দিয়েছ তুমি ক্রশ, ঠিক জায়গা মতন ঘা। বুঝলে সাইবেল তুমিই সেই মানুষটি যে সারারাত বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হা-পিত্তেশ করে মরেছ। আর সেই পাকা-দাড়ি বুড়োটা কিনা তোমার তাকে নিয়ে দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে হাঃ—হাঃ —হাঃ আর তাও কিনা তোমারই টাকায়—হাঃ হাঃ হাঃ কথা শেষ করে অসুর-সদৃশ সৈনিকটি আবার সিলিং ফাটা হাসি হেসে উঠল।

—বুঝলে ভালেনটিন, ছাত্রটির নাম সাইবেল, মুখে হাসির ছটা কিন্তু চোখ দু'টি বিষণ্ণ, বললে দুনিয়াদারির এই ত নিয়ম কেউ জন্মায় টাকা নিয়ে, কেউ জন্মায় সেই টাকা কেড়ে নিতে। কিন্তু আমি বলি মেয়ে জাতটার মধ্যে মহামারী লাগুক কারণ ওরা পুরুষের পক্ষে ঈশ্বরপ্রদত্ত সন্তাপ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু না, মারগারেট নয়, আমি তোমার বোনকে বাদ দিয়ে বলছি, তোমার বোনটি সত্যি বড় পবিত্র, নির্মল।

এ সময় হঠাৎ একটা ভরাট গলার গান গোটা ঘরে গম্‌গম্‌ করে উঠল। গলা বটে—উদাত্ত, গম্ভীর, সুপরিশীলিত। উৎকর্ণ হয়ে উঠল সকলে, চুপ হয়ে গেল সকলের গলাবাজী। স্বরটা ছাদ থেকে দেয়ালে দেয়ালে, প্রতিটি পিপেয় প্রতিহত হয়ে মেঘের গুরুগুরু শব্দের মতন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। কে গাইছে, কে মানুষটা ? দেখতে চোখ ফেরাল সবাই।—বিশাল অবয়বের এক মানুষ, বেশ আকর্ষণীয় চেহারা, কালো আলখাল্লায় দীর্ঘকায় মানুষটিকে মানিয়েছে দারুণ ; তার ওপরে শিরস্ত্রাণে রয়েছে লম্বা একটা লাল পালক। মানুষটি সবচেয়ে উঁচু একটা পিপের ওপরে দাঁড়িয়ে গান গাইছিল গানের গমকে গমকে সে যখন মাথা নাড়ছিল তার লাল লম্বা সেই পালকটা তখন নড়ছিল কাঁপছিল ক্ষণে ক্ষণে লাফিয়ে উঠে সিলিং ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সে একটা চটুল গান ধরেছিল তার বিষয় এবং ভাষা এমনই মনোহারী ছিল যে, গানের ফাঁকে ফাঁকে হল্‌ জুড়ে হাসির হুলুস্থুল পড়ে যাচ্ছিল। আর সবাই যোগ দিচ্ছিল সেই মজার কোরাসে। গান গেয়ে সে একটা নীল-মাছির গল্প বলছিল। নীল-মাছিটা রাজার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। সে রাজ-সভায় যেত রাজকীয় পোশাক পরে আর রাজ-রাজড়ার ঘরের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করত। গানের ধুয়াটা এই রকম : যখনই আমরা মনে করি এবার ওরা হুল ফোটাবে তখনই আমরা ওদের কেটে টুকরো টুকরো করি কিংবা

পায়ের তলায় থেত্‌লে মারি।

গানটা যখন শেষ হল, যখন উদাত্ত সেই গানের রেশ ছাদে দেয়ালে পিপেয় পিপেয় আছাড় খেয়ে ফিরতে লাগল তখন দু'পলকের জন্যে অভিভূত সকলে চুপ থেকে একসঙ্গে হৈ-হৈ করে অভিনন্দন জানাল তাকে। সেই অভিনন্দের হাসির হর্‌রা আছাড় খেয়ে ফিরতে থাকল দেয়াল থেকে দেয়ালে ছাদ থেকে মেঝেয়।

সেই উঁচু থেকে গায়ক মাথা নত করে সকলকে কুর্নিশ জানাল তারপর একটা মদের ঘড়া উঁচুয় তুলে ধরে চিৎকার করে বললে, রোডায় অমন নীল-মাছি এসে না-ঢুকলেই মঙ্গল। তা হলে আমি এ শহরে যত সুন্দরী যুবতীদের দেখেছি তাদের বড় বিপদ। বলে সে সম্মান দেখানোর ভঙ্গিতে মদের ঘড়া সমুখে উঁচু করে ধরল, বলল—রোডার সবচেয়ে সুন্দরী কুমারীর নামে আমি স্বাস্থ্যপান করছি।

—তার মানে? সাইবেল ভালেনটিনকে বললে, ও কি তোমার বোনের কথা বলছে, মারগারেটের কথা? ততক্ষণে সারা হল জুড়ে দারুণ উল্লাসের মধ্যে সকলে সেই সুন্দরীর নামে স্বাস্থ্যপান করছে। সাইবেল আর ভালেটিনকে ঘিরে যারা ছিল সকলে এক গলায় বললে, নিশ্চয়, লোকটা মারগারেটকেই ইঙ্গিত করেছে।

ততক্ষণে ব্যাপারটা আর সংশয়ের থ্যকল না এক কোণ থেকে একটা চিৎকার সপ্রমাণ করে দিল আসলে কার উদ্দেশ্যে এই স্বাস্থ্যপান, চিৎকারটা বলল, মারগারেট—মারগারেটের সম্মানে আমরা আজ মদ্যপান করছি।

তা হলে তাই, মারগারেটের নামেই হোক, এবং অন্যান্য সব সম্মত কুমারী সকলের নামেই হোক, আজকের স্বাস্থ্যপান হোক চিত্ত বিনোদক সব কুমারীদের নামে কারণ অপাপবিদ্ধ সুন্দরীরা আসলে আদৌ ভাল শয্যাসঙ্গিনী নয়। গায়ক সেই উঁচু পিপেয় দাঁড়িয়ে সবাইকে শুনিয়ে ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা।

উপস্থিত বুদ্ধির অভাববশত ভালেনটিনের একটু সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে তারপরে গায়কের বক্তব্যের তাৎপর্যটা তার মাথায় ঢুকতেই রাগে বাঘের মতন গর্জন করে উঠল। সঙ্গীদের দু'হাতে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে, যেন সবাই তারা বালখিল্য বাচ্চা ছেলে—খাপ থেকে দীর্ঘ তলোয়ারটা বের করে সে ছুটল গায়কের দিকে, তার পরম স্নেহের বোনকে যে অপমান করেছে তাকে সে আজ উচিত শিক্ষা দেবে।

সে লাফে লাফে পিপের পর পিপে পার হয়ে গেল, তলোয়ারটা বর্শার মতন বাগিয়ে ধরে সে এমনভাবে এগোচ্ছিল যেন শেষ পিপেটায় উঠতে সে যে লাফ

দেবে সেই লাফের সঙ্গে সঙ্গেই গায়কের বুকটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় বিদ্ধ হয়ে যাবে।

সেই শেষ লাফ দেওয়ার আগে ভালেনটিন বিকট চিৎকার করে উঠল—এস শয়তান!

—শয়তান! তা বটে আমি শয়তানই বটে কিন্তু তুমি একটি মহামূর্খ। আমি তোমাকে সত্যি কথাই শুনিয়েছিলাম। যদি তুমি তোমার বোনের প্রণয়ীকে ধরতে চাও ত সে পালিয়ে যাওয়ার আগে শিগগির ছুটে যাও। মারগারেটের ঘরে গিয়ে তার গলা টিপে ধর। কর্কশ কঠিন গলায় কথাগুলি বলে মেফিস্টো ভয়ংকর হেসে উঠল।

শুনে থমকে দাঁড়াল ভালেনটিন—তার শক্ত সবল বিপুল অবয়ব, তার শরীরের অতিপুষ্ট পেশীর বিস্ফার তার উন্মুক্ত তলোয়ারের আক্রমণোদ্যত ভঙ্গি পিপের ওপরে নিপুণ ভাস্করের তৈরি মূর্তির মতন স্থির হয়ে আছে। তার মুখের মাংস নিদারুণ ক্রোধে রেখাঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তার নির্মম ভ্রূকুটির নিচে দুটো তীক্ষ্ণ চোখ লক্ষ্য বস্তুর দিকে স্থির হয়ে আছে, সংকল্পবদ্ধ ঠোঁটের নিচে দাঁতে দাঁত চেপে বসে গেছে, পুরো মাংসল পেশী ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সংবদ্ধ চোয়াল, গায়ককে আমূল বিদ্ধ করার জন্যে সে এবার শেষ লাফ দিল। তলোয়ারটা ঝিকিয়ে উঠল সামনে বাঁ হাতটা সরে গেল পেছনে ··

মেফিস্টোর গলা থেকে ফেটে পড়ল একটা বিদ্রূপের অট্টহাসি, ওহে মাছি আবার লাফ দিয়েছ? কামড়ানোর মুরদ নেই রক্তের সাধ ত দেখছি দারুণ। নাও তবে রক্তই খাও। বলে সে তার হাতের ঘড়ার সব মদটা ভালেনটিনের দিকে ছুঁড়ে মারল। ভালেনটিন তখন শূন্যে। তার মনে হল, সে যেন বিদ্রূপকারী গায়ক আর তার মধ্যেকার একটা অদৃশ্য স্থিতিস্থাপক দেয়ালে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তার মাথাটা ঠুকে গেল সেই দেয়ালে, তার তলোয়ার হাত পা পলকের জন্যে লেপ্‌টে থাকল তার গায়ে আর তখনই তার দিকে ছুঁড়ে মারা রক্তের মতন লাল মদ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে, আগুনের শিখায় শিখায় ছেয়ে গেল ছাদটা হঠাৎ আলোর সেই দীপ্ত তেজে চোখ ধাঁধিয়ে গেল সকলের, সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা লেগে গেল একটা বিশাল শরীরের পড়ে যাওয়ার শব্দে।

একটা মটর দানা দেয়ালে ঘা খেয়ে যেমন করে এসে মেঝেয় ছিটকে পড়ে সেইভাবে পড়ে গিয়েছিল ভালেনটিন। তাই দেখে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল সকলের মধ্যে। একদল এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল ভূপাতিত সৈনিকটির চারধারে। আস্তে আস্তে ভালেনটিন চোখ খুলল, উঠে বসল তারপর অবাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল

করে তাকাতে লাগল চারদিকে। চোখ ঠেকল গিয়ে তার সেই সব-উঁচু পিপেটার ওপরে। আর তক্ষুনি পড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা ভুলে ভীষণ এক ক্রোধের চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল কিন্তু তার সেই ক্রোধের কারণ আর সেখানে নেই। সে কখন কোথায় যেন কিভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আলো নিভে যাওয়ার পরেও মেফিস্টো মারগারেটের জানলায় চোখ পেতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কানে এল পায়ের শব্দ, কে যেন অনেক দূরে—প্রাণপণে দৌড়ে আসছে। মেফিস্টো আর দাঁড়াল না, নিঃশব্দ ত্বরিত পায় সে এসে ঢুকল বাড়ির পেছনে বাগানের মধ্যে। নিচের ঘরে ঘুমো-চ্ছিলেন মারগারেটের মা। পলকের জন্যে মেফিস্টো তাঁর জানলার গোড়ায় হাত রাখল তারপর মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে বন্ধ জানলার ওপরে বিপুল বেগে নিঃশ্বাস ফেলল সে। মুহূর্তে বন্ধ জানলার পাল্লা দুটো ছিট্‌কে গিয়ে দেয়ালে আছড়ে পড়ল মহাশব্দে ঝড়ো বাতাসের একটা প্রবল ঝাপটা ঢুকল গিয়ে ঘরের মধ্যে। আবার সে নিঃশ্বাস ত্যাগ করল আবার সেই নিঃশ্বাস নির্মম ঝঞ্ঝার মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে, জানলার পর্দা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বালিশ বিছানা ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ভয়ংকর আতঙ্কে জেগে উঠলেন মা, ছুটে গেলেন জানলা বন্ধ করতে। সহস্র সাপের শিস বয়ে নিয়ে ছুটে আসছে ঝড়ের বাতাস, অসময়ের এই আকস্মিক ঝড়ে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার আগে জানলাটা বন্ধ করতে হবে কিন্তু জানলা পর্যন্ত যেতে পারলেন না তিনি মাঝখানে বাতাসের আর একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে তার দরজার খিল ভেঙে ঘরে ঢুকল, তিনি ছুটলেন তখন দরজা বন্ধ করতে কিন্তু ঘূর্ণীবাত্যার টানে একখণ্ড কাগজের মতন তিনি ছিটকে গিয়ে পড়লেন বারান্দায়। বারান্দায় বাতাসের বেগ তুলনায় অনেক কম, তিনি সেখানে বসে বসে হাঁপাতে লাগলেন। তখন মনে পড়ল মারগারেটের কথা বেচারী একলা না জানি কী ভীষণ ভয় পেয়েছে। তিনি হাতড়ে হাতড়ে কাঠির বাক্স বের করলেন, চকমকি পাথর ঠুকে কাঠি ধরিয়ে একটা বাতি জ্বাললেন, তখনও তার হাত কাঁপছে পা কাঁপছে, সর্বাঙ্গ থরথর করছে ভয়ে। বাতিটাকে বাতাস থেকে বাঁচাতে বুকের কাছে নিয়ে তিনি খুব আস্তে কাঁপা পা সন্তর্পণে ফেলতে ফেলতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। হাতড়ে হাতড়ে দরজার হাতল পেলেন তিনি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কিন্তু মারগারেটের বিছানার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন

তিনি—করুণ পাংশুমুখে বসে আছে মারগারেট আর তার পাশে শুয়ে আছে এক যুবক। দৃষ্টিপাত মাত্রই তাঁর চোখ বিস্ফারিত মুখ হাঁ হয়ে গেছে। বাতিটা তবু ধরে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আঙুলগুলি কাঁপছিল, বাতিটা কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল চাপা কান্নার শব্দ, আর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়তে থাকল—এক অসহায় নিঃসঙ্গ আত্মা যেন নিদারুণ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। কতিপয় মুহূর্তমাত্র তারপরে একটা কাতর হাহাকার করে তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন। দেয়ালে প্রবলভাবে কপাল ঠুকে গেল, তার আর চৈতন্য থাকল না।

একটা আহত বন্যজন্তুর মতন চিৎকার করে ছুটে এল মারগারেট। মায়ের সামনে বসে পড়ে তার মাথাটা কোলে তুলে নিল। হতভম্ব ফাউস্ট ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তাঁর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। আলোকিত স্বর্গের সুউচ্চ চূড়া থেকে মুহূর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তিনি গাঢ়তর তমিস্রার পাতালে। কি করবেন কিছুই জানেন না, তখন তার কানের কাছে একটা ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। ফাউস্ট পালাও, শিগ্‌গির পালাও। তোমার প্রিয় মারগারেটের বিপদ আসন্ন। ওর দাদা নিচে আছে কি এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে।

পরামর্শটা গ্রহণ করতে মুহূর্ত দ্বিধা করলেন ফাউস্ট তারপরই ছুটলেন তিনি; দর দালান পেরিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে একেবারে বাড়ির পেছনে ফলের বাগানে গিয়ে ঢুকলেন। তার মাথায় টুপি নেই। চুলগুলি উষ্কখুষ্ক হতাশায় মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

বাগানের ভেতরে ঢুকতেই একটা হিংস্র চিৎকার কানে গেল তাঁর। তিনি ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল একটা বিপুল শরীর দারুণ ক্রোধে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। মানুষটি আর কেউ নয় ভালেনটিন, হাতে তার ছোট আকারের একটি তলোয়ার, মুখে তার একটি মাত্র সংকল্প লেখা, রক্তের সংকল্প, সে চায় খুন করতে। খুনের সেই সংকল্পের বিরুদ্ধে ফাউস্ট রুখে দাঁড়ালেন। কোমর থেকে টেনে বের করলেন তলোয়ার। কঠিন জেদের আক্রমণটাকে প্রতিহত করতে বেশ বেগ পেতে হল তাঁকে। ভালেনটিনের তীব্র খোঁচাটা কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ফাউস্ট চিৎকার করে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করতে চাইনে, আমি লড়াই করব না তোমার সাধ্যি নেই আমাকে খুন কর, তোমাকে খুন করি আমারও সে ইচ্ছে নেই।

—আঘাত করতে চাও না, বটে!…ইঁদুর কোথাকার…দাঁড়াও শিক্ষা দিয়ে

দিচ্ছি, জন্মের মতন শিক্ষা দেব। ভালেনটিন চিৎকার করে জবাব দিল, সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে তীব্র বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফাউস্টের ওপরে।

আর একবার ফাউস্ট মুখোমুখি হলেন তীব্র আক্রমণের। মুহুর্মুহু প্রতি কোণ থেকে ভালিনটিনের তলোয়ার ফাউস্ট-এর বুক লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে, কখনো সাপের জিভের মতন কখনো আগুনের শিখার মতন। বাগানের কাক-জ্যোৎস্নায় দুই দুর্ধর্ষ শক্তির অমানুষিক যুদ্ধ চলছে। একজন শয়তানের বলে বলী আর একজন কেবল মানুষী-শক্তির সীমিত আধার—চর্চা-অর্জিত বিদ্যা নিয়ে ভালেনটিন ক্রুদ্ধ শার্দুলের মতন লড়ে যাচ্ছে। তার কব্জির বিদ্যুৎগতি মোচড়ে-মোচড়ে নিমেষে নিমেষে তলোয়ার ঘুরে ঘুরে ক্রমাগত ফাউস্টের মর্মমূল বিদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে। শয়তানের ইন্দ্রজালে বলীয়ান ফাউস্ট মানুষী-সাধনার কাছে ক্রমশ হীন তেজ হয়ে পড়ছেন এমন সময় হঠাৎ ভালেনটিন দু'পা পেছনে সরে এসে সামনের পা বাড়িয়ে দিয়ে মাটিতে দু'পা সমান্তরাল করে দিল ও কোমরের ওপর দেহের সম্পূর্ণ ভার রেখে চোখের পলকে তলোয়ারটা বর্শা ফলার মতন ফাউস্টের থুতনিতে চেপে ধরল। একজন মুর যোদ্ধার কাছে ভালেনটিন এই দুর্লভ কৌশলটি শিখেছিল। এর সুবিধে এই, সামনের পাটি গুটিয়ে আনলেই প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে তার দূরত্ব বেড়ে যায় তাই প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে সহসা আঘাত করতে পারে না অথচ শরীরের সম্পূর্ণ ভার সামনে ছুঁড়ে দিয়ে সে-মুহূর্তে তার একেবারে গায়ের ওপরে পড়ে আঘাত হেনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যাঘাত হানবার আগেই সামনের পা তুলে নিয়ে তার তলোয়ারের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। এটার জন্যে যা দরকার সে-হচ্ছে বিদ্যুৎগতি—সব কাজটা বিদ্যুৎগতিতে সম্পন্ন হয় বলেই প্রতিদ্বন্দ্বী এই ধরণের বিপজ্জনক আক্রমণটা আগে থেকে আঁচ করতে না পারলে তার পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফাউস্টের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়েছিল। ছোবলটা পুরোপুরি লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগেই এক পা পিছিয়ে যেতে পেরেছিল তাই তলোয়ারের তীব্রবেগ তার থুতনি ফুটো হয়ে তার মুখের ভিতর দিয়ে মাথা ছিদ্র করে দিতে পারে নি কেবল থুতনিটাকে ছিন্ন করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

অতএব আর আত্মরক্ষার মধ্যে অসি-যুদ্ধটাকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলেন না ফাউস্ট। রক্তপাত এড়াতে চেয়েও তাঁকে এবার আক্রমণাত্মক খেলা খেলতে হল। এমন সময় ফাউস্ট তার কানের কাছে শুনতে পেলেন মেফিস্টোর গলা, বাতাসের স্বরে সে বলছে, মারো, মারো ফাউস্ট, খতম করে দাও।

ফাউস্টের প্রবল আক্রমণের সামনে অতিষ্ঠ ভালেনটিন ধীরে ধীরে পিছু হটতে

লাগল। ফাউস্ট চিৎকার করে বললেন, তলোয়ার ফেলে দাও, আমি রক্তপাত করতে চাই নে, আমি তোমাকে খুন করব না।

নিরপরাধের রক্ত ঝরানোর অপরাধে ফাউস্টকে জন্মের মতন নরকের বাসিন্দা করার মতলব বুঝি ভেস্তে যায়। মেফিস্টো আবার বলে উঠল, ফাউস্ট মারো, মারো, সুযোগ ছেড়ো না। কিন্তু ফাউস্ট তার কথায় কান দিচ্ছে না দেখে সে নিজেই কোমর থেকে তলোয়ার টেনে বের করল। তলোয়ারের মাথায় আঙুল ঠেকিয়ে তলোয়ারটাকে ধনুকের মতন বাঁকা করল, বাঁকা করে ধরে রাখল দু'পলক। তার মুখে ক্রূর হাসি। সে তলোয়ারের মাথাটা ছেড়ে দিল। হিস্ করে বাতাস কেটে নিমেষে তলোয়ারটা সোজা হয়ে গেল। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় অঙ্কের মতন হিসেব করা তার হাতটা বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এল এবং সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত মনে ভালেনটিনের পিঠে আমূল বিদ্ধ করে দিল তলোয়ারটা।

ভালেনটিন মাটিতে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি মেফিস্টোও বসে পড়ল তার পাশে —বলে উঠল, ফাউস্ট পালাও, শিগ্‌গির পালাও। রাতের পাহারাদার এক্ষুনি হয়ত এসে পড়বে।

কিন্তু ফাউস্ট নড়তে পারলেন না। অসহায় বিভ্রান্ত একটা মানুষের মূর্তি যেন তিনি। তার চোখের সামনে মাটিতে পড়ে আছে ভালেনটিন। তার ওপরে মলিন খানিকটা আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে মারগারেটের ঘর থেকে।

মেফিস্টো দু'পলক ফাউস্টের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর ছুটে চলে গেল রাস্তায়। মুখে হাত চাপা দিয়ে একটা গম্ভীর আওয়াজ তুলে সে চিৎকার করে বলতে লাগল—খুন, খুন।

প্রত্যেক ঘরের সামনে, প্রতিবেশী প্রত্যেকের দোরে দোরে দাঁড়িয়ে সেই ভীষণ গম্ভীর আওয়াজ তুলে মেফিস্টো জানান দিতে থাকল—খুন, খুন।

ঘরে ঘরে জেগে উঠল ঘুমন্ত মানুষ। প্রত্যেক ঘরের জানলা খুলে যেতে থাকল। কেউ কেউ জানলায় দাঁড়িয়ে জানতে চাইল—কে খুন হল, কোথায় খুন হল। কেউ কেউ ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে—মাথায় নাইট ক্যাপ পরনে নাইট-ড্রেস, হাতে লণ্ঠন।…মেফিস্টো তখনও চিৎকার করে চলেছে—খুন, খুন, খুনী পালাচ্ছে, পাকড়াও ওকে।…কোথায় খুন, কে পালাচ্ছে, কোন্‌দিকে পালাচ্ছে! উৎকণ্ঠিত জনতার উত্তেজিত চিৎকার মধ্যরাত্রির আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। নির্জনতা চুরমার করে জনতার ভিড় চারধারে উপচে পড়তে থাকল।

—এই দিকে, এই দিকে এস, তাড়াতাড়ি এস, খুনী পালাচ্ছে, পালাচ্ছে।

বলতে বলতে মেফিস্টো সকলের আগে ফিরে এল বাগানে, ফাউস্টকে একটা ধাক্কা মেরে বললে, খুনের খবর সবাই জেনে গেছে, শুনতে পাও না৷ দল বেঁধে মানুষ তেড়ে আসছে বাগানের দিকে, বাঁচতে চাও ত শিগ্‌গির পালাও।

এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে পেলেন ফাউস্ট, নড়ে চড়ে উঠলেন, শেষবারের মতন তাকালেন মারগারেটের আলোকিত জানলার দিকে। মেফিস্টো বললে, আর দেরি করলে ওরা তোমাকে কুকুরের মতন ছিঁড়ে খাবে। এই শহরে থাকলে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না, তুমি খুনী, তুমি পাপী, তুমি নিরপরাধের রক্তপাত করেছ।

ফাউস্টের চোখ তখনও মারগারেটের জানলার ওপরে। তিনি এবার ফুঁপিয়ে উঠলেন—মারগারেট, মারগারেট! রুদ্ধ গলা থেকে হাহাকারের মতন বেরিয়ে এল ফাউস্টের স্বর।

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে ওই অবোধ মেয়েটার ওপরে আরও বিপদ ডেকে এনো না, ফিস্‌ফিস্ করে উঠল মেফিস্টো, যদি ভবিষ্যতে আবার মেয়েটিকে দেখতে চাও ত চল পালাই এখন, নয়ত আর কখনো দেখতে হবে না তাকে। তারপর একরকম জোর করেই তার গলা জড়িয়ে ধরে বনের ছায়ায় রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দু'জনে।

এক বিরাট জনতা এসে ঘিরে দাঁড়াল ভালেনটিনের চারপাশে। তাদের মধ্যে কিছু মহিলাও আছে। তড়িঘড়ি যে যে-পোশাকে ছিল বেরিয়ে পড়েছে। মেয়েদের শরীরেও নাইট গাউন ছাড়া কিছু নেই, পায়েও মোজা নেই, কেবল জুতো। হাতে তাদের অস্ত্র বলতে যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই। কারো হাতে মুগুর কিংবা লাঠি কেউ কেবল সব্জি কাটা ছুরিটা নিয়ে দৌড়ে এসেছে। কেউ জানে না কেমন করে কী ঘটল, কে-ই বা তাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলল; কিন্তু একটা ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই, আহত মানুষটি মরে গেছে কিংবা মরতে বেশী বাকি নেই আর। মানুষটা পুকুর-পুকুর রক্তে শুয়ে আছে, শুকনো ঘাস অনেকটা রক্ত শুষে নিয়েছে তবু সবটুকু শোষণের ক্ষমতা নেই বলে জায়গাটা তখনও রক্তে থৈ-থৈ করছে, রক্ত তখনও গলগল করে বেরুচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে।

—আরে এ যে দেখছি ভালেনটিন, একটি তরুণ চিৎকার করে উঠল। তার হাতের লাঠিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসে পড়ল ভালেনটিনের সামনে, দেখ, দেখ, ছোরার ঘায়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে বুকটা। রক্তে ভিজে জামাটা সরিয়ে

দেখতে গিয়ে আবার সে আর্তনাদ করে উঠল, না না না ছোরা নয়। তলোয়ার দিয়ে খুন করা হয়েছে, পেছন থেকে মেরেছে ওকে…

বাগানের ভিতরে হৈ-চৈ এতক্ষণে কানে গেল মারগারেটের। দরজা খুলে সে নেমে এল বাগানে। মরা মানুষের মুখের মতন নীল হয়ে গেছে তার মুখ। নীল মুখে তার বড় বড় চোখ দুটো আরও বড়—বিস্ফারিত হয়ে এমনভাবে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে যেন সে পাগল হয়ে গেছে কিংবা পাগল হতে আর বেশী বাকি নেই। সে কাঁপছিল। আপাদমস্তক থর্থর্ করছিল তার। একগাদা লোক ভিড় করে কী যেন দেখছে। সেদিকে তাকিয়ে সর্বাঙ্গে ভীষণ শিউরে উঠল মারগারেট। দুঃসহ যন্ত্রণায় আর উদ্বেগে হাত কচলাতে থাকল সে। তার অজ্ঞাতেই তার গলা চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। এইমাত্র সে এমন এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার চরমতম দুঃখ পার হয়ে এসেছে যে-দুঃখের সম্ভাবনার কথা আগেভাগে কখনো মনে জাগলেও সে শিউরে উঠে ভাবত, না এতবড় নির্মম দুঃখ সহ্য করে কোন মানুষই বেঁচে থাকতে পারে না, সে নির্ঘাৎ তক্ষুনি মরে যাবে।—মনে পড়ছে হঠাৎ তার ঘরের ভেজানো দরজাটা প্রবল ধাক্কায় হাট খুলে গেল, একটা থর্থর্ আলোর রশ্মিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার অন্ধকার ঘর। এক পুরুষের দুই বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে থেকে সে দেখতে পেল তার মায়ের মুখ, তাঁর হাতে, আঁজলার আড়ালে, কাঁপছে একটা পল্‌কা আলোর শিখা। সে আলোয় মারগারেটকে তদবস্থ দেখে গুলিবিদ্ধ জন্তুর মতন একটা আর্ত চিৎকার করে তিনি পড়ে গেলেন মেঝেয়। মাকে ওইভাবে কাটা গাছের মতন পড়ে যেতে দেখে আর তাঁর আর্তনাদ শুনে মারগারেট দৌড়ে এসে বসে পড়েছিল তাঁর সামনে, তাঁর মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছিল। আকুল হয়ে বারবার মা মা বলে চিৎকার করে উঠেছিল; দু হাতে তাঁর মাথা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে, বারে বারে তাঁর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজেছে, চোখের জলে মায়ের বুক ভিজিয়ে দিয়ে হাহাকার করে ডেকেছে কেবল; কিন্তু আর একবারের জন্যেও তিনি চোখ মেলে তাকালেন না, তাঁর গলা থেকে তিরস্কার কিংবা সান্ত্বনার একটা শব্দও বেরোল না। তিনি শীতল স্তব্ধ পাথর হয়ে পড়ে থাকলেন। তাঁর হাতের থরথর মলিন শিখা তাঁর চোখের সামনে যে-দৃশ্য নিরাবরণ করে দিয়েছিল তাই যেন অকস্মাৎ বজ্রের মতন বিদীর্ণ হয়ে এক মুহূর্তে অন্তরের এতকাল লালিত সরল বিশ্বাস, তাঁর তিল তিল করে গড়ে তোলা সুখী গৃহকোণ, তাঁর নিষ্পাপ সন্তানের জন্যে গর্ববোধ, নিমেষে চুরমার করে ধুলায় লুটিয়ে দিল; তাঁর পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিয়ে তাঁকে

নিরাশ্রয় নিরালম্ব করে দিল, সেই আঘাত পলকে কেড়ে নিল তাঁর অসহায় নিঃস্ব জীবন। এ-দৃশ্য দেখার পরেও যদি তিনি বেঁচে থাকতেন সে-জীবন তাঁর কাছে হয়ে উঠত তুষানলে দগ্ধ হওয়ার চেয়েও ভয়ংকর !

একটা তীব্র আঘাতে অসাড় হয়ে গিয়েছিল মারগারেটের বোধ—অনুভূতি ; কি যে ঘটেছে তার, তার কী যে পরিণাম কিছুই যেন সে বুঝে উঠতে পারছিল না ; কিন্তু কয়েক পলক মাত্র তারপরেই মর্মান্তিক সত্যটা মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে তীব্র অনুভবে ফেটে পড়লে সে হাহাকার করে উঠেছিল। হাঁটুমুড়ে বসে পড়ে সে কিছুক্ষণ কেবল দুলছিল আর ফোঁপাচ্ছিল শেষে মায়ের মুখ দু'হাতের অঙ্গুলির মধ্যে ধরে কেবল মাকে ডাকছিল আর বলছিল, মা, মাগো, আমি আর কোন অন্যায় করব না, আর অবাধ্য হব না তোমার, আমি আমি···জীবনে যা কেউ কোনদিন পালন করতে পারে না সেই সব অসম্ভব অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিতে থাকছিল মাকে। তখন তার কানে গেল বাইরের হৈ-চৈ গোলমাল, বহু লোকের অস্থির পায়ের শব্দ, কে যেন কী বলে চিৎকার করে খুব ছুটোছুটিও করেছিল। প্রথমে ওই সব হৈ-চৈ চিৎকার তার মস্তিষ্কের কোষে কোন অনুভূতির সঞ্চার করে নি, কে কী বলছিল কিছু বুঝছিল না সে। ক্রমশ মনে হল তার, বাইরের ওই শব্দ যেন তার হাহাকারেরই প্রতিধ্বনি তারই ছিন্নভিন্ন বুক থেকে কাতর কান্না বেরিয়ে এসে দেওয়ালে গাছের ডালে বাড়ির জানলায় দরজায় মাথা খুঁড়ে মরছে। তারপরেই সেই সাংঘাতিক চিৎকারটা তার মাথার ভিতরে আছড়ে পড়ল, 'খুন' 'খুন'। চিৎকারটা ক্রমশই জোরদার হচ্ছিল। চিৎকারটা যেন আকাশ বাতাস ফাটিয়ে ফেলতে চাইছিল, যেন এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে মেঘের ডাকের মতন ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আর মারগারেটের মনে হচ্ছিল চিৎকারটা যেন তার বুকের ভিতর থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসছে, চিৎকারটা যেন বারবার তাকেই অভিযুক্ত করতে চাইছে, যে-শীতল স্তব্ধ পাথর দেহটার ওপরে সে উপুড় হয়ে আছে, ওই চিৎকার যেন বলতে চাইছে, সে তারই হত্যাকারী, সে তাকেই খুন করেছে। কিন্তু হৈ-চৈ-এর ক্রমবর্ধমান শব্দ অবশেষে তার অর্ধচেতন দুঃস্বপ্নে চিড় ধরাল, তার বোধের গভীরে প্রবল নাড়া দিল ওই হৈ-চৈ কলরব। হঠাৎ সে স্নায়ু শিরায় টানটান হয়ে উঠল। ভয়ে শিটিয়ে উঠল সে—বিয়োগান্ত, বিয়োগান্ত, সব দিক থেকে বিয়োগান্ত ঘটনা যেন ষড়যন্ত্র করে ঘটতে চলেছে তার জীবনে। মা মারা গেলেন, সে মাতৃহীন হল, এখন বুঝি তার প্রণয়ীর পালা। মায়ের কাছ থেকে নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন করে নিল, হোঁচট খেতে খেতে নেমে এল সে নিচের তলায়...

পায়ে পায়ে এসে ঢুকল ফলের বাগানে।

উদ্‌গ্রীব মানুষের একটা মস্ত ভিড় গোল হয়ে তাদের পায়ের কাছে নিশ্চল পড়ে থাকা একটা দেহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মুখে উদ্বেগ কৌতূহল। সে দিকে তাকিয়ে মাথাটা ঘুরে গেল মারগারেটের। টলে পড়ে যেতে যেতে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর একটা আহত পাখির মতন চিৎকার করে ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, একে ধাক্কা ওকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল সে, আছড়ে পড়ল রক্তাক্ত দেহের ওপরে।

প্রিয়, আমাব প্রিয়, ড়ুকরে কেঁদে উঠল মারগারেট। এতক্ষণে সে ভীষণ কোন বিভীষিকা দেখার ভয়ে চোখ বুজে ছিল এবার আস্তে অল্পে চোখ মেলল। চোখ মেলতেই চোখে পড়ল দাদার মুখ। এতক্ষণে ভালেনটিনেরও চোখের পাতা তিরতির করে কেঁপে উঠল, চোখ মেলতে পারল সে। চোখ মেলে তাকাল সে বোনের দিকে। সে-চোখে ভালবাসা আর বিস্ময়; অবশ্য সে ভালবাসা ও বিস্ময়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এক নির্মম দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক অথচ যেন শুধুই স্বপ্ন, ভীতু ছেলের স্বপ্ন যা জেগে উঠলেই মিথ্যে হয়ে যাবে আর মিথ্যে হয়ে যেতেই অকারণ ভয় পাওয়ার জন্যে হেসে উঠবে সে, সে হাসিতে ফুটে উঠবে নির্মল কৌতুক, রসিয়ে রসিয়ে বোনকে সেই স্বপ্নের গল্প বলবে সে তখন। এ রকম কত গল্প বলে দাদা তাকে হাসিয়েছে নিজে হেসেছে আকাশ-ফাটা শব্দ করে। কিন্তু না সে কিছুতেই বলতে পারবে না শয়তান তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার বোন সম্পর্কে তার কানে ফিস্‌ফিস্ করে কী বলেছিল, বলতে পারবে না সেই ভয়ংকর······কিন্তু তাকে ঘিরে এত মানুষ কেন, বিস্ময় কি সে জন্যেই তার চোখে? চোখ বিষণ্ণ নিষ্প্রভ কেন, সে কি তার পিঠে পেটে নিদারুণ ব্যথা বলে? কেন ব্যথা··· ? কেন সে এখানে. এই··· ? হঠাৎ ভালেনটিনের মস্তিষ্কে বোধের সঞ্চার হল, বোধটা লক্‌লকে শিখা হয়ে জ্বলতে থাকল, বিভীষিকার সম্পূর্ণ চেহারাটা মনে পড়তে শিউরে উঠল সে, ঘৃণায় কুঁচকে গেল তার যন্ত্রণাকাতর মুখের পেশী, ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁয়ো না তুমি, সে দুর্বল ক্ষীণ গলায় গুমরে উঠল, তোমার প্রেমিক খুন করেছে আমার শরীর! তুমি খুন করেছ আমার আত্মা!

রুদ্ধবাক্ মারগারেট ফোঁপাচ্ছে কেবল. অনেক কষ্টে বলতে পারল, দাদা, দাদা গো।

কিন্তু সে কাতর আহ্বান ভালেনটিন গ্রাহ্য করল না, সে তার অন্তিম শক্তি

দিয়ে চেষ্টা করল মারগারেটকে ঠেলে সরিয়ে দিতে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, রোডার সবচেয়ে নিষ্পাপ কুমারী বলে আমি তোমাকে একটা রুপোর হার দিয়েছি কব্জিতে পরবার জন্যে। যীশুর ক্রুশ চিহ্ন রয়েছে তাতে। তুমি বলেছিলে হারটি তুমি সব সময় পরে থাকবে। পারবে কী পরতে? যে ভাইকে তুমি খুন করলে তার স্মৃতি এর পর কি তুমি বইতে পারবে?

—বল না, ও-কথা বল না দাদা, দাদা গো! সহসা আকুল হয়ে চিৎকার করে উঠল মারগারেট। দাদার বুক থেকে মাথা তুলে হাঁটু মুড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল সে।

ভালেনটিন একটু দম নিয়ে বলল, না, আর কোনদিন তুমি আমার গালাগাল শুনবে না, আর কোনদিন আমার স্বর তোমার কানে পৌঁছবে না। এতক্ষণে এই প্রথম সে তার চোখের পাতা ভাল করে মেলতে পারল, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে এবার সে তাকাল বোনের দিকে। দৃষ্টিতে তার সমবেদনা, বললে, কিন্তু মা তো বেঁচে আছেন, তুমি কী তার বিষণ্ণ নির্মল চোখের ওপরে আর কখনো চোখ তুলে তাকাতে পারবে?

আর সহ্য করতে পারল না মারগারেট, মা, মা যে নেই, সে যে মাকেও হারিয়েছে সে ত তার দাদা জানে না, তবু কোন্ টানে বুঝি সান্ত্বনার আশায় মারগারেট ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল তারপর টলতে টলতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। পেছনে ভিড়ের ভিতর তখন বিদ্রূপের গুঞ্জন, মারগারেটকে লক্ষ্য করে রাগী মানুষগুলি নির্মম কটূক্তি করে উঠল।

ভালেনটিনের তখন শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। অনেক কষ্টে সে আবার কথা বলল, আমি মরতে চলেছি, আমার জন্যে তোমরা শেষ প্রার্থনা কর তারপর ভ্রষ্টাদের জন্যে শাস্তির যে বিধান আছে…ওকে পিল্যারি কাঠে আটকে রেখো। প্রাণপণ করে ভালেনটিন হাত তুলল, কয়েক ইঞ্চিমাত্র তুলতে পারল সে, বলল, আমার তলোয়ারখানা দাও।

একটি ছেলে এগিয়ে এসে তার হাতে তলোয়ারখানা তুলে দিল। ভালেনটিন পাঁচ আঙুলে খুব শক্ত করে ধরল তলোয়ারখানা অন্তিম শক্তির শেষ প্রান্তে এসেছে তখন ভালেনটিন তবু তলোয়ারখানা সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে খাড়াই রাখতে পারল,—না, সৈনিকের মৃত্যু হল না আমার, স্বগতোক্তি করল ভালেনটিন, কিন্তু তলোয়ার হাতে…। শেষ কথা শেষ হবার আগেই মাথা ঝুলে পড়ল ভালেনটিনের। তলোয়ারটা শক্ত মাটিতে আছাড় খেয়ে ঝন্ঝন্ করে উঠল।

মানুষে মানুষে গিসগিস করছে রোডার গির্জা। এক দুঃস্বপ্নের রাত্রির বিয়োগান্ত ঘটনার বলি দুই হতভাগ্য প্রাণের সদ্গতি প্রার্থনায় জড়ো হয়েছে সকলে। বাইরে মণ্ডপের এক থামের ছায়ায় গির্জার একটা আধখোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে মারগারেট। এখন তাকে আরও বেশী শিশুর মতন দেখাচ্ছে, এক সরল ভঙ্গুর বালিকার মূর্তি যেন ; যৌবনের উদ্ভাস উচ্ছ্বাস এতটুকুও আর নেই তার শরীরে। তার শরীর হাতির দাঁতের মতন নিরক্ত সাদা, ভাবলেশহীন পরম শোকের এক প্রতিমার মতন প্রার্থনা মগ্ন মনে হচ্ছে তাকে। আয়ত দুই চোখে বিয়োগান্ত ঘটনার বিষণ্ণ ছায়া। দীপ্তিহীন ছলছল চোখে নির্বোধ দৃষ্টি। জনতার ভিড় কিংবা গির্জার ভিতরকার প্রার্থনানুষ্ঠানের আভাস —কিছুই তার চেতনায় পৌঁছচ্ছে না, সাড়া জাগাচ্ছে না তার সত্তায়।

দরজার ফাঁক দিয়ে সে শেষকৃত্য দেখছিল। তার উদাসীন দৃষ্টিতে সে-দৃশ্যের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। যেন সে এক আগন্তুক, অনেক দূর কোন দেশ থেকে এসে এ-দেশের এক পারলৌকিক ক্রিয়া দেখছে। কিংবা কেউ যেন তার সামনে একটা নানা রঙে আঁকা দুর্বোধ ছবি তুলে ধরেছে, তার অর্থ সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। ওর তাৎপর্য বোঝার কোন কৌশলই যেন তার জানা নেই। ছবির মানুষেরা হাঁটু মুড়ে মাথা হেঁট করে স্থির হয়ে আছে। গলা মিলিয়ে ভজন গাইছে গির্জার গায়ক দল, বেদীর সামনে পুরোহিতরা সুর করে স্তব পাঠ করছেন। ছাদ থেকে ঝোলানো ধূপদানিগুলি হাওয়ায় দুলে দুলে ধূপের ধোঁয়া আর গন্ধ ছড়াচ্ছে মৃদু মৃদু ; কিন্তু এসব দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নেই মারগারেটের। তার দৃষ্টি অপলক হয়ে পড়ে আছে বেদীর নিচে পাশাপাশি শুয়ে রাখা মস্ত দুটো বস্তুর ওপরে।

সে কেবল জানে ওই দুটি বড় নীরস বস্তু। তার বেশী কিছু সে জানতে চায় না। পাছে আরও বেশী কিছু মনে পড়ে, সে তার চেতনার সঙ্গে তাই প্রাণপণ লড়ে চলেছে। লড়ে চলেছে আর তার ছোট বুকটা বিপুল এক যন্ত্রণায় মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। তবু কিছুতেই সে ওই দুটি বস্তু থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না। ওই দুটি মখমল আচ্ছাদনের আড়ালে যেন বিষম কোন ভয়ংকর ঢাকা পড়ে আছে যার দিকে সে তাকাতে চায় না, না। অথচ কী এক অস্পষ্ট বেদনার মধুর স্মৃতি যেন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরে টানছে তাকে, তার চোখ দুটোকে অপলক করে

রেখেছে।

হঠাৎ দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ দরজার ভিতরে গমগম করছে পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ, পুণ্যার্থীর নিচু গলার আমেন উচ্চারণ—সেইসব নানা পর্দার শব্দ একটা বিচিত্র গম্ভীর একটানা ধ্বনির মতন আছড়ে পড়ছিল মারগারেটের কানে। তারই মধ্য থেকে একটা গানের কলি স্পষ্ট শুনতে পেল মারগারেট। একটা প্রার্থনা-সঙ্গীতের খানিকটা :

এই গোটা নিখিল বিশ্ব কেঁপে উঠবে টলমল করে
যখন জেগে উঠবে সব মৃতরা,
যখন তাদের প্রভু, ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করবে।

নিশ্চয়, পরম বিশ্বাসে মারগারেট অনুভব করল, মৃতেরা সত্যি-ই জেগে ওঠে এবং সমস্ত ভাল মানুষেরা আবার সমবেত হয় ঈশ্বরের পদতলে, তারা সকলে প্রভুর গৌরবে স্নাত হয়ে ধন্য হয়। মরণ কত ভাল। মৃত্যু নিয়ে আসে পরম শান্তি। যত প্রিয়জন চলে গেছে লোকান্তরে আবার তাদের সঙ্গে দেখা হয়, আহ্ সে যে কী সান্ত্বনা। কিন্তু কী যেন হয়েছে মারগারেটের, সে ভাবতেই পারছে না তার কোন প্রিয়জনকে সে হারিয়েছে। তার কেবল মনে হচ্ছে, সে নিঃসঙ্গ, বড় একলা, সে যে কী নিঃসীম একাকীত্ব যেন বলে বোঝানো যাবে না।

আবার একটা গানের কলি ভেসে এল তার কানে :

প্রভু যখন বিচারের আসনে এসে বসেন
সমস্ত গোপন নির্লজ্জতা অনাবৃত হয়ে পড়ে।

গোপন নির্লজ্জতা? অবাক হয়ে ভাবে মারগারেট, গোপন নির্লজ্জতা আবার কী, কাকে বলে গোপন নির্লজ্জতা। এই প্রার্থনার গান কতবার সে গেয়েছে, বরাবরই এই জিজ্ঞাসা তার মনে জেগেছে। অবাক হয়েছে মারগারেট কিন্তু কোনদিন তার সদুত্তর পায় নি। গোপন নির্লজ্জতা কী, মিথ্যে কথা বলা? কিংবা সেইসব ব্যক্তিগত মিষ্টি ভাবনাগুলি যা সে সবসময় মনের মধ্যে লালন করছে; কিন্তু তার মধ্যে গোপন নির্লজ্জতা কোথায়, তার মধ্যে কিছুই ত গোপন নয়, তার মধ্যে নির্লজ্জই বা কী! হাঁ তবে অবশ্যি সেগুলি তার একলার ভাবনা, ভাল লাগার ভাবনা, সে ভাবনাগুলি এমনই একান্ত নিজের যে তার ভাগ এমন যে প্রিয়জন মা তাঁকে দেওয়া কিংবা তাঁর সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করার কথাও কখনো মনে আসে না।

কখন যে প্রার্থনা-সঙ্গীত শেষ হয়েছে আপন চিন্তার মধ্যে ডুবে-থাকা মারগারেট টেরও পায় নি—একটা দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ের 'আমেন' উচ্চারণ একটা দীর্ঘশ্বাসের মতন রেশ রেখে মিলিয়ে যেতে অনেক পায়ের সমবেত পদচারণার শব্দ শোনা গেল। বন্ধ দরজার পাল্লা দুটো হাট খুলে গেল তখন। সামান্য এলোমেলো একটা মিছিলের মতন পুণ্যার্থীরা গির্জার গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল, তখনও তাদের মাথা অবনত, তখনও মাথার টুপি হাতে ধরে আছে তারা। বেদীমূল থেকে কফিন দুটি তোলা হল, এখন কফিনের সামনে যাজক; মন্থর গতিতে মিছিল এগিয়ে চলল। গির্জার চত্বর পার হয়ে মিছিল গির্জার পাশে সমাধি ভূমিতে যাবে। যেতে যেতে মিছিলের কেউ কেউ মারগারেটের দিকে তাকাল। মারগারেটের মুখখানি পাথরের মতন শক্ত থমথমে। এক বুড়ো তার পাশের লোকটিকে বলল—এই দুনিয়াটা একটা আজব জায়গা। ওই সব পাষণ্ডদের জন্ম দেবার জন্যে কত মা তাদের জীবন বিপন্ন করেছে ভাবতে তাজ্জব লাগে।

সত্যি, উত্তরে মাথা নাড়ল লোকটি, অথচ দেখুন মেয়েটির মুখখানা কী মিষ্টি, মেয়েটি দেখতে কত নিষ্পাপ। মুখখানা ওর ওই রকম টলটলে বলেই সবাইর চোখকে ও ফাঁকি দিতে পেরেছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে, দেখুন না দুঃখের এতটুকু চিহ্ন নেই ওর মুখে, যে মা ওকে এই পৃথিবীর আলো দেখাল তার জন্যে ওর চোখে এক ফোঁটা জল নেই, অবাক কাণ্ড। হতচ্ছাড়িটা কেবল তার প্রেমিকের কথা ভাবছে। নির্ঘাৎ শয়তান ঘাড়ে চেপেছে ওর।

কফিন দু'টি যখন তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল মারগারেট নিজের অজ্ঞাতেই দু'হাত বাড়িয়ে দিল তাদের দিকে। যে দু'টি বস্তুর দিকে তাকিয়ে তার বুকের রক্ত জমে যাওয়ার মতন হয়েছিল, সারাক্ষণ বুকটা পাথরের মতন ভার হয়েছিল, বুক ভরে ভাল করে নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারে নি যে বস্তু দুটির ভয়ে, ওরা তাদের নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেন নিয়ে যাচ্ছে, এক্ষুনি কেন নিয়ে যাবে, তার যে এখনও তাদেরকে সব কথা বলা হয় নি। তার যে অনেক কথা বলার আছে, কত কথা বলবে সে, কত কথা! কিন্তু কী কথা, শেষবারের মতন এত কী কথা বলবে সে, সহসা তার মনে হল কই কিছুই ত তার মনে পড়ছে না। সে কেবল ভাবছে, ওরা ওদের নিয়ে যাচ্ছে আর কোনদিন সে ওদের দেখতে পাবে না, আর কোনদিন না। বুক নিংড়ে একটা মস্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার, যন্ত্রণায় ছোট্ট বুকটা মুচড়ে মুচড়ে কুঁকড়ে যেতে থাকল। আর সেই নিদারুণ যন্ত্রণার মুহূর্তে হঠাৎ স্মৃতির কোঠায় আলো জ্বলে উঠল তার। গত দু'দিনের অসহ্য দুঃখ

উদ্বেগ অনিদ্রা—অভাবিত ভবিষ্যৎ সামনে করে অপলক বসে থাকা, একটা তীব্র বিভীষিকার চেহারা নিয়ে ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। মায়ের করুণ-মৃত্যু, আততায়ীর হাতে দাদার নির্মমভাবে নিহত হওয়া, তাকে মুমূর্ষু দাদার কঠিন তিরস্কার, তার প্রেমিকের পলায়ন, দুটো মৃতদেহ সামনে করে একলা একটা নির্জন বাড়িতে বসে থাকা, প্রতিবেশীদের কটূক্তি···একটা আহত পাখির মতন করুণ অব্যক্ত আর্তনাদ করে কফিনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মারগারেট। হঠাৎ চলার পথে বাধা পড়তেই গির্জার একটি লোক তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল, লোকটি একবার চোখ তুলে দেখলও না সে কাকে সরিয়ে দিচ্ছে। ধাক্কা খেয়ে মারগারেটের শরীরটা আছড়ে পড়ল যে-থামটায় হেলান দিয়ে এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল তার ওপরে। আর্ত আহত সর্বস্বান্ত মারগারেট থামের নিচে দলা পাকিয়ে পড়ে গেল। যখন কোনমতে উঠে বসতে পারল মিছিল তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বড় বড় দুই 'অপ্রকৃতিস্থ চোখ মেলে সেই দিকে তাকিয়ে রইল মারগারেট। তার ঠোঁট দ্রুতগতিতে কাঁপছে যেন মনে মনে বিড়বিড় করে বলছে সে কিছু।

মিছিলের একেবারে শেষে সে দেখতে পেল তার মাসি মারথাকে। মারথা অস্থির শোকে হাপুস নয়নে কাঁদছিল কিন্তু সে কান্নার চোখেও আগুন জ্বলে উঠল যখন থামের তলায় মারগারেটকে দেখতে পেল সে। মারগারেটও দেখল তাকে —দেখল সেই একমাত্র মানুষটিকে আপন বলতে এখন পৃথিবীতে যে-ছাড়া তার আর কেউ নেই। মাসিকে দেখেই সর্বস্বান্ত মেয়েটা একবিন্দু সান্ত্বনা একটু আশ্রয়ের আশায় দু' হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। আর তক্ষুনি দু' হাতে নির্মম টানে ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলে দিল তাকে মারথা, কঠিন কুটিল দু'চোখে দারুণ ঘৃণা ছড়িয়ে বললে, তোর স্পর্ধা তো কম না, তুই এই পবিত্র গির্জায় এসেছিস ! নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার। দেখতে পাচ্ছিস, তোর গহনার লোভ, তোর দেহের ক্ষুধা কোথায় নিয়ে এসেছে তোকে। পই পই করে সেই গোড়া থেকে বারণ করে এসেছি তোকে, আমার কথায় তখন কান দিস্‌নি পোড়ামুখি, এখন মর, মর মা-খাকী ভাই-খাকী রাক্ষসী, দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।

যে তাকে উৎসাহ দিয়েছে, সাহস যুগিয়েছে, সুযোগ করে দিয়েছে ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে নির্জনে দেখা করবার সেই কিনা আজ···আজ তাহলে সত্যি তার কেউ নেই—সে সত্যি একলা। শূন্য দুই চোখ জনতার দিকে মেলে নিষ্পন্দ পাথর হয়ে বসে রইল মারগারেট। তার স্থির অপলক দুই শুষ্ক চোখের সামনে

দিয়ে মিছিল কবরের চাতালে মিলিয়ে গেল।

জনশূন্য গির্জার নীরব ছায়ায় পরিত্যক্ত মারগারেট শূন্য আকাশ দেখতে দেখতে সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল; একটা নিষ্ঠুর চিতার মতন তার মাথায় জ্বলে উঠল স্মৃতির আগুন। লক্ষ লক্ষ শিখার মতন লকলকিয়ে পায়চারি করে চলল ছবির পর ছবি—কখনো কানে আসছে দাদার উদাত্ত গলার হো-হো হাসি, কখনো শুনতে পাচ্ছে মায়ের বুকে পেতে রাখা তার কানে ধুকপুক করছে মায়ের রক্তের স্পন্দন, কখনো খেতে বসে দাদার আবদার, মায়ের স্নিগ্ধ চোখে উপচে-পড়া স্নেহ, ছোট্ট বাড়ির চারধারে পাতার মর্মর, মায়ের গুনগুন প্রার্থনা সঙ্গীত—ওই মিছিলের মতন এই স্মৃতির মিছিলটাও যেন তাকে একলা ফেলে জন্মের মতন এগিয়ে যাচ্ছে আর কোনদিন মুখ ফিরিয়ে তাকাবে না তার দিকে আর ফিরে আসবে না—কেউ না, বুঝি ওই স্মৃতিরাও না।

থরথর করে কাঁপছিল মারগারেট, থেকে থেকে কান্নার ঢেউ শরীর আছড়ে মুচড়ে তার বুক ভেঙে বেরিয়ে আসছিল গলা চিরে; কিন্তু না চোখজোড়া যেমন শুক্‌নো কর্‌কর্‌ করছিল তেমনি করকরে শুক্‌নো এখনও; মণি দু'টো সেখানে কয়লার মতন পুড়ছে কেবল। না, কাঁদতে পারছে না মারগারেট, কিছুতেই চোখে জল আসছে না তার। কাঁদতে না পারার যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকল মারগারেট।

১৭

এক সপ্তাহ আগেও মারগারেটের নিষ্পাপ জীবন ছিল সরল সুখ আর নির্মল আনন্দে টইটম্বুর। তার বাবা মারা গেছেন তখন মারগারেট খুব ছোট্ট, দুঃখ বোঝবার বয়েসও হয়নি তখনো তার। তারপরে থেকে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস পড়েনি কখনো তার। হ্যাঁ কখনো কখনো চোখের কোণ জলে ভরে উঠত, বুকের বাতাস বেরোবার পথ না পেয়ে বুকের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করত দাদাকে বুকে চেপে সে আর তার মা কিছুতে আর ছাড়তে চাইত না, এসব দুঃখের মুহূর্ত আসত দাদার যুদ্ধে যাওয়ার ডাক পড়লে। কিন্তু সে দুঃখের পুরো ক্ষতি সুদে-আসলে পুরণ হয়ে যেত দাদা যখন যুদ্ধের শেষে বাড়ি ফিরে আসত। তখন গোটা বাড়ি আনন্দের বন্যায় থই-থই করত। কানায় কানায় ভরে উঠে তিনটি

প্রাণীকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে সে আনন্দ উদ্‌ভ্রান্ত উপচে উপচে পড়ত কেবল।

মারগারেটের আনন্দে কোন আড়ম্বর ছিল না। অল্পতেই খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠত মারগারেট, তুচ্ছ সামান্য অতিশয় সাধারণ জিনিস পরম তৃপ্তিতে মুগ্ধ করে দিত তাকে। ভোরের শিশির-ভিজে ফুল, পাখির শিস, হঠাৎ হাওয়ায় মেতে উঠে গাছগাছালির পাতায় পাতায় হাততালি, ছোটখাটো একটা উপহার, একটু আদর, একটু মিষ্টি কথা, কোন সেবাব্রত—তাকে মুগ্ধ করার জন্যে চারদিকে সবকিছুই যেন তৈরি হয়ে থাকত। মারগারেটও যেন সর্বাঙ্গে মনে মুগ্ধ হওয়ারই জন্যে প্রস্তুত—ডেফডিল, বাটার কাপ, ভুঁই চাপা, ব্যাঙের ছাতা, মাঠের সবুজ কচি ঘাস, গঙ্গাফড়িং, প্রজাপতি, জলে মাছের ঘাই—যা কিছু সে দেখত তাতেই খুশীতে হাততালি দিয়ে নেচে উঠত মারগারেট তার উজ্জ্বল সুন্দর নির্মল চোখ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে যেন সব সময় খুশীতে অবাক হয়ে থাকত। সে নাচত গাইত প্রতিবেশীর ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কানামাছি খেলত। রূপকথা শুনতে শুনতে যেমন সে বিভোর হয়ে যেত তেমনি দাদার কাছে যুদ্ধের সব দুঃসাহসী গল্প শুনতে শুনতেও তার সম্বিত থাকত না। অথচ ছোট্ট সংসারটির সমস্ত কাজ সে একলা গুছিয়ে করত। ছবির মতন সুন্দর করে রাখত সে তার শান্তির ছোট্ট নীড়।

সরল সুন্দর সেই নিষ্পাপ ছোট্ট বুকটিকে হঠাৎ একটা দামাল হাওয়ার মতন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে দখল করে বসল এসে দুরন্ত নতুন আবেগ। সেই সর্বগ্রাসী আগন্তুক আবেগের কোন হেতু না বুঝে প্রথমে ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। তারপরে কখন কেমন করে যেন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার নিজেরই অজান্তে সে-আবেগ আত্মস্থ করে ফেলল সে। সেই আবেগের সোনালি আলোয় সে যেন দেখতে পেল এক অনন্ত বিস্তৃত স্বপ্নের ভুবন। সে যেন সেই নতুন ভুবনের এক নবজাতক। এই নতুন ভুবন তার সুন্দরতার সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে এনে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার। সে এই বহির্জগতের এক চারু চরিত্র ছিল এত কাল। পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে সে নাচত হাসত খেলত—পাখির সঙ্গে পাখি, ফুলের সঙ্গে ফুল হয়ে যেত সে, বনের মর্মের সঙ্গে মর্মরিত হত তার অস্তিত্ব। এবার এই নব-জন্মের নতুন ভুবনে তার যেন দুটো বিশাল ডানা গজিয়ে গিয়েছিল। সেই দুই বিশাল ডানা বিস্তার করে সে সাদা তুলোর মতন মেঘ, নীল রেশমের মতন আকাশ আর ঘুমন্ত কোন রাজপুত্রের অশান্ত গভীর নিঃশ্বাসের মতন বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছিল। বনবীথি ফুল পাখি ছায়ার ভুবন সবুজ বনাতের মতন তার

বুকের তলায় এক উষ্ণ অনুভবের মতন বিছান ছিল।

সব ছিল তার। রূপকথার মস্ত জগৎ ছিল একটা, তার সঙ্গে নতুন এসে যোগ দিয়েছিল অপরূপ স্বপ্নের আর এক চরাচর। তারপরেই কিসে কী হয়ে গেল, হঠাৎ এক রুপালি রাতে ভালবাসা হয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে ভয়ংকর সেই ভয়; মুহূর্তে কি ঝড় বয়ে গেল তার জীবনে কী ঝড়, কী ঝড়। সব তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে চলে গেল সে, সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে রিক্ত শূন্য বিধ্বস্ত করে রেখে দিয়ে গেল তাকে। তার জ্ঞান হওয়া অবধি সে কখনো জানত না মৃত্যু কী—এক রাতের মধ্যেই সেই ভয়ংকর নির্মম এসে তাকে সে-মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা দিয়ে গেল। তার চোখের সামনে দিয়ে একসঙ্গে কেড়ে নিয়ে গেল তার প্রিয় তার পরম নির্ভর দু'দুটো প্রাণ। মৃত্যুর সেই রুদ্ররূপ তার চেতনায় আরও ভয়াবহ আরও হৃদয়-বিদারক হয়ে উঠেছে যে-হেতু এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই রহস্যময় পুরুষ যার জাদুকরী ছোঁয়ায় তার গোটা জীবনই আগাগোড়া পাল্‌টে গেছে, যার আত্মার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তার আত্মা—যে তাকে এক নতুন বোধে অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

একদিন যে বাড়িটি তার মায়ের নরম গলার স্বরে আর তার মিষ্টি গলার গানে ও গল্পে রিমরিম করত, গমগম করত তার দাদার উঁচু গম্ভীর গলার আওয়াজে আজ তা নীরব নির্জন বিষণ্ণ। উরুর ওপরে কনুই আর হাতের চেটোয় গাল দেওয়ালে শূন্য দৃষ্টি মেলে নিঃসঙ্গ মারগারেট বসে আছে। তার উদাসীন চোখে আতঙ্ক আর হতাশা। থেকে থেকে সেই হতাশায় ছলোছলো আতঙ্কের চোখে ভেসে উঠছে নানা বিভীষিকার ছবি; শুনতে পাচ্ছে মায়ের সেই শেষ আর্তনাদ, তার দিকে তাকিয়ে মায়ের সেই নীরব তীব্র তিরস্কার, মুমূর্ষু দাদার সেই শেষ ম্লান হাসিটি চোখে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কানে ঝনঝনিয়ে উঠছে তার নির্মম ভর্ৎসনা তার প্রতি সেই নিষ্ঠুর উক্তি। সত্যি কি তার পাপের জন্যে ওরা তাকে শাস্তি দেবে? বড় নিদারুণ অবিচার মনে হল মারগারেটের, তার অমন দরাজ-হৃদয় দাদার, অমন ধর্মপ্রাণ মা'র কিনা এমন করুণ মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল। আর তারা তাদের মৃত্যুর সময় জেনে গেল মারগারেট ব্যাভিচারিণী। তার পাপেই তারা এমন দারুণ দুঃখ পেয়ে মরল। কিন্তু যার জন্যে তার জীবনে এই নিষ্ঠুর বিয়োগান্ত ঘটনা, তাঁর কথা ভেবেই এখন সে এত দুঃখের মধ্যেও উদ্বিগ্ন অস্থির হয়ে উঠেছে। তার প্রণয়ী পুরুষ পালিয়েছে। পলাতক সেই প্রেমিকের স্মৃতিই এখন তার নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন। মারগারেট তার বিচার

করবে না। তাঁকে প্রথমযেদিন সে চুম্বন করেছে সে-দিনই সে তাকে তার মন প্রাণ দান করেছে। তার প্রেম ও বিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে তাকে। এখন তার প্রতি ভালবাসাই তার ধ্যান জ্ঞান, পৃথিবীতে আর কিছু তার কাছে ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ সে মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে, সে হতাশার চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌঁচেছে, এর চেয়ে বেশী দুঃখ পেয়ে পৃথিবীতে কেউ আর বেঁচে থাকতে পারে না।

বিষণ্ণ নির্জন ঘরে একলা মারগারেট গালে হাত দিয়ে তার অসহায় নিরালম্ব জীবনের অপরিসীম দুঃখের চিন্তায় ডুবেছিল। হঠাৎ তার ভেজান দরজার কড়া নড়ে উঠল, কারা যেন প্রবল ধাক্কা দিল দরজায়। হাট খুলে গেল দরজা। একটা কর্কশ আদেশের স্বর শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে জন চারেক সেপাই ঢুকে পড়ল ঘরে। তারা সবাই গীর্জার প্রহরী। তাদের পেছনে পেছনে ঢুকলেন লম্বা কালো আলখাল্লা গায়ে একজন পাদ্রী। পাতলা দীর্ঘকায় মানুষটির সরু শীর্ণ মুখে উজ্জ্বল দু'টো চোখ, হাতে গোল করে পাকান একটা পশুর চামড়ায় তৈরি কাগজ।

এতগুলি মানুষকে একসঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখে মারগারেট ভয় পেল। তার শরীর কাঁপতে থাকল। ভীরু দুই চোখ আগন্তুকদের ওপরে স্থির রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। এখন কেউ তার জন্যে সুসংবাদ আনবে এমন কথা সে বিশ্বাস করতে পারে না। তার বড় দুঃসময় চলছে। তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আজ সকলেই তার প্রতি বিমুখ। বিতৃষ্ণায় সকলেই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যখন যার দিকে তাকাচ্ছে দেখছে সে-চোখে ঘৃণা, তিরস্কার। নতুন কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী কি আর তাকে অন্য চোখে দেখবে বরং তারা যখন আসবে, আসবে কোন নতুন দুঃসংবাদ নিয়ে কিংবা উপদেশ কি ভর্ৎসনা করতে।

তীক্ষ্ণ চোখ মারগারেটের ওপর স্থির রেখে দু'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন পাদ্রী তারপর জিজ্ঞেস করলেন—তুমিই কি মারগারেট, ভালেনটিনের বোন?

হ্যাঁ, নিঃশ্বাসের স্বরে উচ্চারণ করল মারগারেট, তার ভাবলেশহীন মুখ নির্বিকার, চোখ বড় করে সে যেমন তাকিয়েছিল, তাকিয়ে রইল।

পাদ্রী চোখ নামিয়ে পাকানো চামড়ার কাগজটা খুলে ফেললেন, কাগজটার ওপর দু'পলক চোখ রেখে আবার মারগারেটের দিকে তাকালেন। মলিন মুখে তখনও মারগারেট তাকিয়ে আছে তার দিকে, তার শরীর তখনও একটু একটু

কাঁপছে। মারগারেটের ছলছল বিষণ্ন চোখ দেখে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না পাদ্রী। তিনি সরু শুকনো নিরাসক্ত গলায় বলতে থাকলেন, আজ সকালে বিশপ তোমার পাপের পরিমাপ করেছেন। তিনি অনেক সাক্ষী-সাবুদ নিয়েছেন। তিনি নিশ্চয় করে জেনেছেন, তুমি যৌনক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছিলে, তুমি পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলে। সুতরাং তিনি রায় দিয়েছেন, এই সাংঘাতিক দুই পাপের জন্যে তোমার শাস্তি হবে 'পিল্যারি'। তোমার আত্মার শুদ্ধির জন্যে আর পাপীদের শিক্ষা দিতে বাজারের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে তোমাকে ছ' ঘণ্টা পিল্যারিতে আটক থাকতে হবে। এ শাস্তি কার্যকর হবে আজই।

নিঃসন্দেহে খুব খারাপ খবর তবু শোনামাত্রই মারগারেটের গায়ের কাঁপুনি থেমে গেল। যে ভয়টা নিঃশব্দে তার বুকের মধ্যে খুঁড়ছিল সেও আর রইল না। কেননা তার মনের অনুক্ষণের একটা আশঙ্কা ছিল এই বুঝি কেউ ফাউস্ট সম্পর্কে কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এল। কিন্তু সে যখন জানল সংবাদটা ফাউস্ট সম্পর্কে নয় অমনি স্বস্তিতে বুক ভরে উঠল তার। আরামে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

পাদ্রী তখনও বলে যাচ্ছেন, এভাবে প্রায়শ্চিত্তে ও প্রার্থনায় প্রভুর বিরুদ্ধে তোমার পাপের অপরাধ স্খালন হয়ে যাবে ; কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে তোমার যে পাপ-কর্মের অভিযোগ তার জন্যে তোমার আরও শাস্তি পাওনা থেকে যাচ্ছে। তোমার সে অপরাধের বিচার হবে আদালতে। অবশ্য তুমি যদি এখন আমাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দাও তাহলে হয়ত তোমাকে আদালতের কাঠগড়ায় নাও দাঁড়াতে হতে পারে।

—বল, তোমার প্রণয়ীটি কে ? সেই কী তোমার দাদাকে খুন করেছে ?

—আমি জানি নে। জবাব দিয়ে মারগারেট নিঃশ্বাসের স্বরে স্বগতোক্তি করল, হা ঈশ্বর আমি যদি জানতাম।

—তোমার প্রণয়ী মানুষটির পরিচয় কী ? নাম কি তার ?

মারগারেটের সর্বাঙ্গে আবার কাঁপুনি শুরু হল। সে ক্রমাগত হাত কচলাতে থাকল। কিন্তু সে প্রাণপণে ঠোঁট চেপে রইল। তার গলা দিয়ে একটাও শব্দ বেরোল না।

পাদ্রী তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল। চোখে তার ক্রূর দৃষ্টি। চোয়াল ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠল তাঁর। একটু পরে বললেন, তোমার মাসি আমাদের

বলেছে, সে নাকি কোথাকার এক রাজপুত্র। কথাটা কি সত্যি? জবাব দাও।

তবু মারগারেট নীরব। ভয়ে নীল হয়ে উঠেছে সে। আয়ত চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

—কথা বল, ধমক দিলেন পাদ্রী। তবু স্বর ফুটল না মারগারেটের গলায়। সে দাঁতে দাঁত চেপে রইল।

—তোমার প্রণয়ী আর তার সঙ্গীটি—ছ'জনেই আস্ত শয়তান। এই শয়তানের দোসর ছ'টি সম্বন্ধে কী জান তুমি স্পষ্ট করে বল। কথা বল মারগারেট। চুপ করে থাকলে তোমার দারুণ শাস্তি হবে, বলে রাখছি।

এতক্ষণে মারগারেট মাথা নাড়ল। মাথা নেড়েই যেন সে বোঝাতে চাইল যে, সে কিছুই জানে না। তবু সে কথা বলল না। পাদ্রী তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বলাতে পারলেন না। শেষমেশ অধৈর্য হয়ে তিনি তাঁর সেপাইদের হুকুম দিলেন, বাঁধ, ওকে বেঁধে নিয়ে চল। মারগারেটকে বললেন, আশা করি ছ' ঘণ্টা 'পিল্যারি' খাটার পরে ঈশ্বরের কৃপায় তোমার মুখ খুলবে।

আদেশ পেয়ে একজন সেপাই এগিয়ে এল। চামড়ার দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধল তার হাত দুটোকে। আর একজন এসে তার পায়ের জুতো খুলে নিল। তারপর তারা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। সামনে ছ'জন সেপাই পেছনে ছ'জন। মাঝখানে মারগারেট। আলখাল্লার পকেটে হাত পুরে পাদ্রী চললেন মারগারেটের পাশে পাশে। এভাবে মিছিল এসে পৌঁছল মার্কেট স্কোয়ারে।

হাটখোলার মাঝখানে ছ' ঘণ্টা 'পিল্যারি' বন্দী থাকার পর সেই যখন সূর্য অস্ত গেল তখন এল গির্জার ভৃত্যরা। কেউ মারগারেটের পায়ের শেকল খুলে দিল কেউ খুলে দিল কব্জির বাঁধন কেউ ঘাড়ের ওপর থেকে ভারী কাঠের কুঁদাটা তুলে নিল।

কাঠের সেই T আকারের শাস্তি-স্তম্ভটা একটা উঁচু মঞ্চের ওপর খাটানো ছিল। খাড়া স্তম্ভটার মাথায় সমান্তরাল কাঠের কুঁদার তিনটে গর্তে মারগারেটের দুটো হাত আর মাথাটা ঢোকানো ছিল। হাঁটু দুটো আর পায়ের গাঁট বাঁধা ছিল স্তম্ভটার সঙ্গে—এভাবে গোটা শহরের মানুষের চোখের সামনে সারাদিন কেটেছে তার। না জুটেছে একমুঠো খাদ্য না এককোঁটা জল। কেবল মিলেছে বিদ্রূপ, উপহাস। অতি উৎসাহী কেউ কেউ এগিয়ে এসে তার গায়ে মুখে থুথু অবধি ছিটিয়েছে।

গোটা ছ' ঘণ্টার প্রায় পুরো সময়টাই মঞ্চটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল জনতার একটা মস্ত ভিড়। দু'জন পুলিশ পালা করে পাহারা দিয়েছে তাকে—পাছে কেউ তাকে মারধর করে খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত করে। তবু এক এক সময় জনতা ঠেকাতে তাদের হিমসিম খেতে হয়েছে, রুখতে রুখতেও দু' একজন ছুটে গিয়ে দু' একটা চড়চাপড় দু' এক দলা থুথু ছিটিয়ে দিয়ে এসেছে। ভিড় কখনো কখনো অবশ্য খুব পাতলা হয়েছে কিন্তু তখনও নিন্দে করার, কুৎসিত কটূক্তি করার, অশ্লীল গাল পাড়ার লোকের অভাব হয়নি। আর দেখা গেছে এসবব্যাপারে মেয়েরাই মেয়েদের চরম শত্রু হয়ে ওঠে বিশেষ করে যুবতীরাই সমবয়সীদের প্রতি সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট হয়, ক্রুদ্ধ হয়। তারাই আগ বাড়িয়ে পরস্পরের চরিত্রে কালি মাখায়, কাদা ছিটোয়। এক্ষেত্রেও মারগারেটের নিদারুণ লাঞ্ছনা হল তাদের হাতেই, তারাই সেপাইর পাহারা ফাঁকি দিয়ে দৌড়ে গেছে মঞ্চে মারগারেটকে কিল ঘুষি মেরেছে, থুথু দিয়েছে। কিন্তু বয়স্ক মানুষ কেবল কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়েছে তার দিকে, তাদের মধ্যে এমন একটা দুশ্চরিত্র পাপী মেয়ে আছে দেখে তারা খুব রেগে গেছে বটে তবু তারা শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়নি; তারা কেবল বলেছে, পাপী কখনো শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে না, তার শাস্তি হবেই, ঈশ্বরই তাকে তাঁর মতন করে শাস্তি দেবেন, আমরা নই, আমরা কেন। মাঝে মধ্যে কি ধাক্কা বিদ্রূপের হাসাহাসি ছাড়া যুবকদের কাছ থেকেও মারগারেট কোন অনুচিৎ ব্যবহার পায়নি বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার দুঃখে করুণার্দ্রই হয়েছে, বিচলিত বোধ করেছে। তারা বেশী ভিড় করেও দাঁড়ায়নি, মজা দেখতে ছুটেও আসেনি, কিংবা ছুটে এসেছে বটে, ত মজার মতন কিছু নয় দেখে চলে গিয়েছে। তবে দুর্জন কী নেই, তারাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসি মস্করা করেছে, অপমানজনক শব্দ করেছে কিন্তু সবচেয়ে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়েছে তার বয়সীরাই, কুমারীরাই। ভিডটা তারাই করেছে বেশী; তার শাস্তির সারাক্ষণ তারা তাকে ঘিরে থেকেছে, তাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উত্তেজিত ভাষায় কঠিন শব্দ উচ্চারণ করেছে।

—কী গো গতরের জ্বালা জুড়িয়েছে ত, এখন ঠাণ্ডা বোধ করছ, কেমন? বলে হি-হি করে হেসেছে কোন মেয়ে। ঈর্ষার হাসি চেপে জিজ্ঞেস করেছে, প্রেমিকার আদরের চেয়ে শিকলের আদরটা কিঞ্চিৎ শেতল আর শক্ত বোধ হচ্ছে, তাই না ভাই?

একজনের বুকে বোধহয় কখনো দাগা দিয়েছিল মারগারেট। 'সাধু চরিত্র'!

সে বলে উঠেছে, কি গো খুব ়য সতীপনা করে বেড়াচ্ছিলে, পবিত্র নিষ্পাপ কত সুনাম তোমার, এখন যে হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেল ! হি-হি ।

কিন্তু কথায় যত ধারই থাক কিছুই মারগারেটকে বিদ্ধ করতে পারছিল না, তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই ঘটছিল না এত শত বাক্যবাণেও ; কেননা যার দিকে এমন নির্মম সব কথার ঢিল ছোঁড়া হচ্ছিল সে অল্পক্ষণের মধ্যেই অচৈতন্য হয়ে গিয়েছিল, চতুর্দিককার এত হৈ-চৈ চিৎকার গালাগাল কিছুই তার কানে যাচ্ছিল না, কিছুই সে দেখছিল না। এই নিদারুণ শত্রুব্যূহের মধ্যে নিঃসঙ্গ মেয়েটা অচৈতন্য হতে পেরেই যেন বেঁচে গিয়েছিল। না। তাতেও তার শেষরক্ষা হত কিনা সন্দেহ। তাকে রক্ষা করেছিল তার শিশু-বাহিনী। শিশু-বাহিনী সবাই নয়। ভয়ে তারা দূরে সরে গিয়েছিল ; অসহায় অক্ষম শিশুরা তাদের প্রিয় পরী রানী এমন হেনেস্তা দেখেও কিছু করতে না পেরে কেবল আকুল হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।' কিন্তু তাদের মধ্যে থেকেই দু'টি দুঃসাহসী শিশু ছুটে এসে দাঁড়িয়ে ছিল মারগারেটের পায়ের কাছে। একজন অবশ্য সেখানে দাঁড়িয়ে তারস্বরে কেবল কাঁদছিলই কিন্তু আর একজন রেগে গিয়ে সর্বক্ষণ কেবল মেয়ের দঙ্গলকে শাসিয়েছে, ছোট্ট মুঠো আকাশে উঁচিয়ে বলেছে, সাবধান এক পা এগিয়েছ কি নাক থেঁতো করে দেব, কান কামড়ে নেব। মারগারেটের শাস্তিকালের শেষের দিকে ওই দু'টি দেবশিশুর কান্না আর শাসানি বাঁচিয়েছে তাকে। কিন্তু এত সবের কিছুই মারগারেট জানে না। না জানে সে তার চরিত্র দুর্জনের মুখেমুখে কতখানি কুৎসিত আর কতদূর বিস্তৃত হয়েছে, না জানে সে তার দুই শিশুরক্ষী তাকে তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে কিভাবে তাকে দৈহিক লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করছে।

এ ভাবে ছ'ঘণ্টার শাস্তি শেষ হলে তাকে যখন মঞ্চ থেকে নামানো হল তখন আর একবার ডাল কুত্তার মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল যত উৎসাহী নারী-বাহিনী—নতুন করে দফায় দফায় চলল গালাগাল, চরিত্রের ওপরে কালি মাখানো, আর সর্বাঙ্গে থুথু ছিটানো ; সেপাইদের সযত্ন চেষ্টা কেবল কিল-ঘুষির হাত থেকে রক্ষা করতে পারল তাকে।. শুইয়ে দিয়েছিল তারা মারগারেটকে। আস্তে আস্তে তার জ্ঞান ফিরে এল। দূরাগত ক্ষীণ শব্দের মতন তার চারদিককার রকমারি কোলাহল কানে গেল তার। ক্রমশ পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠল মারগারেট একে একে সমস্ত ঘটনা মনে পড়তে থাকল। চোখ মেলল সে। উঠে বসল।

বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল সে—হিংস্র-মুখ নারী-বাহিনী,

তাকে রক্ষায় ব্যস্ত সেপাইয়ের দল, কান্নায় ভেঙে পড়া ছোট্ট ছেলেটি, সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল সে। তাকে ঘিরে এত এত মানুষ কেন সেই বা কেন এখানে, কোথা থেকে এল কিছুই যেন সে বুঝছে না এমনই এক হতবুদ্ধি দৃষ্টি তার চোখে, তার চেতনায় এমনই এক কুয়াসা। আস্তে আস্তে সে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল যেন মস্তিষ্কে বোধের সঞ্চার হচ্ছে, যেন কুয়াসা কেটে যাচ্ছে চেতনার। সম্পূর্ণ বোধোদয় হতে বেশ খানিকটা সময় লাগল তার। তারপরেই অকস্মাৎ সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক মনে পড়ে গেল। সারা দিন পরে এই প্রথম রক্তোচ্ছ্বাসে টুকটুকে হয়ে উঠল তার নিরক্ত ফ্যাকাসে মুখ একটা নিরতিশয় লজ্জা আর অপমানবোধ সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়ল তার ওপরে, সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল সে, থরথর করে কাঁপতে থাকল। নগ্ন পায়ের দিকে চোখ পড়ল তার, আতঙ্কিত দুই বিস্ফারিত চোখে তাকাল সে চারধারে। তাড়া-খাওয়া অসহায় পশুর মতন সেই চোখে ফুটে উঠল উন্মাদের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। যেন ভূতাবিষ্ট হয়েছে, বিকারগ্রস্ত রোগীর মতন বিপুল শক্তি যেন হঠাৎ সঞ্চারিত হয়েছে তার শরীরে। সে উঠে দাঁড়াল এবং পলকের মধ্যে তীরের মতন ছিট্‌কে পড়ল ভিড়ের মধ্যে, ভিড় ভেদ করে প্রাণপণে ছুটল সে, যে মেয়েরা তার সামনে পড়ল তারাই তাকে কষে দু'চারটে চড় চাপড় মেরে দিল, কেউ দলা দলা থুথু ছিটিয়ে দিল—হয়ত মাটিতে ফেলে তাকে পিষেই ফেলত যদি না সেপাইরা ছুটে এসে বাধা দিত তাদের।

ভিড় পেরিয়ে হাটখোলার মধ্যে দিয়ে অন্ধের মতন বেপরোয়া ছুটছিল মারগারেট যেন তাকে একপাল শিকারী কুকুর তাড়া করেছে। সত্যি কিছু দস্যি মেয়ে তাড়া করে ছুটে গিয়েওছিল তার পেছনে; কিন্তু প্রাণ রাখতে প্রাণপণ যে ছোটে, বিকারগ্রস্ত রোগীর মতন অন্তিমবেগে তাকে নাগাল পাবে কেন হিংসুক কোন মেয়ে, তা ছাড়া সেপাই রয়েছে বাধা দিতে, তাই মারগারেট নিরাপদেই পৌঁছতে পারল। কোথায় আর পৌঁছবে! একদা যেখানে ছিল তার মায়ের কোলে পরম সুখের নিরাপদ আশ্রয় পাখির বুকের মতন উষ্ণ সে নীড় এখন শোক আর আতঙ্কে ঠাণ্ডা এক ভয়ার্ত ভুতুড়ে বাড়ি, একদিন যেখানে তার বুকের স্বপ্ন সত্য হয়ে দু'বাহুর মধ্যে ধরা দিয়েছিল আজ তা স্মৃতির তীক্ষ্ণ কাঁটা হয়ে ছড়িয়ে আছে সারা বাড়িটায় তবু নিরুপায় মারগারেটকে এখানেই ছুটে আসতে হল। মেঝেয় আছড়ে পড়ে দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে প্রাণ ভরে কাঁদবার জায়গা আর কোথায় আছে তার!

উধ্বর্শ্বাসে ছুটে এসে মার্গারেট কোনমতে যখন ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিতে পারল তখন তার বুকের মধ্যে হাঁপরের শব্দ, সর্বাঙ্গে অসহ্য ক্লান্তি, দেহ আর বইতে পারছিল না সে, দরজার গোড়ায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। শারীর-যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠতেই তার কেটে গেল অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে দেহে কিঞ্চিৎ বল ফিরে এল কিন্তু মন তেমনি বিকল হয়ে রইল তার। কয়েক যুগের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা কয়েক ঘণ্টায় পেরিয়ে আসতে গিয়ে তার মস্তিষ্কের স্নায়ুজাল যেন ছিঁড়ে খুড়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে। নানা স্মৃতি ঝড়ের মতন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার মাথায় একটাকে আর একটা থেকে আলাদা করতে পারছে না, এক যন্ত্রণা থেকে আর এক যন্ত্রণায় এক শোক থেকে আর এক শোকে এবং এই শোক ও যন্ত্রণাকে দু'হাতে ঠেলে ফেলে কোন এক তীব্র সুখে পৌঁছে যেতে পেরে উঠছে না সে কোনমতেই—হুড়মুড় করে এসে সব—সমস্ত স্মৃতি একসঙ্গে চেপে ধরে ক্রমাগত অভিভূত করে ফেলছে তাকে। এ-ভাবে অভিভূত থেকে বহুক্ষণ কেটে যেতে কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হতে পারল মারগারেট, তাকাতে পারল চারদিকে। যে দিকেই তার চোখ যায় যে-কোন জিনিসের ওপরে তার চোখ পড়ে শিউরে ওঠে মারগারেট ত্রস্তে চোখ সরিয়ে নেয় সেখান থেকে কিংবা চোখ সরিয়ে নিতে পারে না, চোখ অচল স্থির হয়ে পড়ে থাকে তার ওপরে। তারপর পুকুর-পুকুর জলের নিচে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেলে তখন সম্বিৎ ফিরে আসে। উঠে দাঁড়ায় মারগারেট এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যায়, ঘরে ঘরে ঘোরে। বাক্স পেট্রা ড্রয়ার আলমারি খোলে, দেখে, এটা ওটার ওপর হাত বুলোয় তারপর যেখানকার যা গুছিয়ে রেখে আর এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়। চোখটা ক্রমশ খরখরে হয়ে উঠে, রোদে পোড়া যেন, এমন জ্বালা করতে থাকে চোখ; কিন্তু থামতে পারে না কোথাও, পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়, পেছন থেকে কিছুতে ঠেলে, সামনে থেকে কিছুতে টানে। মারগারেট অস্থির পা ফেলে ফেলে এগোয়। এক জায়গায় এসে হাত দিয়ে কিছু তোলে—মা সুচের কাজ করছিলেন, অসম্পূর্ণ পড়ে আছে কাজটা, কাপড়ের এক প্রান্তে সুচটা ফোঁড়া রয়েছে, সুচের ছিদ্রে সুতোটা ঝুলছে যেন এইমাত্র কাজটা রেখে মা কোথাও গেছেন। মারগারেট কাজটা রেখে সরে এল চোখ পড়ল দাদার বিশাল তলোয়ারটার ওপরে, দরজার পাশে যেমন রেখেছিল দাদা তেমনি খাড়া রয়েছে। হাতলটা এমনভাবে আছে যেন এইমাত্র রেখে গেছে এক্ষুনি এসে তুলে নিয়ে যাবে। তারই ওপরে দেয়ালের পেরেকে ঝুলছে তার চামড়ার জারকিন। জারকিনটার ওপরে আস্তে করে হাত বুলোলো মারগারেট। তার মুখখানা ক্রমশ

আবার বিবর্ণ হয়ে উঠছিল, মুখে ক্রমশ ফুটে উঠছিল মরা মানুষের মুখের মতন মলিন নীল ছায়া, কেবল চোখটাই কেমন শুকনো করকরে এবং জলজল করছে। মায়ের শোবার ঘরে এসে দাঁড়াল সে। জানলা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। জানলার কাছে এল সে। জানলার পাশে মায়ের চেয়ারখানা এমনভাবে একটু ঘুরে আছে যেন মা এইমাত্র এখান থেকে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। মারগারেট আস্তে আস্তে এসে চেয়ারের পেছনে দাঁড়াল, চেয়ারের পিঠে হাতলে হাত বুলোতে লাগল আস্তে আস্তে, তারপরই হঠাৎ তার সারা শরীর কেঁপে উঠল হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে, চেয়ারটাকে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। যেন চেয়ারে কেউ বসে আছেন, বিষণ্ণ চোখে দেখছেন তাকে, চোখ দু'টি করুণ কিন্তু বড় মমতার দৃষ্টি সেখানে যেন তিনি সব বুঝতে পেরেছেন বুঝে ক্ষমা করেছেন তাকে। মারগারেট চেয়ারের গায়ে মাথা রেখে এতক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়ল, তার বুক নিংড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ঘরের নিশ্চল বাতাসে আর্ত চিৎকারে ভেঙে পড়ল—মা! মা গো!

মর্মান্তিক শোকের, নিদারুণ নিঃসঙ্গতার, অপরিসীম অনুতাপের বুঝি কোন ভাষা নেই।

১৮

রোডার হাটখোলায় সেই যে সর্বসমক্ষে মারগারেটের শাস্তি হল তারপর এক বছর কেটে গেছে কিন্তু খুব সহজে কাটেনি। বঞ্চনার আর হতাশার প্রতিটি নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ মুহূর্তকে মনে হয়েছে অনন্ত—কখনো ফুরোবে না। বারে বারে তাকে বড় বড় ঢোক গিলে পান করতে হয়েছে তার মুখের সামনে তুলে ধরা তিক্ততার পূর্ণ পাত্র। প্রতিবারই সে-পাত্র যেমন আগেকার পাত্র থেকে আকারে বড় তেমনি প্রকারে আরও বেশী তিক্ত। রিক্ত বিবর্ণ নিষ্ঠুর শীতের শাসনে রুক্ষ দেশটার দিকে এখন শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মারগারেট যেমন তাকিয়েছিল গ্রীষ্মের দিকে, শরতের দিকে। এই শীতের মতনই রিক্ত ঊষর ধূসর ছিল সেই দিনগুলির চলচ্ছক্তিহীন প্রতিটি মুহূর্ত, যেন ঠেকো্য ভর করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেছে—তবু গেছে; কিন্তু এই নির্মম শীত বুঝি আর কাটে না।

রোডা থেকে মাইল সাতেক দূরে একটা পড়ো বাড়ি। কারা কবে একদিন প্রয়োজনের গরজে গোলাবাড়িটা বানিয়েছিল প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতে সেই যে

ফেলে গেছে আর বাড়িটার দিকে ফিরে তাকায়নি। অবহেলার সেই ভগ্ন-দশা এখন বাড়িটার—কোথাও ছাদ ধসে গেছে কোথাও দেয়াল ভেঙে পড়েছে কোথাও কড়ি বরগাগুলি কংকালের হাড়গোড়ের মতন টেরা বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আছে শূন্যে। তবু একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ার আগে তখনও বাড়িটা নিজেকে কিঞ্চিৎ ধরে রাখতে পেরেছিল। তারই এককোণে ফেলে-যাওয়া পুরোনো বিচালীর ওপরে জড়সড় হয়ে বসে আছে মারগারেট। তার দু'বাহুর মধ্যে খুব যত্ন করে জড়ানো একটা পুঁটলি। সে পরম স্নেহে বুকের গভীরে ধরে রেখেছে পুঁটলিটা আবার দু'হাঁটু মুড়ে ঘিরে রেখেছে তাকে। তার অসহায় শূন্যদৃষ্টি অসাড় হয়ে পড়ে আছে বাইরে। বাইরে কিছু নেই, কিছুই দেখা যায় না। শুধু তুষার-কুয়াসার একটা ধুসর পর্দা আকাশ মাটি জুড়ে ঝুলে আছে। আজ পাঁচ দিন ধরে অবিরাম অনবরত তুষার ঝরছে। সঙ্গে বইছে তুমুল বাতাস। এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ায় তুষারের কণাগুলি একটা ঘন কুয়াসার আচ্ছাদন তৈরি করেছে। তার তলায় শীতের সূর্য সমূলে চাপা পড়ে গেছে। তার মরা আলোয় সামান্য দূরেরও কিছু দেখা যায় না। যেটুকু চোখে পড়ে সে কেবল বরফ। বরফে বরফে ঢেকে গেছে সারা দেশটা। কোথাও কোথাও দশ পনর ফুট ঘন হয়ে বরফ জমেছে। এই বরফের মধ্যে কোথায় যে খানা-খন্দ, কোন্‌খানকার বরফের মধ্যে কতখানি যে ফাঁকা ফাঁপা তা জানবার উপায় নেই। তাই এই দুর্গম বরফের মধ্যে বাইরে বেরোনোও বিপদ। আর বেরিয়ে মারগারেট যাবেই বা কোথায় আশেপাশে তিন মাইলের মধ্যে মনুষ্য-বসতির চিহ্নমাত্র নেই। তার কেবল চেয়ে থাকা। মিথ্যে পথ চাওয়া।

জীবনে যখন আর একবিন্দু আশা অবশিষ্ট থাকে না মৃতের মতনই তখন ঠাণ্ডা হয়ে যায় জীবন। মারগারেটেরও তাই যেত। অনেক আগেই সে হাল ছেড়ে দিত। বেঁচে থাকার এই নির্মম সংগ্রাম সে কিছুতেই আর চালিয়ে যেতে পারত না যদি না তার ভাঙা বুকে তৃণখণ্ডের মতন একরত্তি বিশ্বাস সে লালন করতে পারত। বলা যায় ওই বিশ্বাসের তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরেই দুঃখের এই অকূল সমুদ্রে ভেসে থাকতে পারছিল সে। সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছিল, তাকে এই প্রাণান্তক বিপদ থেকে উদ্ধার করতে তার প্রিয়তম অবশ্যই একদিন আসবে। তার সেই আশা পর্যন্ত তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। দিনের পর দিন এই দুঃসহ দুঃসময় সে এই বিশ্বাস বুকে করেই পার করে যাচ্ছিল। কিন্তু বিশ্বাসের সেই একরত্তি তৃণখণ্ড তার দুঃখের দুর্ভার বোঝা বুঝি আর বইতে

পারছিল না। পরম হতাশায় একদিন মারগারেট আত্মঘাতী হতে উদ্যত হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে হল। কী যেন মনে হল। অবাক হয়ে গেল মারগারেট। আত্মঘাতী হতে ভুলে গেল। অবিশ্বাস্য এক অনাস্বাদিত বোধে অভিভূত হয়ে রইল সে। তার নিরাশার নিশ্ছিদ্র তমিস্রার গভীরে বুঝি একবিন্দু আলো জ্বলছে; তার বুকের নিচে গোপনে নিভৃতে থরথর করে কাঁপছে তার নরম শিখা। সহসা এক নিমেষে সেই আলোর শিখা যেন তার গোটা অস্তিত্বকেই উজ্জ্বল করে তুলল। তার দুরদৃষ্টের জীবনে এ দুর্লভ সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে ভয় পেল সে। যদি তার দুরাশার বিশ্বাস অসম্ভবের লোভ হয়ে ওই দুর্বল শিখাটির গলা টিপে ধরে, মারগারেট নিশ্বাস বন্ধ করে রইল। হতাশা গ্লানি ও কষ্টের কঠোর জীবনে এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল মারগারেট, ওই দুঃখের জীবনই তার ভাগ্যবলে এমন স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করে নিয়েছিল যে, তার জীবনে আবার সুখ ফিরে আসছে কিছুতেই তা ভাবতে পারছিল না সে, অতিশয় অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল তার।

কিন্তু একটি একটি করে সংশয়ের সপ্তাহগুলি যতই কেটে যেতে থাকল মারগারেটও ততই নিঃসংশয় হয়ে উঠল। যাকে সে মনে করেছিল পাগলের আশা অসম্ভবের স্বপ্ন অবশেষে তাই রক্তে মাংসে জীবন পেল। এই তবে ফাউস্টের উত্তর—একলা নিভৃতে পরম দুঃখের চোখের জলে ভেসে দিনরাত ফাউস্টের কাছে যে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিল এইভাবেই সে তার জবাব দিয়েছে। তার প্রার্থনার বিস্ময়কর জবাব। একেই বুঝি বলে যথার্থ আলোকিত-করণ।

সেই থেকে পরম যত্নে ও সাবধানে তার বুকের নিচে নবজীবনের পলকা শিখাটিকে সে লালন করে চলল, তার সমস্ত শক্তি সমগ্র মমতা সন্তর্পণে বেষ্টন করে রইল তার গর্ভের আশ্রয়ে প্রচ্ছন্ন সেই জীবনটিকে। হয়ত ফাউস্ট কারো হাতে নিহত হয়েছে কিংবা ফাউস্টের সঙ্গে তার আর কোনদিন দেখা হবে না এই যদি নিয়তি হয় তবু আজ আর হতাশ হবে না মারগারেট। ফাউস্টের কাছ থেকে যে অমূল্য উপহার সে পেয়েছে তাই হয়ে থাকবে ফাউস্টের সঙ্গে তার অনন্তকালের সম্পর্ক। সেই অমিয় সম্পর্ক কবে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে তারই প্রতীক্ষায় দিন গুনতে গুনতে মারগারেট ভাবে, ঈশ্বর করুণাময়, তিনি সব পাপই ক্ষমা করেন।

গির্জার নির্দেশে সব বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করেছে তাকে। তার সম্বন্ধে গির্জার

ধারণা কানে কানে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত রোডায়। সবাই ভয় পাচ্ছে তাকে। সবাই বিশ্বাস করে বসে আছে, সে পাপী, শয়তানের এক গুপ্তঘাতকের সঙ্গে যোগসাজস রয়েছে তার।

ঘরের আসবাবপত্র সব বেচে দিয়ে হাতে যে-ক'টা টাকা হল ট্যাঁকে গুঁজে বেরিয়ে পড়েছিল মারগারেট। প্রতিবেশীর কঠিন দৃষ্টি কর্কশ কটূক্তি আর মর্মান্তিক স্মৃতির মধ্যে সে আর রোডায় থাকতে পারছিল না। তার তখন সব-বড় প্রয়োজন একটা নিরাপদ আশ্রয়—যেখানে কেউ তার পরিচয় জানবে না। যেখানে সে কোন গৃহস্থের স্নেহের ছায়া পাবে, পাবে কিছু কাজ, যে নতুন আশা তার বুকের নিভৃতে তিলে তিলে বাড়ছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে অর্থ চাই, নিরাপত্তা চাই। কিন্তু মারগারেট চাইলেই পাবে কেন? সে পালিয়ে পার পাবে রোডার মানুষের, পবিত্রতার ন্যাস-রক্ষক রোডার পাদ্রীদের তা সহ্য হবে কেন? তাই মারগারেটের ভাগ্যে শান্তি মিলল না। গীর্জার চর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাপের গন্ধ শুঁকে শুঁকে তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হানা দিচ্ছে বাড়ি বাড়ি। যেখানেই মারগারেটকে পাচ্ছে হেনস্তা করছে, তাকে পাপের বাহক শয়তানের দোসর বলে সাবধান করে দিচ্ছে গৃহস্থকে। ফলে দু'দিনও সে কোন গৃহে ঠাঁই পাচ্ছে না। দু'দিনও সে কোন গ্রামে তিষ্ঠিতে পারছে না। গীর্জার জেদ মারগারেটের কাছ থেকে তারা স্বীকারোক্তি আদায় করবে। তার 'পুরুষের' নাম ঠিকানা না-বলা অবধি ছাড়বে না তারা তাকে। তার পুরুষই ভেলেনটিনকে খুন করেছে। সেই খুনেকে গ্রেফতার করা চাই, শয়তানকে শাস্তি দিতেই হবে—গীর্জার পণ। তাই গীর্জার চর মারগারেটকে তাড়া করে ফিরছে। তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাদের জেদ তার মনের জোর ভেঙে দেবে তারা। তবেই ওই একরোখা মেয়ে জব্দ হবে, মাথা নোয়াবে, স্বীকারোক্তি করবে।

আশ্রয় চেয়ে মারগারেট কখনো বিমুখ হয়নি। সবাই তাকে আদর করে আশ্রয় দিয়েছে। সূচের কাজ এমব্রয়ডারির কাজ দিয়েছে তাকে। ছোট-খাটো গৃহস্থ মধ্যবিত্তের দরজা তার জন্যে খোলাই ছিল। সেখানে প্রীতি ছিল আন্তরিকতাও ছিল; কিন্তু গীর্জার চর তার চরিত্রের কথা গৃহস্থের কানে তুলতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে তারা। মারগারেটের নম্র শান্ত করুণ মুখখানা যাদের ভাল লেগেছে তারা গীর্জার বিরাগভাজন হতে ভয় পেয়েছে তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বিদায় দিয়েছে তারা। বিদায় দিতে দুঃখ পেয়েছে, দুঃখ প্রকাশ করেছে,

সান্ত্বনা দিয়ে ও হাতে কিছু খাদ্য আর অর্থ দিয়ে বিদায় করেছে তাকে। কিন্তু সব মানুষ সমান নয়। কেউ কেউ, মানে তারাই সংখ্যায় বেশী যারা গীর্জার লোকদের কাছে মারগারেটের নোংরা চরিত্রের খবর শুনে চটে গেছে তৎক্ষণাৎ গালমন্দ করে এক কাপড়ে বিদেয় করে দিয়েছে। পাপ পাছে বেঁচে থাকে তার পাওনা কড়িও দিতে চায়নি, দেয়নি। তার ছায়াও অস্পৃশ্য হয়ে উঠেছিল তাদের কাছে। যেন পাপ তক্ষুনি বিদেয় না হলে বাড়িতে বজ্রাঘাত হবে। বেঁচে থাকলে গ্রাম অভিশপ্ত হবে। তবু মারগারেট আত্মঘাতী হতে পারেনি। বরং যে নরম পল্‌কা নবজীবনটি তার মধ্যে অল্পে অল্পে বড় হচ্ছে যাকে সে অনুক্ষণ বুকের নিচে অনুভব করছে, সে-ই যার একমাত্র রক্ষক—তার জন্যে যে-কোন কষ্টের কাজ করতে যে-কোন গঞ্জনা সহ্য করতে সে আরও শক্ত হয়ে উঠল।

অনেক দূরে অজ পাড়াগাঁয়ে এসে সেই শক্ত কাজই খুঁজতে লাগল। থালা-বাসন ধোয়ার কাজ, ঘর মোছা, ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ কিংবা তার চেয়েও হীন, তার চেয়েও কষ্টসাধ্য কাজ পেতে চেষ্টা করল সে। পেলও। এবং তাকে গির্জার চর আর খুঁজে পেল না বলে কয়েকমাস সে সে-কাজ নির্বিঘ্নে করতেও পারল। অধিকন্তু এসময়ে তার যা সবচেয়ে দরকার—একটা উষ্ণ আশ্রয়, কিছু সুখাদ্য—তাও সে পেল, পেল কিছু নগদ অর্থও। সেই নগদ টাকা ক'টা সে অত্যন্ত কৃপণের মতন রুমালে বেঁধে বুকের মধ্যে গুঁজে রাখল। আর পুঁটলি বেঁধে রাখতে লাগল এখানে ওখানে কুড়িয়ে-পাওয়া ফ্লানেলের টুকরো, উল ও সিল্‌কের ছেঁড়া জামা-কাপড়। অবশেষে দিন যখন তার ক্রমশ ঘনিয়ে আসতে থাকল উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় ততই সে সিঁটিয়ে উঠতে লাগল। এই প্রবাসে আগন্তুক পরিবেশে তার সন্তান জন্মাবে সেই তার সবচেয়ে বড় ভয়। তার আশঙ্কা এই মানুষগুলি তার সন্তান হওয়াটাকে নিশ্চয়ই ভাল চোখে দেখবে না অধিকন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠবে। এক লক্ষ প্রশ্ন করবে। শেষমেশ যখন তার পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবে পথের কুকুরের মতন তারা তাকে এই নিশ্চিত আহার ও আশ্রয় থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। ভয়ে ভাবনায় এভাবে কিছুদিন সিঁটিয়ে থেকে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে একদিন রাতে সে সকলের অজান্তে নিঃশব্দে নিরাপদ আশ্রয় থেকে অজানা অনির্দিষ্ট পথে বেরিয়ে পড়ল।

মনে মনে স্থির করেছিল মাসির বাড়ি যাবে। তার কাছে আশ্রয় চাইবে অবশ্য আশ্রয় পাবে কিনা সে বিষয়ে তার যথেষ্ট সংশয় ছিল। মাসি তার বিরুদ্ধে

গির্জায় সাক্ষ্য দিয়েছিল তাকে সামনে ডেকে যৎপরোনাস্তি গালমন্দ করেছিল সুতরাং সে যে আশ্রয় দেবে সে-বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই তবু অনন্যোপায় মারগারেট মাসির বাড়ির দিকেই রওনা হল। তার জন্যে না হোক তার এই পেটের সন্তানটির জন্যে অন্তত মাসি দয়া করবে। তার এই দশা দেখে মাসির মনে করুণা হবে। অন্তত কয়েটা দিনের জন্যে হলেও সে সেখানে আশ্রয় পাবে। মাসি ছাড়া তার আর কে আছে, কোথায় আর সে যাবে।

কিন্তু যাব বললেই কি পৌঁছন যায় নাকি। মাসির বাড়ি ত আর কাছে পিঠে নয়, সেই রোডায়। রোডা এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূর। তবু অনন্যোপায় মেয়ে দুঃসাহসে ভর করে হাঁটতে থাকল। হাঁটলে ক্লান্ত হয়। হাঁটলে ক্ষুধা পায়। কিন্তু একটু বিশ্রাম একটু খাদ্যের জন্যে কারো দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইতে পারে না মারগারেট। দ্বিধায় জড়ানো পায় আস্তে আস্তে এসে গৃহস্থের বাড়িতে ওঠে শুকনো গলায় বলে, তোমাদের ধোয়া-মোছার কাজ আছে? খড়-কুটো গোছানোর কাজ? একটু জিরোতে পারলে দু'মুঠো খোরাক পেলেই করে দেব, নগদ কিছু চাইনে। তা কাজ দিয়েছে অনেকে, অনেকে চেহারা দেখে শরীরের অবস্থা দেখে কাজ না দিয়েই খেতে দিয়েছে, বসতে বিশ্রাম করতে দিয়েছে। এই করে অনেক দুর হেঁটেছে মারগারেট কিন্তু তবু সে আর তার মাসির বাড়ি পৌঁছতে পারেনি কোনদিন, তিনদিনের মাথায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কোনমতে নিজের অক্ষম অসুস্থ শরীরটাকে বয়ে বয়ে শেষে একটা ভাঙা পড়ো বাড়িতে বাড়ি নয়ত একটা খড়ের ঘর, তার ভিতরে ঢুকেই অচৈতন্য হয়ে পড়েছে।

সেই রাতেই একটি সন্তান হয়েছে তার। নরম তুলতুলে দুর্বল একটি ছেলে। তার সমস্ত দুঃখের উৎস তার সমস্ত দুর্ভোগের মূল তার নিরুপায় বর্তমান অবস্থার প্রতীক—ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি থেকে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে কেঁদে উঠছে শিশু। অথচ যেন শিশুটি কাঁদছে না, কাঁদছে মারগারেটেরই জীবন-যন্ত্রণা; এতদিন যে যন্ত্রণা তার অস্তিত্বের গভীরে অব্যক্ত বেদনায় মাথা খুঁড়ছিল তাই যেন এখন ক্ষণে ক্ষণে শিশু কণ্ঠে ব্যক্ত হচ্ছে।

কিন্তু মারগারেট মাথা নাড়ে। না রে না, তুই আমার সুখ, আমার বেঁচে থাকার সাহস। তুই আমার পুরুষের পরম প্রেমের দুর্লভ উপহার, আমার গলায় মুক্তোর মালা তুই। তোকে পেয়ে আমার জীবন নতুন করে বাঁচবার আগ্রহে আবার করে পাপড়ি মেলে দিয়েছে।

আনন্দে আচ্ছন্ন আবিষ্ট হয়ে গেছে মারগারেট। সমস্ত দুঃখ হতাশা,

আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছা সব তার মন থেকে একনিমেষে মুছে গেছে; প্রকাশের অতীত এক অতলান্ত সুখের শুশ্রূষায় শান্ত সে তার গোটা জীবনকে বাহুতে বুকে জড়িয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। তার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে চলেছে বিচিত্র সব মধুর চিন্তা, কল্পনা।

এরই সপ্তাহ তিনেক পরের কথা আগে বলেছি। গোলা-বাড়িটার ভাঙা ঘরে শিশুটিকে বুকে করে জড়সড় হয়ে বসে ছিল মারগারেট। নিরুপায় ঝাপসা চোখে আকাশ দেখছিল। নিরালোক আকাশ জুড়ে কেবল তুষার ঝরছে। কড়ি-বরগার মাঝখানের ফাঁক জুড়ে ঝুলছে তুষারের পরদা। থেকে থেকে ঝড়ো হাওয়া শিস্ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভাঙা বাড়ির দোদুল্যমান জানলা-দরজা কাঁপিয়ে ; বাড়িটাকে অসহায় মানুষ দু'টি শুদ্ধ গুঁড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে দিতে পারছে না বলেই যেন এমন নিদারুণ আক্রোশে ফেটে পড়ছে বারবার। তুষার ঝাপটায় সর্বাঙ্গ থর্‌থর্ করে কাঁপছে মারগারেটের, ঠাণ্ডায় বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে। তা আসুক মারগারেট গ্রাহ্য করে না। কোন শারীরিক কষ্টকেই সে আর কষ্ট মনে করে না আজ। ভিজে খড়ের ওপরে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে পড়ে আছে সে, সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে ঠাণ্ডায়, ক্ষুধায় অন্ত্রের সমস্ত যন্ত্র জ্বলছে, পিপাসায় শুকিয়ে ঠোঁট তালু জিভ কাঠ-কাঠ হয়ে উঠেছে তা উঠুক কোন কষ্টকেই সে আর কষ্ট মনে করে না ; বুকের মধ্যে দু'হাতে সে যে-জীবনের পলকা শিখাটিকে ধরে আছে তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার সমগ্র জীবন। তার জীবনের লক্ষ্য, তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন সবই আজ স্থির করে দিচ্ছে ওই ছোট্ট শিশুটি, তার বুকের ধুকপুকিই ক্রমাগত তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দুঃখের দুর্গম পথে সে এক নিঃসঙ্গ যাত্রী। তার ত আর স্থির হয়ে বসে থাকা চলবে না। শিশুটিকে বাঁচাতে হলে তার অবিলম্বে চাই ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল একটি উষ্ণ আশ্রয়। যেমন করেই হোক তাকে তা জোগাড় করে নিতেই হবে। দেহের অবশিষ্ট সামর্থ্য শেষ চেষ্টায় শক্ত করে উঠে দাঁড়াল মারগারেট। ফ্লানেলের জামায় মোজায় শিশুটি বেশ ভাল করেই ঢাকা ছিল তার ওপর দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল একটা কম্বল এখন আবার সেই কম্বলের ওপর দিয়ে তার পিঠ পা ঢেকে জড়িয়ে দিল নিজের গায়ের পেটিকোটটা তারপর মুখের ঢাকনাটা সামান্য সরিয়ে তাকে দেখল একবার, হাসল তার চোখে চোখ রেখে, ছোট্ট করে একটি চুমু খেতে ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু ঠাণ্ডা ঠোঁটটা তার ঠোঁটে ছোঁয়াতে সাহস পেল না মারগারেট। সে তাকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে একটু নুয়ে পড়ে বুক দিয়ে ঢেকে ফেলল।

ফিসফিস্ করে বলে উঠল, ফাউস্ট ফাউস্ট, আমার ছোট্ট ফাউস্ট, আমার পাপের শাস্তি তুমিও কী ভুগবে, তুমি কেন ভুগবে গো ? তোমার কী দোষ ? না না আমি তোমাকে কিছুতেই কষ্ট ভুগতে দেব না। এ আমার পণ। আমি প্রাণপণে তোমাকে রক্ষা করব। আমার ফাউস্ট, আমার ছোট্ট ফাউস্ট। সে তার বুকের গভীরে আরও ঘনিষ্ঠ করে টেনে নিল তাকে। তারপর তাকাল আকাশের দিকে।

আকাশ সেদিন প্রসন্নই ছিল। একটা উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটেছিল আবহাওয়ায়, বাতাস পড়ে গিয়েছিল তুষার বৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল। মেঘ কেটে গিয়ে ফুটে উঠেছিল ঝকমকে রোদ আর এই সুযোগে মারগারেট চেয়েছিল প্রাণপণ হেঁটে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাসির কাছে পৌঁছতে। সঙ্গে তার মাত্র একদিনের খাদ্য। দুঃসাহসের সেই যাত্রায় নির্বিঘ্নে সে অনেক দূর হেঁটেও এসেছিল—আর মাত্র দশ মাইল পথ তার সামনে। এটুকু পথ সে রাত নামবার আগেই পার হয়ে যেতে পারবে, সন্ধ্যার আগেই সে পৌঁছে যেতে পারবে মাসির বাড়ি, মনে মনে চিন্তা করল মারগারেট ; কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে-না-যেতেই আকাশের নীল সবটুকু গ্রাস করে আবার সেই কালচে লাল মেঘে পুঞ্জ হয়ে উঠল। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। বাতাস উঠল। হু-হু করে বইতে লাগল ঝড়ের বাতাস। এবং দেখতে দেখতে শুরু হল তুষার-বৃষ্টি, হিমঝঞ্ঝায় আকাশ-মাটি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভাগ্য ভাল তার আগেই দু'শ' আড়াই শ' গজ দূরে পথের ধারে একটা গোলা-বাড়ি চোখে পড়েছিল তার। এখন সেই অন্ধকার-করা তুষার-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণে ছুটল সে সেই গোলাবাড়ির দিকে। কিন্তু ছুটে চলা কি সহজ ঝড়ের বাতাস তুষারকণা নিয়ে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপরে। চোখ মেলে পথ-চলতে পারছে না মারগারেট বারে বারে হোঁচট খাচ্ছে, পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াচ্ছে, ছুটতে গিয়ে বাতাসের ঝাপটায় দাঁড়িয়ে পড়ছে, এ-ভাবে অনেক ক্ষণে অনেক কষ্টে কোনমতে এসে পৌঁছল সেই গোলাবাড়ির মধ্যে। তাড়াতাড়ি ছেলের গা থেকে বরফের টুকরোগুলি ঝেড়ে ফেলল, হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল ঘরের কোণে ভিজে খড়ের গাদার ওপরে। ছেলেকে বুকের মধ্যে দোলাতে দোলাতে অসহায় চোখে তাকাল আকাশের দিকে। শূন্যদৃষ্টি মেলে দেখতে থাকল তুষার-বৃষ্টি। অঝোরে তুষার ঝরছে বাতাস মাতালের মতন উথাল-পাথাল ছুটছে। অবিরাম অবিশ্রাম সেই হিমঝঞ্ঝার মাতামাতি চলল সারারাত। দেখতে দেখতে দরজা জুড়ে পাহাড় হয়ে উঠল তুষার। অবসাদে ক্লান্তিতে

ক্ষুধায় চোখ বুজে আসছিল মারগারেটের। কিন্তু চোখ বুজতে সাহস ছিল না তার। অবাধ্য অবসন্ন চোখের পাতা সে জোর করে মেলে রাখল। সেই চোখের সামনে রাত ভরে চলল তুষার ঝড়ের তাণ্ডব। তার পরের দিনও সারাদিন। সন্ধ্যার দিকে সেই দামাল ঝড় মিইয়ে এল, পাগলামি থামল তার। তুষারপাত পাতলা হতে হতে এক সময়ে একেবারে থেমে গেল। কিন্তু মারগারেটের শরীরে আর সাড় নেই তখন। তার তখন কেবল চাই খাদ্য আশ্রয় উত্তাপ। কিন্তু কোথায় উষ্ণ-গৃহকোণ, কোথায় খাদ্য। কোথায় গেলে সে পাবে তা। আর যাবেই বা কেমন করে, তার হাত পা ঠাণ্ডায় অসাড় শক্ত হয়ে গেছে। শিরা-উপশিরার রক্ত কী তবে জমে বরফ হয়ে গেল! ক্ষীণকণ্ঠে শিশুটি তখন প্রাণপণে কান্না জুড়ে দিয়েছে। মারগারেট উঠে দাঁড়াল। তাকে পায়চারি করতে হবে। যতক্ষণ না সে কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে তার দেহের রক্ত গরম রাখতে হবে, না হলে, না হলে কী যে হবে ভেবে শিউরে উঠে শিশুর মুখের দিকে সে করুণ বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল।

শিশুর মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা প্রবল মনোবল সঞ্চারিত হল তার মধ্যে। অসমর্থ পা থরথর করে কাঁপছিল। সেই কাঁপুনি থামাতে অনেকক্ষণ তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল যখন পায়ে কিছু বল এল সে তার শেষ শক্তি জড়ো করে আর একবার বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে। এই তার অন্তিম প্রয়াস। কিন্তু পথ কোথায়! চারদিকে স্তূপ স্তূপ তুষার তার মধ্যে পথ-চিহ্ন কোথাও চোখে পড়ল না তার। তবু সে বেরিয়ে পড়ল, মনে মনে একটা রাস্তা কল্পনা করে সে দিকেই অচল দেহটাকে টেনে টেনে চলতে থাকল।

প্রতি পদক্ষেপে মনে হতে থাকল তার, যেন সে অন্তহীন তুষার-প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে অনন্তকাল ধরে পথ চলছে। চলতে পারছে না। এঁটেল কাদার মতন দু'পায়ের হাঁটু অবধি ভারি হয়ে লেপটে গেছে তুষার। পা তুলতে যেমন কষ্ট পা ফেলতে ততোধিক। পদে পদে তাই হোঁচট খেতে খেতে সামলে যাচ্ছে, টলতে টলতে দাঁড়িয়ে পড়ছে, আবার চলছে। এমনি করে হেলেদুলে টাল-মাটাল হয়ে তবু পথ চলছে মারগারেট। থামছে না। যেন পণ করেছে থামবে না। যেন জেনে গেছে থামলে আর চলতে পারবে না। থামলেই মৃত্যু। অবধারিত মৃত্যুর দিকেই যেন সে এগিয়ে চলেছে। জনমানবশূন্য ধূসর তুষার প্রান্তরের প্রান্তে আর কিছু আছে বলে ভাবতে পারছে না মারগারেট। একটা কুঁড়েঘরের চূড়া একটা গৃহস্থবাড়ির চিমনীও চোখে পড়ছে না মারগারেটের। তবু, তবু সে

হাঁটছে, হোঁচট খাচ্ছে, টালমাটাল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, আবার হাঁটছে।

হঠাৎ দূরে একটা মাঠকোঠা চোখে পড়ল মারগারেটের। সত্যি না মরীচিকা অসুস্থ চিন্তার ছবি নাকি, যাই হোক মারগারেট প্রাণপণ ছুটল সেই দিকে, শিশুটিকে বুকে করে, বুকের সবটুকু উত্তাপ শিশুর দেহে সঞ্চারিত করে দিতে দিতে ছুটল।

না, অসুস্থ চিন্তার ছবি কি মরীচিকা নয় সত্যি সত্যি একটা গৃহস্থবাড়ি। ঝাঁপিয়ে পড়ে মারগারেট দরজার ওপরে প্রাণপণে ঘা মারতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে যেন কত যুগ অপেক্ষার পরে ভিতর থেকে কার সাড়া পেল মারগারেট, আশায় জ্বলে উঠল মারগারেটের নিবন্ত প্রাণের শিখা। দরজাটা সামান্য ফাঁক হল—মুখের এক ফালি দেখতে পেল মারগারেট, রুক্ষ বিরক্ত এক প্রবীণার শক্ত চোয়াল।

মারগারেট চিৎকার করে উঠল—একটু আশ্রয় দিন আমাকে, আমার এই শিশুটিকে। মারগারেটের সে আকুল চিৎকার মনে হল যেন কোন ক্ষীণকণ্ঠের ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ।

একবার তীক্ষ্ণ চোখটা তার সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে মহিলা বলল—এস, ভিতরে এস। বাইরে থাকলে জমে বরফ হয়ে যাবে।

ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে, কৃতজ্ঞতার আবেগে মারগারেট ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, অক্ষম শরীরটাকে কোনমতে ঠেকে দিল ঘরের মধ্যে। আহ্‌ কি গরম, খুব বড় করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মারগারেট। পরম তৃপ্তির লক্ষ হাসির টুকরো যেন লক্ষ লক্ষ শিখা হয়ে লকলক করছিল উনুনে, উনুনের ওপরে সিদ্ধ হচ্ছিল সুগন্ধ ঝোল। বুক ভরে সেই সুগন্ধ টেনে নিয়ে উত্তাপে সমস্ত শরীর ভরে ফেলে মারগারেট ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল। এবার সে তার শিশুটিকে বাঁচাতে পারবে, নিজেকে বাঁচাতে পারবে। একটু আরামে থাকতে পারবে তারা। ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিয়েছে বটে, তার পাপের শাস্তি, সে ত তার পাওনা; পেতেই হবে; কিন্তু পরম করুণাময় ঈশ্বর কাউকে ভোলে না, ঈশ্বর তাকেও ভোলে নি।

মহিলাটি অনেকক্ষণ ধরে ভ্রূকুঁচকে তাকিয়েছিল মারগারেটের দিকে। এখন হঠাৎ একেবারে তার গায়ের ওপরে এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে তার মুখের কম্বলটা টান মেরে সরিয়ে দিলে তারপর নির্মম গলায় বললে—তুই সেই মারগারেট না, রোডায় তুই শাস্তি খেয়েছিলি না। তুই নিশ্চয় সেই বেশ্যা মারগারেট। আমি ঠিক চিনেছি। কঠিন গলার কর্কশ শব্দে সর্বাঙ্গে শিউরে

উঠল মারগারেট। হাঁ হয়ে গেল তার মুখ, চোখ বন্ধ হয়ে গেল। একটা শব্দও বেরোল না তার মুখ দিয়ে।

—তুই যদি সে মারগারেট হোস ত এক্ষুনি বেরিয়ে যা, এক্ষনি দূর হ, তোর নিঃশ্বাসে এ বাড়ির বাতাস বিষ হয়ে যাবে।

—ওগো না, না, দয়া কর তুমি দয়া কর, আমার ছেলেটাকে বাঁচাও, বাঁচাও। হাহাকার করে কেঁদে উঠল মারগারেট।

কিন্তু বরফ-কঠিন মহিলার মন এতটুকু টলল না, বললে, যা, এক্ষুনি বেরো, শয়তানের বাচ্চা নিয়ে নরকে যা তুই। এখানে না। এক মুহূর্ত না।

—না। আমি যাব না। আমাকে যেতে বল না। এই হিম-ঠাণ্ডায় আমার শিশুটি বাঁচবে না। ওগো দয়া কর। শিশুটির মুখ চেয়ে একটু প্রসন্ন হও। দু'হাতের অঞ্জলিতে শিশুটিকে তার সামনে তুলে ধরল মারগারেট। মাগো আমি আর পারছি না। গলা বুজে এল তার। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু সে-কান্না ওই পাষাণ বুকে এতটুকু দাগ কাটল না; মারগারেটের আকুল মিনতি, শিশুটির শীতার্ত পাণ্ডুর মুখও গলাতে পারল না তার কঠিন মন। সে ক্ষিপ্ত গলায় বলে উঠল: বের হ বেশ্যামাগী, ওই পাপ-চোখ নিয়ে এখুনি দূর হ। বলে সে নিজেই দরজা খুলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল তাকে। ধাক্কার চোটে মারগারেট দরজার বাইরে বরফের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সেদিকে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালোও না মানুষটা। সশব্দে দরজা বন্ধ করে দরজায় খিল এঁটে দিলে।

যত রাত বাড়ছিল বাড়ছিল তুষার বৃষ্টি। সেই অঝোর তুষার বর্ষণের মধ্যে দিয়ে বরফ-চাপা বিশাল মাঠের বরফ থেকে ঠিকরে-পড়া নীল-নীল আলোয় একটা গর্ত মতন জায়গায় দেখা যাচ্ছিল একটা কালো বস্তুর ক্ষীণ আভাস। বস্তুটি আসলে মারগারেট। হিম-বাতাসের ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচানোর মিথ্যে চেষ্টায় সে সেখানে বসে বসে দুলছিল আর ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে উঠছিল। তার শরীরের আধখানা তুষারের চাদরে ঢেকে গেছে। কেবল মাথা আর কাঁধ দেখা যাচ্ছে তার। তার তখন অচৈতন্য অবস্থা। বিকারগ্রস্ত রোগীর মতন চোখ দু'টো বিস্ফারিত, অনেক দূরের দিকে প্রসারিত হয়ে আছে দৃষ্টি; যেন দীর্ঘ অস্তিত্বের মানুষ। তার অবসন্ন শরীরটা বিপন্ন হয়ে পড়ে আছে মনটা প্রতিজ্ঞায়

প্রবল হয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে তাকে যেতেই হবে যে, সে এখন এভাবে মরবে না, মরতে পারবে না, মরা চলবে না তার, তার প্রাণের প্রদীপ শিশুটিকে যে বাঁচাতেই হবে। অতএব এই বরফের অফুরন্ত গালিচার ওপর দিয়ে অনন্তকাল হেঁটে যাওয়াই তার নিয়তি—তার শাস্তি। পায়ে পায়ে এই বরফের কাঁপা আস্তরণ ভেঙে যাবে। গর্তে পড়ে যাবে তার পা। সে হোঁচট খাবে। টালমাটাল হবে। আছড়ে পড়ে যাবে বরফের ওপরে। আবার উঠে দাঁড়াবে। চলবে। চলতে থাকবে। বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখবে তার অমূল্য রত্নটিকে, ভঙ্গুর পলকা এই অসহায় প্রাণটিকে আপন প্রাণের উত্তাপ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে। কিছুতেই বক্ষচ্যুত করবে না। বক্ষচ্যুত হতে দেবে না সে কিছুতেই। চলতে চলতে এই ছোট্ট পুতুল-প্রাণটিও যখন ভীষণ ভারী মনে হবে। তখনও সে তাকে বুকে আঁকড়ে রাখবে। তখনও সে হাঁটবে। হাঁটতে থাকবে। থামবে না।… থামছে না মারগারেট। টলছে, কাঁপছে, হোঁচট খাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়াচ্ছে। আবার হাঁটছে। হিমেল ঝড়ো বাতাস হা-হা শব্দে ক্রমাগত কানে কানে বলছে—ফেলে দে, ওই বোঝা বুকে করে তুই হাঁটতে পারছিস না তবু কেন বইছিস। ফেলে দে। ফেলে দিলে হাল্‌কা হবি তখন তবু হাঁটতে পারবি। একটু জোরে হাঁটতে পারবি, আরামে হাঁটতে পারবি। কিন্তু যত ওই হিস্‌-হিস্‌ শব্দ ওই নির্মম কথা তার কানে বাজছে ততই সে ভয় পাচ্ছে, যত ভয় পাচ্ছে তত সে আঁকড়ে ধরছে তার বুকের বোঝা, তত সে বোঝাতে চাইছে নিজেকে—এই বরফের গালিচা এক সময় নিশ্চয় শেষ হবে। সেই শেষ প্রান্তে কার সঙ্গে তার দেখা হবে সেও তার জানা। অবধারিত, সে জানে, সেখানে সোনার সিংহাসনে বসে আছেন ঈশ্বর। তাঁকে ঘিরে দেবদূতগণ গাইছে, নাচছে। আরতি করছে তাঁর। সেখানে পৌঁছেই সে তার বক্ষমণি দু'হাতে তুলে ধরবে তাঁর সামনে। কিছু বলবে? না, কিছুই বলতে হবে না তার। তিনি দেখামাত্রই বুঝবেন, এ শিশু তারই গর্ভের সন্তান। তাঁর কাছে তার কোন করুণা ভিক্ষা করতে হবে না। চাইতে হবে না কোন ক্ষমা। করুণাময় তিনি। দেখামাত্র তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। সে কেবল তাঁর উদার প্রশান্ত দৃষ্টির সামনে তুলে ধরবে তার শিশুটিকে। শিশুটিকে দেখামাত্র তাঁর মুখে কোমল স্নেহের ক্ষমা-সুন্দর হাসি ফুটে উঠবে। হাসি ফুটে উঠবে দেব-দূতদের মুখে। তারপর আর কোন দুঃখ থাকবে না তার। আর কোন যন্ত্রণা, আর কোন মর্ম-পীড়ায় ভুগবে না সে। সেখানে পৌঁছতে পারলে আর কিছু চাওয়ার, আর কিছু পাওয়ার থাকবে না তার।

সুতরাং যে করেই হোক তাকে যেতে হবে সেখানে। যেতেই হবে। তার শিশুটিকে বুকে করে বয়ে নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে সেই সোনার সিংহাসনের সামনে।···কিন্তু তার শিশু তার সাত রাজার ধন বুকের মাণিক, কই সে? যেন হঠাৎ স্বপ্ন ভঙ্গ হল তার। জেগে উঠল সে। শিউরে উঠল। সে ঠাণ্ডায় এমনই জমে গিয়েছিল যে, অনুভবই করতে পারছিল না, তার বুকের আড়ালে তার বাহু-বেষ্টনীর মধ্যে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে শিশু। চোখ নামিয়ে দেখল মারগারেট। চুমু খেতে সাহস পেল না পাছে তার বরফ-ঠাণ্ডা ঠোঁটের স্পর্শে হিম হয়ে যায় শিশুর পলকা-শরীর। শুধু দেখেই, আছে জেনেই, আশ্বস্ত হল সে। সে আরও নিবিড় করে বুকে জড়িয়ে ধরল তার শিশুকে—তারপরেই আবার চেতনাহীনতার তলায় ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকল—আবার সেই পদযাত্রার স্বপ্ন আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে।···

শুকনো পাতার মতন অঝোরে ঝরছিল তুষারের তুলো-নরম টুকরোগুলি। মনে হচ্ছিল যেন তুষারপাত নয়, আকাশ মাটি জুড়ে একটা ধূসর রঙের মোটা পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পর্দার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কয়েকটা লণ্ঠনের আলো। আলোগুলি দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছিল। যতই এগিয়ে আসছিল আলোগুলি ততই অস্ফুট একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল আলোর পেছনে। ক্রমশ তুষার পর্দায় লণ্ঠনের আলোয় উজ্জ্বল কিছু মানুষের অবয়ব ফুটে উঠল। শোনা যেতে লাগল অস্ত্রপাতির ঝনঝনা, সৈনিক-পোশাকের খসখস আওয়াজ।

'হল্ট', একটা আদেশের স্বর বেজে উঠল বাতাসে। 'সামনে একটা কালো মতন কি যেন নড়ছে, মনে হচ্ছে।'

দলটা পথ ছেড়ে মাঠে নেমে এল। মারগারেটের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। দলটা গির্জার পাহারাদারদের। রাত্রির চৌকিতে বেরিয়েছে। একজন চৌকিদার হাতের লণ্ঠনটা মারগারেটের মুখের সামনে আনল, মুখ দেখেই চমকে উঠে চেচিয়ে বলল সে—আরে এ যে মেয়েছেলে দেখছি। ঝড়ের মধ্যে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল নিশ্চয়। বরফে প্রায় ডুবে গেছে। অভাগী বেঁচে আছে কি না কে জানে!

সর্দার চৌকিদার এগিয়ে এল। মারগারেটের মুখের কাছে মুখ এনে তাকে ভাল করে দেখতে দেখতে সন্দেহে কৌতূহলে তার চোখ চকচক করে উঠল। ভাল করে আর এক নজর দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। গম্ভীর গলায় বলল, যাক শেষ পর্যন্ত ওকে আমরা পেয়ে গেছি। তার গলায় সন্তোষ ফুটে উঠল।

দলের লোকদের বললে, জানিস, এই সেই মারগারেট যাকে খুঁজে বের করতে হুকুম দিয়েছিলেন বিশপ। কাল ওকে আমরা তাঁর কাছে নিয়ে যাব। নে তোল ওকে। আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।

হুকুম তামিল করতে দু'জন চৌকিদার এগিয়ে এল। দু'হাতে ধরে তাকে টেনে তুলল তারা বরফের ভেতর থেকে। আচমকা টান লেগে মারগারেটের কোল থেকে কম্বল-মোড়া শিশুটি পড়ে গেল তার পায়ের কাছে।

একটা পুঁটলি পড়ে গেল দেখে হাত বাড়িয়ে ওটা তুলতে গিয়ে থমকে গেল একজন চৌকিদার। দু'পলক ভাল করে দেখে হাত গুটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। —সাব, একটা বাচ্চা, এই এতটুকু।

—বাচ্চা? চোখ চক্‌চক্ করে উঠল সর্দার চৌকিদারের।

—হাঁ সাব। বাচ্চাটা মরা। মরে গেছে।

শুনে সর্দার চৌকিদারের ধূর্ত চোখ দু'টো কুঁচকে গেল। বললে হুঁ, বুঝতে পেরেছি, লজ্জার শেষচিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে ও ওর ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে। ধর ওকে, খুনীটাকে বেঁধে নিয়ে চল।

বাঁধবে আর কাকে। মারগারেটের চেতনা নেই তখন। শীতে আর শোকে সে তখন মৃতপ্রায়। দু'জন চৌকিদার মারগারেটকে বয়ে নিয়ে চলল আর একজন তুলে নিল মরা ছেলেটাকে। দলটা রোডার দিকে রওনা হল।

হঠাৎ এক সময়ে মারগারেটের চেতনা ফিরে এল। যারা তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সে, ভয়ে একটুখানি হয়ে চিৎকার করে বলল,—আমার ছেলে কোথায়, আমার ছেলে? তোমরা আমার ছেলেকে আমার কোল থেকে নিয়ে গেছ কেন?

—আর ন্যাকামি করতে হবে না। তুই ভালই জানিস তোর ছেলের কী হয়েছে! খুনী মাগী। তোর লজ্জা কবর দেবার জন্যে তুই বাচ্চাটাকে খুন করেছিস। তোকে আমরা হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি। ওই দেখ। যে লোকটা বাচ্চাটাকে নিয়ে পেছনে পেছনে আসছিল সে তখন ওদের কাছে এসে পড়েছে।

এ কী শুনল সে। হঠাৎ যেন অনেক শক্তি ফিরে এল তার গায়ে, নিজের পায়ের ওপরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল তার। তারপরেই তাকে যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের ভীষণ জোরে ধাক্কা মেরে হাত বাড়িয়ে ছুটল সে তার বাচ্চাটাকে কোলে নিতে— তার গলা চিরে বেরিয়ে এল একটা চিৎকার, যেন একটা জন্তু ভীষণ আহত হয়ে

আর্তনাদ করে উঠল।

ওরা বাচ্চাটাকে কিছুতেই দিলে না ওর কোলে, বদলে ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে ওরা হাঁটতে থাকল রোডার দিকে।

বেঁচে থাকার আর কোন যুক্তিই ওর মধ্যে অবশিষ্ট রইল না। যাদের সে ভাল বেসেছিল একটি একটি করে সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে শেষ পর্যন্ত যাকে বুকে আঁকড়ে রেখে বাঁচতে চেয়েছিল তাকেও কেড়ে নিল এই পাষাণ মানুষগুলি। তার মাথাটা ঝুলে পড়ল। মুখ থেকে নাল গড়াতে লাগল। পাগলের মতন ক্রমাগত সে চিৎকার করতে থাকল শুধু। চিৎকারটা যদিও অমানুষিক। আহত জন্তুর কান্নার মতন। তবু তার মধ্যে একটা শব্দ অর্থযুক্ত হয়ে উঠছিল ক্রমশ। অন্ধকার নির্জন প্রান্তরের ঝড়ো বাতাসে ওলট-পালট হয়ে ক্রমাগত আছাড় খাচ্ছিল সেই শব্দটা—ফাউস্ট—ফাউস্ট—ফাউস্ট—ফাউস্ট।

১৯

নিরন্ধ্র ছোট্ট সেলটা আগাগোড়া কালো পাথরে গাঁথা। কেবল পেছনের দেয়ালটা যেখানে ছাদে এসে ঠেকেছে সেখানে একটা ফোকর। গরাদে-আঁটা সেই ফোকর দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়েছে আর এক দেয়ালে। মাথার ওপরকার এই আলোটুকু সেলের অন্ধকার খানিকটা তরল করেছে। আব্ছা দেখা যাচ্ছে মারগারেটকে। খড়ের বিছানায় বসে আছে মারগারেট। খানিকটা খড় হাতে নিয়ে সে বুনছিল। আর গুন্‌গুন্ করে ছড়া কাটছিল—

খোকন খোকন সোনা
গড়িয়ে দেব গয়না
কানে দেব দুল
খোকা তাকাবে জুল জুল।

তার চুলগুলি চোখ মুখ ঢেকে শনের নুড়ির মতন ঝুলছে। তার ডেলা ডেলা চোখ দু'টো কোটরের মধ্যে বিস্ফারিত হয়ে আছে। তার আলু-থালু বেশ। হঠাৎ কী হল, সে অসমাপ্ত গহনা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। এক কোণ থেকে এক আঁটি খড় তুলে নিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসল আবার। খড়ের আঁটি কোলের ওপর শুইয়ে দিয়ে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। দুই

হাঁটুতে দোলা দিয়ে দুলে দুলে সুর করে ছড়া কাটতে থাকল।

ঘুমোরে বাছা ঘুমো, এই তো কাছে আমি
দিচ্ছি তোকে হামি
বাবা আসবেন ভোরে
রাঙা ঘোড়ায় চড়ে
মোদের তখন নিয়ে যাবেন সোনার রথে করে।
তোকে শুতে দেবেন পদ্মপাতা
মাথায় ধরবেন সোনার ছাতা
শিয়রে থাকব আমি।
মাথায় তোমার হাত বুলোবো
কপালে দেব হামি॥

বাইরে ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল। ঝনঝনিয়ে উঠল একগোছা চাবি। তালা খোলার শব্দ হল। চমকে উঠল মারগারেট। উঠে দাঁড়াল। পিছু হটল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সে কুঁকড়ে যেতে থাকল। কুঁকড়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে মেঝেয় বসে পড়ল সে। খোলা দরজার দিকে তার চোখ। চোখে ভয়। ভয়ে চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অপলক তাকিয়ে আছে মারগারেট।

জেলর একগোছা চাবি হাতে ভিতরে ঢুকল। লোকটির বয়স হয়েছে। অভিজ্ঞতা হয়েছে। বয়স আর অভিজ্ঞতা মুখের মাংস চোখের দৃষ্টি শক্ত করে দিয়েছে। হৃদয় বলেও কোন বস্তু আর অবশিষ্ট নেই। এ সেলে এমন দৃশ্য সে হামেশাই দেখে। দেখে আসছে সেই চাকরিতে যখন ঢুকেছে তখন থেকে। সে আরও একটু এগিয়ে গেল মারগারেটের কাছে। তার পেছনে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন সেপাই।

লোকটি প্রথাসিদ্ধ বর্ণমালায় বলল, ধর্মযাজকের আদালতে আজ তোমার বিচার হবে—তুমি তোমার ছেলেকে খুন করেছ, তার বিচার।

মারগারেট ভীষণ একটা আর্তনাদ করে উঠল। দু' হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষটার ওপর, দু' হাতে তার কাঁধ চেপে ধরল—বল, বল, কোথায় রেখেছ আমার ছেলেকে? তুমি বুড়ো মানুষ, তোমার দয়ার শরীর, তুমি মিথ্যে বল না, বল, বল কোথায় নিয়ে গেছ আমার ছেলেকে। সে হাহাকার করে কেঁদে উঠল।

জেলর মারগারেটের হাতের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। দু' পা পেছনে হটে গেল। মারগারেট তখন মেঝেয় পড়ে কাঁদতে থাকল…ফোঁপাতে থাকল…ফুঁসতে ফুলতে থাকল…ক্রমশ তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল।…সে উঠে বসল। হাঁটু মুড়ে দু' হাতে মেঝের খড় চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে দিতে খড়ের নিচে প্রাণপণে কি খুঁজতে থাকল। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ যেন কী মনে পড়ল তার, হাত গুটিয়ে নিল। মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, নিজের মনেই হেসে ফেলল সে। ফিস্‌ফিস্ করে নিজেকেই যেন বলল, হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে, এখন মনে পড়েছে, আমি তাকে বরফ খুঁড়ে বরফের নিচে শুইয়ে দিয়েছিলাম। বরফের নিচে খোকা আমার এখন খুব আরামে ঘুমোচ্ছে, খুব আরামে ঘুমোচ্ছে। ফাউস্ট তুমি খোকাকে দেখলে না; ফাউস্ট, ফাউস্ট তুমি কোথায়? দু' হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল মারগারেট।

মারগারেট কেবল কাঁদে। কাঁদে আর অতীতের দিনগুলি জড়ো করে স্বপ্নের মালা গাঁথে। সেই মালার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুস্যূত হতে থাকে ফাউস্টের নাম। কখন এক সময় মালা গাঁথা বন্ধ হয়ে যায়। ফাউস্টের নাম জপ করতে করতে হাত দুটো শিথিল হয়ে থাকে হাঁটুর ওপরে। চোখের কোটরে দৃষ্টি নিমীলিত হয়। স্তব্ধ নিথর মারগারেট একেবারে নিঃস্পন্দ হয়ে থাকে, যেন সে আর তার শরীরে থাকে না। অশরীরী হয়ে কোথায় চলে যায়। সত্যি চলে যায়, ফাউস্টকে সে সারা বিশ্বে তন্নতন্ন করে খোঁজে। তার অবিরাম অবিচ্ছেদ চিন্তার দুর্নিবার প্রবাহ ফাউস্টের চিন্তার প্রবাহকে কোথাও স্পর্শ করতে চায়, পারে না। চিৎকার করে ডাকে, ফাউস্ট তুমি কোথায়? কোন উত্তর মেলে না। নিখিল বিশ্বের আকাশে-বাতাসে সে চিৎকার কেবল হাহাকার করে ফেরে। তবে কি ফাউস্ট নেই। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু এক অন্তর্জাত বোধ যেন কানে কানে বলে, না, সে মরেনি। তার মৃত্যু চিন্তা করাও পাপ। একটা মস্ত পাগলামি। সে নিশ্চয় বেঁচে আছে। একটা পাপ ষড়যন্ত্র কিংবা শয়তান নিজে তাকে কোথাও বন্দী করে রেখেছে। ছাড়া পেলেই সে সাড়া দেবে। ছুটে আসবে। তার সত্তার গভীর থেকে উপচে ওঠে একটা অমিত বিশ্বাস, সে বিশ্বাস তার ঈশ্বরে বিশ্বাসের মতনই স্থির, তার দুঃখের মতনই সত্য যে, সে তার মৃত্যুর আগে অবশ্যি একবার তার প্রিয়তমর মুখ দেখতে পাবে; শেষবারের মতন তার চোখে চোখ রাখতে পারবে সে।

নির্মল মনের উপলব্ধিতে ভুল থাকে না। ফাউস্ট মরে নি। সত্যি তিনি তখনও জীবিত। মারগারেট ঠিকই অনুভব করেছিল, ফাউস্ট মরে নি। তবে জীবন্মৃত। শয়তানের পাপ-ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে তিনি নিমজ্জিত হয়ে আছেন। নিমজ্জিত মানুষটি সারা পৃথিবী ভেসে বেড়াচ্ছেন। মারগারেটের চিন্তা ফাউস্টের মন থেকে মুছে ফেলতে, মারগারেটের কাছ থেকে তাকে অনেক অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে, তাকে সহস্র রমণীয় প্রলোভনের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে শয়তানের চেষ্টার অবধি নেই। তবু ফাউস্টের মন জুড়ে রয়েছে মারগারেট, ফাউস্টের মন থেকে মারগারেটকে মুছে ফেলতে পারে নি শয়তান; তাকে বহুনিষ্ঠ করে মহতী বিনষ্টির অতলে তলিয়ে দিতে পারে নি। অসীম সমুদ্রে দিকভ্রষ্ট নাবিক যেমন সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে কেবল ধ্রুবনক্ষত্রটিকেই চোখের দৃষ্টিতে আঁকড়ে থাকে উদ্‌ভ্রান্ত ফাউস্ট তেমনি করে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ছিল মারগারেটকে। শয়তানের কারসাজিতে তিনি মারগারেটের সঙ্গে দেখা করতে কি তাকে কোন সংবাদ দিতে পারছিলেন না বটে কিন্তু তাঁর মন অনুক্ষণ মারগারেটেই সংলগ্ন হয়েছিল, অনুক্ষণ তার নামই জপ করে চলেছিলেন ফাউস্ট। এই একনিষ্ঠ নারীপ্রেমই শেষ অবধি মানুষকে উত্তীর্ণ করে দেয় ঈশ্বরী প্রেমে সুতরাং এই একনিষ্ঠা থেকে তাকে ভ্রষ্ট করাই শয়তানের কাজ। জানে মেফিস্টো। হাড়ে হাড়ে জানে। তাই ফাউস্টকে ভ্রষ্ট করতে না পেরে অক্ষমতার ক্রোধে সে কেবল আঙুল কামড়ায় আর ফাউস্টের দিকে কটমট করে তাকায়।

নিহত ভালেনটিন পায়ের কাছে পড়ে আছে। ক্ষিপ্ত জনতা ছুটে আসছে তাঁর দিকে। মেফিস্টো কানে কানে বলেছিল, যদি বাঁচতে চাও আমার সঙ্গে পালাও। ভীত সন্ত্রস্ত ফাউস্ট আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করেন নি। শয়তানের সঙ্গে সেই যে তিনি উধাও হয়েছেন আর তিনি ফিরে তাকান নি ফিরে আসেন নি সেখানে; কিন্তু সেই থেকে মনস্তাপে মরছেন কেবল, উদ্বেগ অশান্তি আর হতাশায় জ্বলছেন—কি বিপদ ঘটালাম আমি কি সর্বনাশ করলাম মারগারেটের। মারগারেট নামটা যেন তাঁর রক্তে মন্ত্রের মতন দোলা দেয়। সত্তায় স্বপ্নের মতন জেগে ওঠে। তার অস্তিত্বকে আবৃত করে সত্য হয়ে জাগে স্বপ্ন। সেই সোনালি বিভীষিকার স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠতে উঠতে আবার গাঢ় অন্ধকার হয়ে

যায়। অন্ধকার ক্রমশ চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলে। তাঁর সত্তা থেকে সবটুকু আলো কেড়ে নেয়। নিবিড় নিরন্ধ্র অন্ধকারে আলোর প্রার্থনায় কাঁদেন ফাউস্ট, যে-যৌবনের জন্যে তিনি এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যার জন্যে তিনি নিজের আত্মাকে পর্যন্ত পণ রেখেছিলেন সে এক ভয়ংকর অভিশম্পাত হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে; শুধু নিজের নয় অন্যের জীবনেও, যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, ঘনিষ্ঠ হয়েছে তাঁর জীবনের, তাদেরই জীবনে নেমে এসেছে ঘোর সর্বনাশ। দুঃখ, হতাশা মৃত্যু গ্রাস করেছে তাদের। মারগারেটই একমাত্র নারী যাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ভালবেসেছিলেন, নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসেছিলেন, যার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন নিষ্পাপ নির্মল এক দিব্য বিভা, যার স্বর্গীয় আলোতে স্নান করে তিনি পবিত্র হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন সেও কিনা নির্মমভাবে পীড়িত হল তাঁর সাহচর্যে এসে, ভাইকে হারাল, নিন্দায় ডুবে গেল, আরও কী ঘটেছে তার জীবনে কে জানে, আর কোনদিন দেখা হবে না তাঁর সঙ্গে, আর কোনদিন তিনি সামনে দাঁড়াবেন না গিয়ে তার, আর কোনদিন তাকে পাপ স্পর্শে কলুষিত করবেন না ফাউস্ট। ফাউস্ট কেবল কামনা করেন—মারগারেট তুমি সুখী হও। আমার পাপ-স্পর্শে তোমার আত্মায় যে কলুষের কালি লেগেছে তা মুছে যাক। তুমি আমাকে ক্ষমা কর মারগারেট।

ফাউস্ট কেবল মনঃপীড়ায় ভোগেন আর মনস্তাপে দগ্ধ হন আর কেবল প্রাণ দিয়ে মারগারেটের কল্যাণ কামনা করেন। ফাউস্ট জানেনও না তাঁকে কেন্দ্র করে মারগারেটের জীবনে সর্বনাশের যে ঝড় উঠেছিল তাতে করে কী সাংঘাতিক লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে তার জীবন, কী ভীষণ চুরমার হয়ে গেছে তার স্বপ্ন, সাধ, শান্তি। তাঁর কেবল ধারণা মারগারেটকে তিনি কলুষিত করেছেন, তাঁর পাপ-স্পর্শে কালো হয়ে গেছে তার আলোকিত আত্মা তার সব সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ভালেনটিনকে যে তিনি নিজে হাতে খুন করেছেন এ বিষয়েও তার কোন সংশয় ছিল না। তার মাকেও তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে যেতে দেখেছেন, যে পাপ-দৃশ্য দেখে তিনি শিউরে উঠে মূর্ছা গিয়েছেন তার নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করে আবার তিনি চোখ মেলতে পেরেছেন কিনা কে বলবে, ভাবতে ভাবতে ফাউস্ট অনুশোচনায় ম্লান হয়ে যান, বিষণ্ণ হয়ে থাকেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবেন তিনি দিতে চেয়েছিলেন তাঁর অম্লান ভালবাসার অতুল ঐশ্বর্য আর দিলেন কিনা এক ঝাঁপি বিষধর সাপ। তাঁর পাপ তাঁর বিষ—যে তাঁর কাছে আসবে, যাকে তিনি ধরতে চাইবেন তাকেই ছোবল মারবে তাকেই বিষাক্ত করে দেবে।

তাই ত তিনি পণ করেছেন, আর তিনি মারগারেটের সামনে যাবেন না, আর তিনি তার কথা ভাববেন না, এই পাপ চিত্তে আর তিনি তার স্মৃতি বহন করবেন না। মারগারেটের স্মৃতি মুছে ফেলতে তাই তাঁর এমন প্রাণান্ত চেষ্টা।

মারগারেটের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলবেন, তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকবেন বলেই শয়তানের হাত ধরে তিনি স্বেচ্ছায় সর্বনাশের দিকে আরও বেশী করে এগোতে থাকলেন। নিত্য নতুন বেশে দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন, প্রাচ্য পাশ্চাত্য আর উত্তরের সমস্ত দেশে গেলেন। প্রাচীন বিলুপ্ত ইতিহাসের দেশগুলি তাদের ঐশ্বর্য বিলাস আর সুন্দরীরা শয়তানের মায়ার খেলায় জীবন্ত হয়ে সামনে দাঁড়াল ফাউস্টের। সুরা সাকী আর সম্ভোগের সকল রকম অপচয় অবক্ষয়ের মধ্যে নিজেকে বুঁদ করে রেখে মারগারেটকে প্রাণপণে ভুলে থাকতে চাইলেন তিনি, একেবারে অবলুপ্ত করে দিতে চাইলেন মন থেকে। ভাবলেন যার জীবনে সর্বনাশের সবটুকু বিষ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তাকে স্মরণ করার কোন অধিকারই আর নেই তাঁর। কিন্তু স্মৃতি কি নির্মম, যাকে তিনি ভুলতে চান তাকেই অনুক্ষণ বুকের আকাশ জুড়ে এনে হাজির করে। এমন একটা মুহূর্ত নেই যখন মারগারেট তাঁর মনে নেই।

এখন এক গভীর গিরি-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছেন ফাউস্ট। গুপ্ত অজ্ঞাত এই নিষ্প্রাণ অঞ্চলে আজও মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে নি। আদিম পৃথিবীর অন্তরের জ্বালা একদা হয়ত এখানে টগবগ করে ফুটত কালক্রমে সে জ্বালা জুড়িয়ে দগদগে ঘায়ের ওপরে শক্ত মামড়ির মতন এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে বিস্তীর্ণ পড়ো অঞ্চলটা। তার ওপরে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা কঁকাল ভাঙা বিকৃত গঠন কুঁজো গাছগাছালি। প্রাণী বলতে ওড়াউড়ি করছে কয়েকটা বীভৎস চেহারার কাক বাদুড় চামচিকে। কুয়াসাচ্ছন্ন এই নির্জন ধূসর প্রান্তর শয়তানের আর একটা প্রিয় আস্তানা।

দূর দিগন্তের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়েছিলেন ফাউস্ট। তাঁর পাপের দীর্ঘ ছায়ার মতন পেছনে দাঁড়িয়েছিল মেফিস্টো। বলল, এখনও অতৃপ্তিতে ভুগছো ফাউস্ট, এখনও ভোগের সাধ তোমার মেটে নি? মেফিস্টোর দৃষ্টিতে বিদ্বেষ, একটা অশুভ সংকল্পের জ্বালা। মেফিস্টো রাগে জ্বলছে, এখনও সে ফাউস্টের হৃদয় থেকে তাঁর মহৎ গুণগুলো উপড়ে ফেলতে পারে নি। তাঁর সত্তার গভীরে এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে প্রেমের পবিত্র আগুন। 'প্রাণ ভরে ত ভোগ

করলে, ভোগের আর সীমাপরিসীমা রাখ নি, পেয়েছ অতুল ঐশ্বর্য, পরমা রূপসী নারী, সসাগরা পৃথিবী তোমার পায়ের তলায় আনত, হুকুমমাত্র এই বান্দা তোমার ইচ্ছা পূরণ করেছে, করছে। তবু কেন তুমি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো, বিমর্ষ হয়ে থাক সব সময়, কিসের অভাব তোমার, কিসের দুঃখ। রোভার সেই বজ্জাত মেয়েটা এখনও তোমাকে কব্জা করে আছে?'

—থাক, মেফিস্টো, থাম! ক্ষেপে উঠলেন ফাউস্ট, তুমি আমাকে ঠকিয়েছ, ক্রমাগত ঠকাচ্ছো আমাকে। আমাকে ক্রমাগত ভোলাচ্ছো তুমি, ক্রমাগত আমাকে ভুল পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছ। আমি তার ডাক শুনেছি, তার কান্না আমার কানে এসেছে। তুমি আমাকে ঐশ্বর্যের মধ্যে রূপসী নারীর মধ্যে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলে, আমিও তার মধ্যে ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভুলে থাকা যায় না। ভুলে থাকতে পারি নি আমি তাকে। সে আমাকে ডাকে, আমার জন্যে সে আকুল হয়ে কাঁদে। তার ডাক তার কান্না সারা পৃথিবী জুড়ে আমাকে খুঁজে বেড়ায় আমি যেখানে যত দূরে যাই, যে মোহের মধ্যেই না ডুবে থাকি তার কান্না ঠিক আমার কানে এসে পৌঁছয়। আমি কানে কম্বল মুড়ে আছি, আমি সাড়া দেইনে, আমি সাড়া দিতে সাহস পাইনে। কাল রাতে ঘুমের মধ্যে সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। রুক্ষ বেশ, শীর্ণ শরীর চোখে মুখে নিদারুণ উদ্বেগ। আমি অস্থির হয়ে উঠেছি তাকে দেখে। তাকে ভুলে থাকার সব সঙ্কল্প আমার ভেসে গেছে। সে কোথায় আছে, কেমন আছে আমি জানতে চাই। আমাকে বল।

—সে যদি কোন বিপদে পড়ে থাকে তার জন্যে কি তুমি দায়ী, ফাউস্ট? সে নিজেই ত নিজের পথ বেছে নিয়েছিল, ভেবেছিল ওই ধর্মধ্বজীরাই তাকে মোক্ষ এনে দেবে, দেবেও বটে, জ্যান্ত চিতায় তুলে দেবে। কিন্তু তার কি অপরাধ, যৌবনের ধর্মে সাড়া দিয়েছিল এই ত, অথচ সেই ত স্বাভাবিক।

—তাই নাকি তাকে পুড়িয়ে মারা হবে? আর আমরা এখানে অথর্বের মতন দাঁড়িয়ে থাকব, বাধা দেব না, রক্ষা করব না তাকে? তার সর্বনাশের জন্যে তুমিও দায়ী মেফিস্টো, তুমি নিষিদ্ধ বস্তু হাতে তুলে দিয়েছ আমার আর আমি সে বস্তু তাকে নিজের হাতে খাইয়েছি।

সহসা থেমে গেলেন ফাউস্ট, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। মেফিস্টো কি বলতে যাচ্ছিল তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন, বললেন, ওই শুনো আবার সে আমাকে ডাকছে। উৎকর্ণ ফাউস্টের চোখ আগ্রহে উজ্জল হয়ে উঠল হাঁ হয়ে

গেল মুখ। মারগারেটের ডাক স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি—ওগো আমার ফাউস্ট, তোমার মারগারেট তোমাকে ডাকছে, তুমি যেখানেই থাক শিগ্‌গির চলে এস, দেরি হলে আর তাকে দেখতে পাবে না।

মারগারেটের গলা শুনে ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছিলেন তিনি, এখন চিৎকার করে উঠলেন, মারগারেট তুমি কোথায়, কোথায় তুমি!

ফাউস্টের আর্ত চিৎকার শূন্য প্রান্তর পেরিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে দূরে মিলিয়ে গেল কিন্তু কোন উত্তর এল না। অনেকক্ষণ তিনি উৎকর্ণ হয়ে থাকলেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ করে স্তব্ধ হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, উত্তর যখন এল না তখন তিনি দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—মেফিস্টো আমাকে বল কোথায় আছে মারগারেট, কী করছে সে এখন?

মেফিস্টোর চোখ কুঁচকে গেল, তার সর্বাঙ্গে তীব্র অনিচ্ছা ফুটে উঠল কিন্তু প্রভুর আদেশ অমান্য করারও সাধ্য নেই তার, বলল—আদেশ করেছ যখন দেখাতেই হবে কোথায় মারগারেট, সে কি করছে এখন। পেছনে তাকাও।

পেছনে একটা গুহা। গুহার ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফাউস্ট কালি-লেপা সেই গাঢ় অন্ধকারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে থাকলেন অন্ধকারের গভীরে। আস্তে আস্তে আলোকিত হয়ে উঠতে থাকল গুহাটা। ক্রমশ আলোয় ভরে গেল। সেই উদ্ভাসিত আলোর মধ্যে ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকল একটা দৃশ্য, ক্রমশ স্পষ্ট স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকল। শেষে দৃশ্যটা এমন জীবন্ত হয়ে উঠল যেন মায়া নয় সত্যিকার মানুষই দৃশ্যের ভিতরে ঘোরাঘুরি করছে, হাত বাড়ালে ছোঁয়া যাবে শরীর, কান পাতলে গলার স্বর পায়ের শব্দ শোনা যাবে।

ফাউস্ট দেখলেন, একটা মস্ত ঘর; নিচু ছাদের সেই ঘরটাতে একসারি লোক বসে আছে। ধর্মযাজকের মতন লোকগুলির মাথা মুড়োনো গায়ে কালো জোব্বা তাদের, সামনে একটা লম্বা টেবিল। আলোর বৃত্তের মধ্যে ক্রমশ গোটা ঘরটাই দৃশ্যমান হল, দৃশ্যের সে নবোদ্ভিন্ন অংশে দৃষ্টি পড়তেই ফাউস্টের চোখ বিস্ফারিত হল, ধক্ করে উঠল বুকটা, মুহূর্তের জন্যে বুকের ধুক্‌পুকিটাও বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। ফাউস্ট শিউরে উঠলেন। তাঁর সামনে মারগারেট। মারগারেটের হাতে হাতকড়া তার পেছনে সেপাই। মারগারেটের মুখ সারিবদ্ধ লোকগুলির দিকে। মারগারেটের চেহারা দেখে একটা ভীষণ আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন ফাউস্ট। প্রথম দেখার দিনটির দৃশ্য মনে পড়ল তার, মনে পড়ল সেই অরণ্যাঞ্চলের প্রান্তে

বসন্তের আলো ঝলমল প্রান্তর; চারদিকে সবুজ ঘাস, রঙিন ফুল প্রজাপতি ফড়িংয়ের সমারোহ তারই মধ্যে ঝকঝকে নীল আয়নার মতন আকাশের নিচে বনদেবীর মতন মারগারেট। শিশুদের নিয়ে কী বিমল আনন্দে খেলা করছে কুমারী। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দিব্যরূপ সর্বাঙ্গে টলমল করছে, ঠোঁটে থরথর করছে নির্মল কৌতুক, চোখে পবিত্র শান্তি সাঁতার কাটছে। সেই মেয়ের এখন ঘষা কাচের মতন চোখ, চোখে বিষাদের ঝাপ্‌সা আলো কেবল, সর্বাঙ্গে অবসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ ছায়া; ঠোঁট দু'টো বাসি ফুলের পাপড়ির মতন শুকনো বিবর্ণ। রক্তমাংসের মানুষ নয় আর যেন; সে এক ফ্যাকাসে সাদা পাথর কেটে তৈরি মূর্তি; লাঞ্ছিত জীবনের এক পরম হতাশার প্রতিমা যেন নির্মাণ করেছেন কোন নিপুণ ভাস্কর।

ফাউস্ট দেখলেন তাঁর দিকে পিঠ, একজন কালো জোব্বাপরা লোক উঠে দাঁড়াল। তার হাতে একটা সরু সাদা ডাণ্ডা। ডাণ্ডার দু'দিক দু'হাতের মুঠোয় করে ডাণ্ডাটাকে সে মাথার ওপরে তুলে ধরল। কিন্তু কয়েক পলক তারপরই একটা হাত হঠাৎ কাৎ হল কাৎ-হওয়া মুঠো থেকে ডাণ্ডাটার প্রান্তটা ফস্‌কে গেল। টেবিলের ওপরে আছড়ে পড়ল ডাণ্ডাটা। সঙ্গে সঙ্গে মারগারেট তার যুক্ত হাত শূন্যে বাড়িয়ে দিল। ফাউস্ট দেখলেন, পরম হতাশায় তার ঠোঁট মুখ বেঁকেচুরে বিকৃত হয়ে উঠল। এবং সেই মুহূর্তে সমগ্র দৃশ্যটাও তালগোল পাকিয়ে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল। নিমেষে নিভে গেল উজ্জ্বল আলো আবার কালি বর্ণ অন্ধকারে লেপাপোছা হয়ে গেল গুহার ভিতরটা।

একটা করুণ ভয়ংকর চিৎকার বেরিয়ে এল ফাউস্টের গলা দিয়ে।

—সাদা ডাণ্ডা! তার মানে মৃত্যুদণ্ড! মেফিস্টো, তুমি ওকে আমার কাছে নিয়ে এস। আনতেই হবে, যদি মারগারেটকে আমার কাছে না এনে দাও আমি তোমাকে অভিসম্পাত···

—অভিসম্পাত! হাঃ হাঃ হাঃ আকাশ মাটি কাটিয়ে হেসে উঠল মেফিস্টো, তোমার কথাটাকে তোমার গলায়ই আবার ঢুকিয়ে দিতে পারি নে ভাবছ, ভাবছ তোমার প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছাটাকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি নে, পারি নে তোমার ওই গর্জনের শব্দটাকে তোমার দিকেই উল্টে ছুঁড়ে মারতে!

ওকে রক্ষা কর, আ হা হা গোঁসাই আমার, কে ওকে সর্বনাশের কাদায় ডুবিয়েছে, তুমি না আমি?

—মেফিস্টো, শয়তান, দুনিয়ার তামাম পাপের পায়ের কাদার মূর্তি,

ব্যভিচারের ব্যভিচার তুমি, তুমিই সব—সমস্ত সর্বনাশের গোড়া, তোমার হাত থেকেই মনোহারী হয়ে আসে যত পাপের উপহার, তুমিই মরীচিকার মায়ায় ভুলিয়ে নিয়ে যাও, অন্ধ করে দাও, তুমি চূড়ান্ত শয়তান। শয়তানের চূড়ামণি আমি তোমার কাছ থেকে আমার শেষ দাবি আদায় করে নেব। ভুলে যেও না তুমি আমার ভৃত্য, মারগারেটকে বাঁচাতে হবে, আমাকে নিয়ে চল তুমি তার কাছে।

—তুমিও ভুলে যেও না ফাউস্ট, রোডায় তোমার জন্যে কী সাংঘাতিক বিপদ ওৎ পেতে আছে। ভুলে যেও না তুমি খুনের অপরাধে অপরাধী, তুমি রোডার মাটিতে নিরপরাধের রক্ত ঝরিয়েছ। সেই রক্ত থেকে প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা নির্মম হয়ে উঠেছে। তোমার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছে সেই প্রতিহিংসা। তোমার সেই নিয়তির ওপরে আমার কোন হাত নেই ফাউস্ট। সে আমার এক্তিয়ারের বাইরে।

—তুমি আমাকে ভয় দেখিও না মেফিস্টো, আমি কোন কথা শুনতে চাই নে, এই মুহূর্তে আমাকে সেখানে নিয়ে চল তুমি। আমি তাকে দেখব।

মেফিস্টোর উঁচু বাঁকানো জোঁকের মতন ভুরু কুঁচকে গেল, সে হিংস্র জন্তুর চোখে তাকিয়ে বলল—বড্ড দেরি করে ফেলেছ ফাউস্ট, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, ওকে আর এখন বাঁচানোর কোন উপায় নেই। তোমার প্রেয়সীকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে ওরা কাঠ জড় করছে এখন।

—তুমি আমার গোলাম, যা করতে বলছি তাই করতে হবে তোমাকে। আমাকে নিয়ে যেতে হবে ওর কাছে, আমি আদেশ করছি, এক মুহূর্তও বিলম্ব করা চলবে না আর।

মেফিস্টো আনত হয়ে কুর্নিশ করল। বিদ্বেষে আর বিরক্তিতে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল তার।

গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মেফিস্টো ডাকল, আমার ঘোড়া তৈরি, এস।

মেফিস্টোর চার ঘোড়ার গাড়ি। নরকের সবচেয়ে নারকী ঘোড়া; অমাবস্যার রাত্রির মতন গায়ের রং; তাদের চোখে জ্বলছে সর্বনাশের উল্কা, দাঁতে দাঁত ঘষলে সর্বনাশের শব্দ উঠছে, পাথর কেটে ক্রমাগত স্ফুলিঙ্গ বেরোচ্ছে তাদের খুরের ঘায়ে।

ফাউস্ট দৌড়ে এসে চড়ে বসলেন গাড়িতে। মুহূর্তে উড়াল দিল ঘোড়া।

আকাশে উল্কার বেগে ছুটতে থাকল। তবু ফাউস্ট চেঁচাচ্ছেন, আরও জোরে ছোটাও, আরও আরও জোরে। আমার প্রিয়তমাকে আমি দেখবই দেখব, আমি তাকে উদ্ধার করবই। আমি তাকে কিছুতেই পুড়ে মরতে দেব না। না, না। কান্নায় করুণ হয়ে উঠল ফাউস্টের গলা।

২১

এদিকে রোডায় তখন প্রচণ্ড তুষার-বৃষ্টি হচ্ছে। পথ-ঘাট-মাঠ সব বরফের নিচে তলিয়ে গেছে ; তারই মধ্যে দিয়ে মারগারেটকে আদালত থেকে সোজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভুমিতে। এখানে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে। জ্যান্ত মানুষ পোড়ানোর দৃশ্য দেখতে শহর থেকে কাতারে কাতারে লোক ছুটছে সেখানে। সেখানে বোঝায় বোঝায় কাঠ আনা হচ্ছে, পাহাড় করে সাজানো হচ্ছে কাঠের বোঝা।

ফাউস্ট যে দৃশ্যের শেষ দেখেছিলেন তার শুরুটা হয়েছিল এইভাবে :

মারগারেটকে যখন তারা জেলের সেল থেকে ধর্মাধিকরণের আদালতে হাজির করল তার কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। চারধারে এত লোক কেন, কালো পোশাক পরে মাথা মুড়োনো মানুষগুলিই বা কে, কেনই বা টেবিল ঘিরে বসে আছে কিছুই তার মাথায় ঢুকছিল না। জড়-বুদ্ধি মানুষের মতন সে কেবল জুলজুল করে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, তার চোখের সামনে চঞ্চল কোন স্বপ্নের দৃশ্য ভেসে বেড়াচ্ছে—সে-দৃশ্যগুলি কুয়াসার মতন, ছড়ানো দানার শিথিল কতকগুলি এলোমেলো ছবি তাল পাকিয়ে হাওয়ায় ফুরফুর করছে। কোন একটা ছবিকেও যেন সে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না, দৃষ্টি থেকে ক্রমাগত ডাইনে-বাঁয়ে ওপরে-নিচে পিছলে সরে যাচ্ছে, সে ধরতে চেষ্টা করে ক্রমাগত চোখ ঘোরাচ্ছে। হাত বেঁধে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকে নিয়ে যে কি হচ্ছে কিছুই সে জানছে না। হঠাৎ একটা কথা কানে যেতে যেন একটু বুদ্ধির আভাস জেগে উঠল চোখে, ঘষা কাচের মতন চোখটা মুহূর্তের জন্যে জোনাকির মতন জ্বলে উঠল ; তখন জেলর তার খোকার কথা বলছিল, কী বলছিল, কি যেন··· কিন্তু নির্মম মিথ্যে সেই বিবৃতির কিছুই সে শুনছিল না। খোকার কথা উঠতেই খোকার ছবি তার চিত্ত জুড়ে সত্য হয়ে উঠেছিল। বুকের মধ্যে তার খোকা।

তুষার-ঝাপ্‌টা থেকে তাকে বাঁচাতে সে বুকের মধ্যে তাকে চেপে ধরে আছে। সেইভাবে দু' হাত বুকের মধ্যে জড়ো করে ঈষৎ নত হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন, জড়ো-করা দুই বাহুর ওপরে দৃষ্টি বুলাচ্ছে, মাথা নত করছে, যেন চুমু খেতে সাধ; কিন্তু পাছে তার তুষার-শীতল ঠোঁটের স্পর্শে খোকা শিউরে ওঠে সে মুখ সরিয়ে নিচ্ছে, দু' বাহু মৃদু দোলাচ্ছে যেন খোকাকে শান্ত করছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে। ওই কালো পোশাক-পরা আগন্তুক মানুষগুলি তাকে হাজারো প্রশ্ন করছে—তার কোনটারই জবাব দিচ্ছে না সে; যেন বুঝছেই না কী প্রশ্ন, কেন প্রশ্ন, কাকেই বা প্রশ্ন। হঠাৎ তার বোধগম্য হল ওরা সব গির্জার পুরোহিত তখন তার ইচ্ছে হল বলে তোমরা আমার খোকাকে পবিত্রবারিতে অভিসিক্ত কর, ওকে দীক্ষা দাও। তখনই আবার সে শিউরে উঠল, না, না, ওরা জেনে ফেলবে—সেই বরফ প্রান্তর সেই নিবিড় তুষার-বর্ষণের দৃশ্য, ফুটে উঠল তার চোখের সামনে, বরফ খুঁড়ে যেখানে সে তার খোকাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে উষ্ণ রাখার জন্যে বরফ চাপা দিয়েছিল যেন সে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, পাহারা দিচ্ছে খোকাকে, জেগে উঠলে বুকে তুলে নেবে সে জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তখনই তার কানে গেল তার প্রিয়তমর নাম। অমনি বিপদাশঙ্কায় তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল, কেন এই লোকগুলি জড় হয়েছে, কেন তার প্রিয়তমর নাম করছে, কী চাইছে এরা, কী এদের মতলব, ঘোরতর কোন বিপদের ভয়ে কুঁকড়ে রইল মারগারেট। একটা কর্কশ গলার স্বরে একটু পরেই ভীষণ চমকে উঠল সে।

—তাহলে তুমি কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবে না স্থির করেছ, কী? এই নামটাই না তোমার প্রেমিকের নাম, পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করলে এ নাম ধরেই না তুমি চিৎকার করে উঠেছিলে, এই লোকটাই না তোমার দাদাকে খুন করেছে?

—না, না, না, এতক্ষণে কথা বলল, চিৎকার করে উঠল মারগারেট—ফাউস্ট, অসম্ভব। পরক্ষণেই আবার মারগারেট যেন কোথায় হারিয়ে গেল কিংবা সমাধিস্থ হল; মনে হল কোন স্মৃতির ছায়ার গভীরে তলিয়ে গেছে সে।

মারগারেটের এই আচ্ছন্ন ভাব ও অন্যমনস্কতা দেখে উপস্থিত মানুষগুলির ধারণা হল, মারগারেট মেয়েটা অতিশয় জেদী এবং নিষ্ঠুর। ও-যে একটা পাপ কার্য করেছে তার জন্যে ওর বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই। শুধু তাই নয়, তার দাদার হত্যাকারীকে পর্যন্ত সে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করছে না, তার মানে এই অপরাধের সঙ্গেও সে কোথাও না কোথাও জড়িত।

বিচারকমণ্ডলী নিম্নকণ্ঠে নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ পরামর্শ করলেন :

অবশেষে একজন বললেন—তাহলে ফাউস্ট মানুষটার কোন সন্ধানই ওর থেকে আদায় করা গেল না। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়ে গেল। তাহলে এখন আমরা রায় দিতে পারি।

—ওকে পুড়িয়ে মারা হোক। পুড়ে মরাই ওর উপযুক্ত শাস্তি। প্রস্তাবে কেউ বাধা দিল না কিংবা অসম্মতি জানাল না।

—তাই হোক, সর্ব-সম্মতিক্রমে তখন সেই সিদ্ধান্তই বহাল রাখলেন বিচারকমণ্ডলী।

তখন বিচারকমণ্ডলীর মধ্যমণি একজন রোগা লিক্‌লিকে রুক্ষ চেহারার পুরোহিত উঠে দাঁড়ালেন। টেবিল থেকে সরু সাদা ডাণ্ডাটা তুলে নিলেন। দু' প্রান্ত দু' হাতে ধরে ডাণ্ডাটা মাথার ওপর সমান্তরাল রেখে ঘোষণা করলেন :

"মারগারেট, এই পবিত্র ধর্মাধিকরণ তোমার অপরাধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছে। এবং তোমাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেছে। তোমার প্রতি ক্ষমাশীল হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কেননা তুমি আমাদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার তথ্য গোপন রেখেছ, অধিকন্তু কৃতকর্মের জন্যে তোমার মধ্যে অনুতাপের বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। অতএব সর্ব-সম্মতিক্রমে আমরা তোমার মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখলাম। তোমাকে পুড়িয়ে মেরে তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে। তুমি তোমার শিশুকে হত্যার দায়ে এই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে। এই আদালত থেকেই সোজা তোমাকে শহরের বাইরে দাহনদণ্ডের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রার্থনা করি—তোমার আত্মা দেহত্যাগ করার পূর্বে ভগবদ্‌ কৃপায় তোমার কঠিন হৃদয় বিগলিত হোক, তুমি অনুতপ্ত হও।"

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল মারগারেট। ওই রোগা লম্বা মানুষটা রুক্ষ গলায় কী বলছে শুনতে পাচ্ছিল বটে সে ; কিন্তু উচ্চারিত শব্দগুলির তাৎপর্য তার বোধকে ঠিক স্পর্শ করতে পারছিল না, কেননা তার মধ্যে কোন বিকার ঘটছিল না। জড়বুদ্ধি মানুষের মতন নির্লিপ্ত দাঁড়িয়েছিল মারগারেট ; যেই মাত্র তার কানে গেল তার শিশুর কথা, যখনই সে শুনল নিজের শিশুকে হত্যার অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, তাকে পুড়িয়ে মারা হবে অমনি পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠল মারগারেট, একটা কুয়াসাচ্ছন্ন নিরবয়ব শূন্যতা থেকে হঠাৎ যেন কঠিন মাটিতে আছড়ে পড়ল, সে এইবার স্পষ্ট দেখতে পেল শুকনো শক্ত মানুষটাকে, তার কর্কশ গলা স্পষ্ট শুনতে পেল, শুনতে পেল তাঁর হাত থেকে ন্যায়দণ্ডটা কী

সাংঘাতিক শব্দ করে টেবিলের ওপরে আছড়ে পড়ল। শব্দটা হাতুড়ির বাড়ির মতন ছিট্‌কে এসে বুকে লাগল তার। ধক্‌ করে উঠল বুকটা—তার মৃত শিশুর কথা ভেবে, তার বিরুদ্ধে একটা বীভৎস অভিযোগ প্রমাণ করা হয়েছে জেনে, আর একটি রাতের জন্যেও সে তার প্রিয়তমর মুখ দেখতে পাবে না বুঝে এবং কী নিষ্ঠুরভাবে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে কল্পনা করে সে ভীষণ শিউরে উঠল। নিদারুণ যন্ত্রণার এক মর্মান্তিক কান্না হয়ে তার গলা চিরে বেরিয়ে এল বিধাতার কাছে সর্বস্বান্ত মানুষের অন্তিম আবেদন।

এই-ই সেই মর্মান্তিক কান্নার অন্তিম দীর্ঘশ্বাস যা প্রবল উচ্ছ্বাসে বিশ্ব-রহস্যের কুয়াসাগুণ্ঠন অনাবৃত করে ফাউস্টের আত্মাকে এসে স্পর্শ করেছিল, উৎকর্ণ উৎকণ্ঠিত করেছিল; পৃথিবীর পরিত্যক্ত এক পার্বত্য অঞ্চলে শয়তানের আস্তানায় দাঁড়িয়ে তিনি মহতী বিনষ্টির ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

শয়তানের রথ থেকে ফাউস্ট নামলেন একটা টিলার মাথায়। এই টিলার কোলেই রোডা—একটা দারুণ দৃশ্যের প্রত্যাশায় কৌতূহলী রোডা এখন উত্তেজনায় টগবগ করছে। ফাউস্ট তাঁর টিলার চূড়া থেকে মাইলখানেক দূরে আর একটা টিলার চূড়ায় তাকিয়ে আছেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আঁটি আঁটি কাঠ এনে সেখানে স্তূপীকৃত করা হচ্ছে।

—ঠিক সময়েই এসে পড়েছি, ফাউস্ট বললেন, দেখ মানুষের একটা মস্ত ভিড় জাঙ্গাল দিয়ে টিলার ওপরে উঠছে, ওই ভিড়ের মধ্যে আমি আমার প্রিয়তমাকে দেখতে পাচ্ছি না। সে হয়ত এখনো পেছনে রয়েছে, মেফিস্টো এই মুহূর্তে আমাকে তুমি ওই টিলাটায় নিয়ে চল। আমি ওকে রক্ষা করব।

মেফিস্টো ক্রূর চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ফাউস্টকে, বললে, রোডা শহর আমার শক্তির এক্তিয়ারের বাইরে সে ত আমি ভালেনটিন খুন হওয়ার পরেই তোমাকে জানিয়েছি। এই টিলা অবধিই আমি তোমার সঙ্গে আছি, তুমি যদি রোডায় ঢোকো, একলা ঢুকবে। ওই মেয়েটাকে যদি বাঁচাতে চাও, নিজের জোরে বাঁচাবে। তার জন্যে যদি বিপদ-বিপত্তি ঘটে তুমি একলা সামলাবে তোমাকে সাহায্য করতে আমি আর থাকছি না সেখানে। মারগারেট কিংবা মেফিস্টো কাকে চাও বেছে নাও।

মেফিস্টো যেন মাথায় মুগুর মারল ফাউস্টের। তিনি হতচৈতন্য হয়ে থাকলেন ক্ষণকাল, তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়ল, চোখে কুয়াসা জমে উঠল, তিনি

শূন্য দৃষ্টিতে মেফিস্টোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন কেবল। তারপর সে মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন কী কঠিন ষড়যন্ত্রের জালে আটকে ফেলেছে তাঁকে মেফিস্টো, ক্ষেপে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন তিনি, নির্মম ক্রোধে ফেটে পড়ে বললেন, —উঃ শয়তান, তুমি নরকের একটা ঘৃণ্য পোকা, পৃথিবীর পবিত্র হৃদয় কুরে কুরে খাওয়াই তোমার কাজ! আহ্ এই মায়াবী যৌবনের জন্যে তুমি যদি আমাকে লুব্ধ না করতে এ সর্বনাশ তাহলে কিছুতেই হতে পারত না। না, না। ধিক্, শতধিক তোমার এই অভিশপ্ত যৌবন।

ধিক্কার দিতে দিতে তিনি প্রবলবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন, দ্রুত চোখ বুলিয়ে একবার দেখে নিলেন বরফ ভেঙে এই টিলা থেকে ওই টিলায় যেতে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ কোন্‌টা; তারপরেই আর পলক মাত্র দ্বিধা না করে তিনি লাফিয়ে পড়লেন এবং লম্বা পা ফেলে এমন দুরন্ত বেগে দৌড়োতে থাকলেন যেন পেছন থেকে তাকে ভয়ংকর কেউ তাড়া করেছে।

ক্রূর মেফিস্টো চোখ কুঁচকে দেখছিল তাকে, এবার একটা প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ততক্ষণে ফাউস্ট সেই টিলার কাছে পৌঁছে গেছে, রোডা শহরের বহু কৌতূহলী মানুষও, আরও মানুষ আসছে, কাতারে কাতারে আসছে তারা। তাদের পেছনে একটা বিশেষ ধরনের মিছিলের মাঝখানে মারগারেট। তার পরনে লম্বা সাদা পোশাক, প্রায়শ্চিত্তকারীরা যে পোশাক পরে। সাদা পোশাকে মারগারেটকে একটা শুভ্র দীপশিখার মতন দেখা যাচ্ছে। মেফিস্টো দেখছিল। লোকের পায়ে পায়ে বরফের ওপর দিয়ে যে সরু কালো ফিতের মতন পথ পড়েছে এখন মিছিলটি সে পথে আস্তে আস্তে টিলার ওপরে উঠছে। মিছিলটা ক্রমশ ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল এবং অদূরে দেখা গেল ফাউস্টকে। মারগারেটের কাছে পৌঁছতে তিনি তাঁর যৌবনের সবটুকু শক্তি সংহত করে প্রাণপণ ছুটছেন।

ঠিক মুহূর্তটির অপেক্ষায় মেফিস্টোর ধূর্ত চোখ চক্‌চক্ করছিল। এইবার তার মুখে ফুটে উঠল সর্বনাশের হাসি। সে তার বুকপকেট থেকে একটা ছোট্ট আরশি বের করে আনল। এই সেই মায়া-মুকুর, ফাউস্টকে যৌবন দান করার আগে যার মধ্যে সে ধরে রেখেছিল বৃদ্ধ ফাউস্টের জীর্ণ মুখাকৃতি। আরশিটা হাতের চেটোয় রেখে বিদ্রূপের দৃষ্টি হানল সে। আরশির গভীরে বৃদ্ধ যৌবন-ভিক্ষু ফাউস্টের মিনতি-করুণ বলি-অঙ্কিত নির্জীব মুখাবয়বের দিকে তাকাল, দেখল ক্ষণকাল, তারপর হাত উঁচু করে দূরের টিলায় ফাউস্টের দিকে তুলে ধরল আরশিটা।

বজ্রের আওয়াজে বললে—তুমি নিজেই তোমার ভিক্ষালব্ধ যৌবনকে ধিক্কার দিয়েছিলে, এই অভিশপ্ত যৌবন তুমি চাও না, বলেছিলে সুতরাং এ যৌবন আমি ফিরিয়ে নেব তোমার কাছ থেকে, অন্তত যৌবনের অভিশাপ থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দেব, তোমার এই ইচ্ছাটাই পূর্ণ করব আমি।

বলতে বলতে মেফিস্টোর চোখ গনগনিয়ে উঠল, আগুনের লক্‌লকে শিখা বেরুতে থাকল তার থেকে যেন নরকের নিঃশ্বাসে নৃত্য করছে দৃষ্টির আগুন, মুখে ফুটে উঠেছে সার্বিক সর্বনাশ। দাঁত কড়মড় করে আবার তাকাল সে আরশির দিকে।

—যা ছিলে তাই হও। মেঘমন্দ্রে ঘোষণা করল শয়তান। শেষে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল আরশিটা। কঠিন পাথরে আছাড় খেয়ে আরশিটা খান খান হয়ে গেল।

মাত্র শ'খানেক গজ দূরে তখন ফাউস্ট। তিনি দেখতে পাচ্ছেন জল্লাদরা মারগারেটকে দাহদণ্ডে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। সর্দার জল্লাদ মশাল জ্বালাচ্ছে আর তার সাকরেদদের হাতে তুলে দিচ্ছে একটা একটা করে। আতঙ্কে অস্থির ফাউস্ট প্রাণপণে বরফ ঢাকা পিছল পাথুরে পথ ভেঙে ওপরে উঠছেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আগুন লাগানোর আগেই তিনি মারগারেটের কাছে পৌঁছে যেতে পারবেন ; অবশ্য তিনি জানেন না, মারগারেটের কাছে পৌঁছে গিয়ে তিনি কি করবেন : অন্তত তিনি করজোড়ে নতজানু হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইবেন এটুকু তিনি জানেন, এই তার ঐকান্তিক সংকল্প।

সেই সংকল্পে-দৃঢ় ফাউস্ট দ্রুতবেগে এগোচ্ছেন তখন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত—হাঁটু কেঁপে উঠল তাঁর, হাঁটু আর দেহের ভার বইতে পারছে না। তিনি হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন। তিনি অনুভব করতে লাগলেন নিমেষে নিমেষে তার দেহের শক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ দুর্বল অসহায় হয়ে পড়ছেন তিনি। কিন্তু অসহায় হয়ে পড়লে ত চলবে না অদূরে আগুন জ্বলছে, তাঁকে যে পৌঁছতেই হবে যেমন করে হোক। তিনি কোনমতে উঠে দাঁড়ালেন। ভেবেছিলেন পথশ্রমে তিনি এমন কাতর হয়ে পড়েছেন কিন্তু না ত। হঠাৎ হাত দুটোর দিকে চোখ পড়তেই শিউরে উঠলেন তিনি, তাঁর চোখ বড় ও গোল হয়ে গেল—তার বাহু দু'টো বৃদ্ধের বাহুর মতন শীর্ণ হয়ে গেছে চামড়া ঝুলে পড়েছে ডানার, কোঁচকানো আঙুলগুলি চামড়ায় ঢাকা ক'খানা শুকনো হাড় মাত্র। কপালের কাছে উঠে এল হাত, বুঝি কপালে করাঘাত করলেন, কারণ ততক্ষণে তিনি বুকে

ফেলেছেন ঘটনাটা।

যে অভিশপ্ত যৌবনকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন, প্রবল ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছেন যে-যৌবনকে পরম প্রয়োজনের মুহূর্তে সে তাকে পরিত্যাগ করেছে। তিনি আবার সেই পুরনো ফাউস্ট—উস্কখুস্ক একমাথা পাকা চুল, একবুক পাকা দাড়ি, প্রাচীন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত মাত্র। তাঁর শরীরে আর একবিন্দু সামর্থ্য নেই, আছে কেবল একটা প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি। যে-নারীকে তিনি দেহ-মনে হত্যা করেছেন এই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি সম্বল করেই তিনি এখন তার কাছে পৌঁছতে চান, পৌঁছতেই হবে। দুর্বল শরীর নিয়ে তিনি টলতে টলতে এগোতে থাকলেন। অসহ্য মানসিক উদ্বেগ আর দৈহিক যন্ত্রণায় কাতর তিনি কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে জনতার মধ্যে এসে পড়লেন। জনতা দু'ভাগ হয়ে বৃদ্ধ মানুষটিকে পথ করে দিল কিন্তু সেপাইবাহিনী বাধা দিল তাঁকে, তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল তারা। সেপাইবাহিনীর ফাঁক দিয়ে তিনি মারগারেটকে দেখতে পেলেন। দাহদণ্ডের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তার মাথা ঝুলে পড়েছে, তার দীঘল সোনালি চুল ছড়িয়ে পড়েছে কোমর অবধি—অনাবৃত বাহু উরু পা দু'খানি—যেমন দেখেছিলেন উপত্যকার অরণ্যে, মারথার গোলাবাড়িতে, মারগারেটের নির্জন ঘরে—টানটান মসৃণ ত্বকের সেই দিব্যবিভা এখনও অমলিন, কতশত বার ওই পা ধরে তার সেবা করেছেন তিনি, কতশত বার ওই বাহুতে শয়ন করেছেন, চুমু খেয়েছেন। মারগারেটের মুখে চোখ পাতলেন ফাউস্ট, মারগারেটের ঠোঁট দু'টি নড়ছে, যেন জনতার চোখে অদৃশ্য কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলছে সে।

উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠলেন ফাউস্ট, সেপাইদের বাহু-শৃংখলের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলেন তিনি, বার্ধক্যের ক্ষীণকণ্ঠে প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলেন, মারগারেট মারগারেট প্রিয় আমার !

চমকে উঠল মারগারেট, আস্তে চোখ মেলে তাকাল, চোখের তারা নড়তে লাগল এদিক-ওদিক যেন চেতনাকে নাড়া দিয়েছে কোন স্মৃতি, স্মৃতির তন্ত্রিতে বেজে উঠেছে কোন হারানো সুর। কিন্তু চারধারে তাকিয়ে একজন বৃদ্ধই মাত্র চোখে পড়ল তার, সাদা চুল সাদা দাড়ি পরম প্রবীণ এক বৃদ্ধ তার দিকে দুই বাহু বিস্তার করে আছে।

হতভাগ্য বৃদ্ধ, মারগারেটের চোখ দেখে তার ঠোঁট নড়া দেখে, মনে হল যেন ওই কথাই বলছে সে। আহা কী করুণ বৃদ্ধের দৃষ্টি, পৃথিবীর তাবৎ দুঃখ যেন ওই দুই চোখে বরফ হয়ে জমে আছে, মারগারেট চোখ বুজছে না দেখে মনে

হচ্ছে যেন সে ওই কথাই ভাবছে। ভাবতে ভাবতেই হয়ত তার মনে পড়েছে তাকে পুড়িয়ে মারতে মানুষগুলির আর দেরি নাই। সে শিউরে উঠল, চোখ বুজল। তার ঠোঁট নড়তে লাগল—হয়ত ভক্তিমতী এখন প্রার্থনা করছে: ঈশ্বর তুমি আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা কর। প্রিয় ঈশ্বর, তুমি আমাকে আমার মা ও ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাও। আমি হয়ত স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি পাব না তবু দয়া করো প্রভু, আমাকে আমার মায়ের কাছে ভাইয়ের কাছে রেখো। দয়াময় প্রভু, তুমি কি একবারের জন্যে আমার খোকাকে আমার কোলে দেবে? একবারের জন্যেও কি আমি আমার ফাউস্টকে দেখতে পাব, তার দয়া চাইতে পারব, তাকে একবার চুমু খেতে পারব?

তখন তার পায়ের তলার কাঠের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল মারগারেট, তার সর্বাঙ্গে স্নায়ুর খিঁচুনি দেখা দিল। সাঁ-সাঁ করে জ্বলে উঠেছে আগুন, চারদিক থেকে লক্‌লকে শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে ওপর দিকে উঠছে, চতুর্দিক থেকে ক্রমশ আগুনের শিখা তার দিকে ধেয়ে আসছে, আগুনের বৃত্ত ক্রমশ ছোট হচ্ছে, আর যত ছোট হয়ে আসছে তত তার উত্তাপ বাড়ছে, উত্তাপ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার গায়ে তারপর মুহূর্তের মধ্যে আগুনের শিখা তার লম্বা লক্‌লকে জিভ বাড়িয়ে দিল তার দিকে, তার গা চাটতে শুরু করল। সেই লেলিহান আগুনের শিখার মধ্যে অক্ষম অসহায় মারগারেট আকুল হয়ে ভীষণ একটা চিৎকার করে উঠল।

সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ফাউস্ট সেপাইদের পাহারা ভেদ করে ঝাঁপ দিল আগুনের মধ্যে। মারগারেটকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ফাউস্ট—প্রিয়, আমার প্রিয়, ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর তুমি।

মারগারেট চোখ মেলল। ফাউস্ট তার চোখে চোখ রাখলেন। ফাউস্টের চোখে চোখ রেখে কী যেন মনে পড়ল তার। স্মৃতি আলোড়িত হয়ে কি যেন ভেসে উঠল চোখে, চোখের সামনে এ সে কাকে দেখছে! বুকের ভিতরে জ্বলে উঠল একটা দিব্যশিখা চেতনার অন্ধকার দূর করে দিয়ে সে উজ্জ্বল করে তুলল ফাউস্টের মুখ—এই ত সেই মানুষ, এই ত সেই চোখ যার স্বপ্ন দেখে নিদারুণ যন্ত্রণার দিনগুলি সে পার করেছে। অগ্নিশিখার প্রচণ্ড দাহে শান্তিবারি সিঞ্চন করে মারগারেটের অস্তিত্ব ব্যাপ্ত করে জেগে উঠল অসীম অক্ষয় প্রেম, সমস্ত জ্বালার ঊর্ধ্বে মুহূর্তের জন্যে উত্তীর্ণ মারগারেট ভাঙা গলায় শিথিল শব্দে উচ্চারণ করল—

ফাউস্ট আমার ফাউস্ট, ওগো প্রিয়, প্রিয়তম....

মারগারেটের মুখ ফাউস্টের মুখের ওপরে নত হয়ে পড়ল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে ফাউস্ট বললেন, মারগারেট আমার ধ্রুবতারা...তুমি আমাকে রক্ষা করেছ...তোমার পবিত্র ভালবাসা আমাকে পাপমুক্ত করেছে।

তাদের ঠোঁটে ঠোঁট মিলিত হল। পৃথিবীর কোন আগুনে যাকে পোড়াতে পারে না সেই অমর প্রেমের গভীর গহনে নিঃসাড়ে তলিয়ে গেল তারা। তাদের ঘিরে চিতার শিখায় নৃত্য জুড়ে দিয়েছে তখন পৃথিবীর বিচার।

উপসংহার

লক্ষ কোটি পতিত আত্মার আর্তনাদে উথাল-পাথাল হল অন্ধকার। একটা নীল বিদ্যুৎ শিখার মতন আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত করে আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে ছুটে গেল একটা বিশাল উল্কা। আসলে মেফিস্টো। সে এসে দাঁড়াল জ্যোতির্লোকের তোরণ-দুয়ারে।

আস্তে আস্তে তোরণ-দুয়ার খুলে গেল। জ্যোতির্ময় দিব্যকিরণে উদ্ভাসিত হল সমস্ত আকাশ। অন্ধকারের জীব দিব্যজ্যোতি সহ্য করতে পারল না। মেফিস্টো মুখ ঘুরিয়ে নিল। অগ্নিময় সেই দীপ্তি থেকে বেরিয়ে এলেন এক সর্বশুভ্র দেবদূত। তাঁর দু' হাতের মধ্যে একখানা তলোয়ার। তলোয়ারের শরীরে জ্যোতিঃপুঞ্জ ঝলমল করছে।

জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকাতে অক্ষম মেফিস্টো মুখ ঘুরিয়ে রেখেই দু' বাহু প্রসারিত করে দিল। তার একহাতে গুটানো একটি তমসুক। সে তমসুকটা মেলে ধরল। রক্তের অক্ষরে লেখা সে এক শর্তনামা।

শয়তান সগর্বে ঘোষণা করল—তুমি হেরে গেছ দেবদূত, এই দেখ, আমি বাজি জিতেছি। এখন থেকে এ পৃথিবী আমার।

শান্ত অচঞ্চল স্বরে দেবদূত বললেন—না, তুমি বাজি জিততে পার নি। নরকে নয় স্বর্গেই স্থান পাবে ফাউস্ট। তুমিই হেরে গেছ শয়তান। এ পৃথিবী তোমার হবে না।

জ্বলে উঠল শয়তানের চোখ। দৃষ্টিতে নরকাগ্নি বিচ্ছুরিত করে বলল—না, ফাউস্টের স্থান কিছুতেই স্বর্গে হতে পারে না। আমার নরকই হচ্ছে তার যোগ্য বাসস্থান। জীবনটাকে যথেচ্ছা ভোগের জন্যে ফাউস্ট তার আত্মা আমার কাছে বেচে দিয়েছিল।

দেবদূত তার জ্যোতির্ময় তলোয়ার আন্দোলিত করলেন। চতুর্দিককার আলো আরো উজ্জ্বল আরো প্রখর হয়ে উঠল। সে অসহ্য দীপ্তিতে বিভ্রান্ত শয়তান মাথা নিচু করল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল তার। কিন্তু ফাউস্টের কবলাখানা সে ছাড়ল না। দেবদূতের চোখের সামনে ঝুলিয়েই রাখল সে।

তখন দেবদূত আবার বললেন—শোন শয়তান, দেবলোকেই হবে ফাউস্টের স্থান। তুমি ফাউস্টের বুকের সব ক'টি আলো নিভিয়ে দিতে পেরেছিলে মানছি, কিন্তু একটি নরম শিখা তোমার শত চেষ্টাতেও নেভেনি। তুমি হার মেনেছ।

—একটি শিখা। কী নাম তার? শয়তান ভ্রূকুটি করল।

প্রশান্তকণ্ঠে দেবদূত উত্তর দিলেন,

—প্রেম

এবং দেবদূত অন্তর্হিত হলেন। জ্যোতির্লোকের তোরণ-দুয়ার রুদ্ধ হল। প্রগাঢ় অন্ধকারে আবার আবৃত হল অনন্ত আকাশ। সেই অন্ধকারের অন্তরাল থেকে ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট শয়তান পরাজয়ের গ্লানিতে গর্জন করে উঠল, দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল তার মেঘমন্দ্রস্বর—গড় গড় গড় গড়…

———